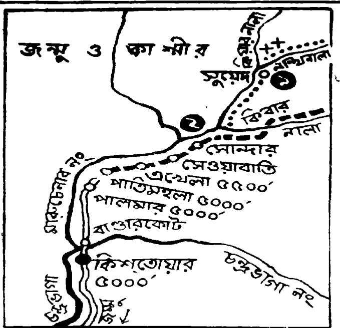
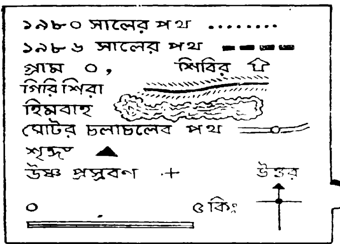
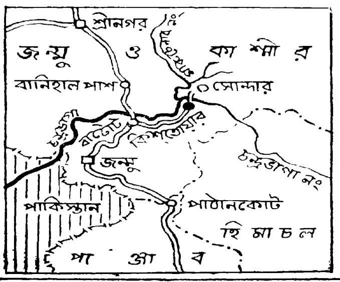
ব্রহ্মলোকে

ব্রহ্মলোকে
(কিশ্‌তোয়ার-হিমালয়)







সরবাল হিমবাহ
সিকেল মুন ২১,৬৮৬´
১৮,২০১
ইস্টার্ন ক্যাথিড্রেল হিমবাহ
সন্তুরাটিন
নালথগ্রাম
নালথ নালা
ঘাল
আগার
ব্রহ্মা হিমবাহ
হিমবাহ
ব্রহ্মানী
ব্রহ্মা ১
২১,০৪৯´
২য় শিবির ১৮,৫০০
১ম শিবির ১৬,৮০০
ফ্লুটেড ফিঙ্গার ১৭,৯৬০´
ব্রহ্মা ২
১৯,৬৯২´
২০,০১২
ফ্ল্যাট টপ
দোবা ১০,৫০০´
কিবারগাঁও ৭০০০´
কিবার নালা
← সোন্দার

অর্ধেন্দু দত্ত

অনুজপ্রতিম প্রয়াত পর্বতারোহী

অসিতকুমার মৈত্র

এবং

তারই মতো

যাঁরা হিমালয়কে ভালোবেসে

চিরকালের তরে হিমালয়ে রয়ে গিয়েছেন

তাঁদের সবার উদ্দেশে—

আমাদের প্রকাশিত লেখকের গ্রন্থ ঃ

অমরতীর্থ অমরনাথ
অমরাবতী আসাম
কুম্ভমেলায়
গঙ্গা যমুনার দেশে
চতুরঙ্গীর অঙ্গনে
দ্বারকা ও প্রভাসে
ভাঙা দেউলের দেবতা
মধু বৃন্দাবনে (ব্রজপর্ব, বনপর্ব, মহাবনপর্ব এবং সমগ্র)
যদি গৌর না হ'ত
রাজভূমি রাজস্থান (হিন্দী অনুবাদ প্রকাশিত
লীলাভূমি লাহুল
ও
হিমতীর্থ হিমাচল

লেখকের অন্যান্য জনপ্রিয় গ্রন্থ ঃ

গঙ্গাসাগর
চিত্রকূট (হিন্দী অনুবাদ প্রকাশিত)
জয়ন্তী জুরিখ
তমসার তীরে তীরে
পঞ্চ প্রয়াগ
পঞ্চবটী
বিগলিত করুণা জাহ্নবী যমুনা (অসমীয়া অনুবাদ প্রকাশিত
বৈষ্ণোদেবীর দরবারে
মানালীর মালঞ্চে
মায়াময় মেঘালয় (খাসিপাহাড় এবং গারোপাহাড় পর্ব)
রূপতীর্থ খাজুরাহো
লাদাখের পথে
সুন্দরের অভিসারে
সোনা সুরা ও সাকী
ও
হিমালয় (অমনিবাস ঃ প্রথম এবং দ্বিতীয় খণ্ড)



কিশ্‌তোয়ার ময়দান (প্যারেড গ্রাউণ্ড)



বাণ্ডারকোট, চন্দ্রভাগা ও চেনাবের সঙ্গম



পাতিমহলা। ডানদিকের দ্বিতীয় ঘরখানি বাটসাহেবের চায়ের দোকান ও বাসগৃহ।



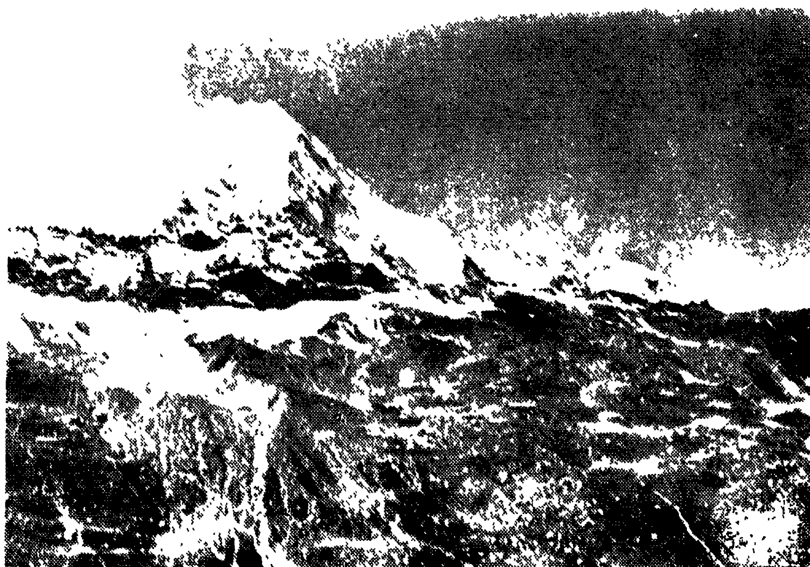
এখেলার পথে



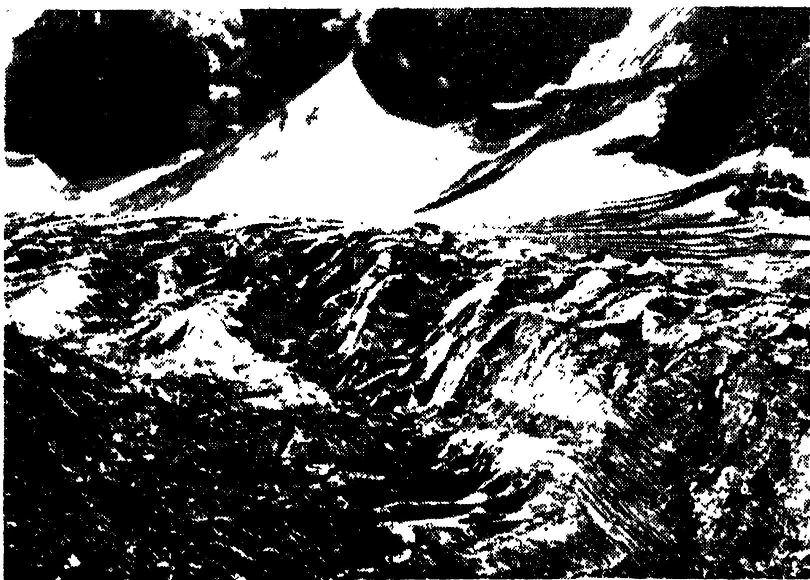
সেওয়াবাতি স্কুল



সোন্দার স্কুলের মাঠে ছাত্র ও শিক্ষকবৃন্দ। পেছনে বন-বিশ্রামগৃহ



সত্তরচিন থেকে ব্রহ্মা-১ পর্বত শিখর ও ব্রহ্মা হিমবাহ



ব্রহ্মা হিমবাহ



সোন্দার ছাড়িয়ে কিবার নালার পুল



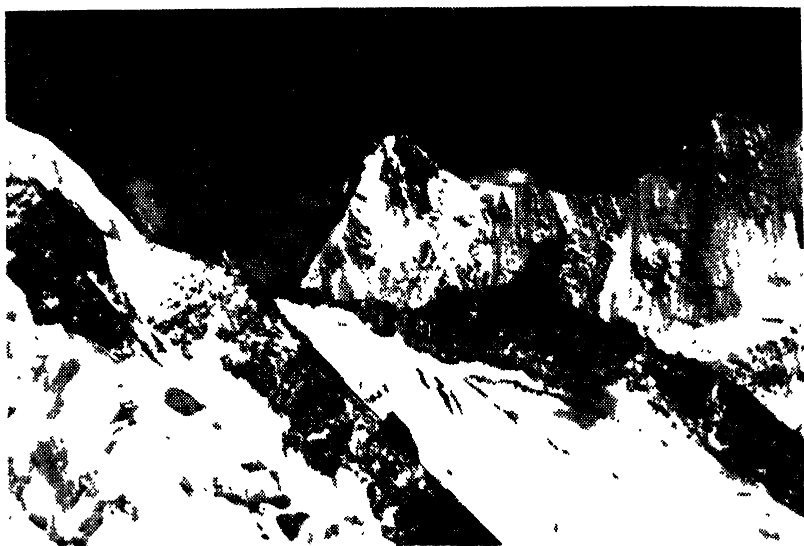
দোবাতি শিবির



মূল-শিবিরে মেস-টেন্ট্। শেরপা ও মালবাহকদের সঙ্গে।



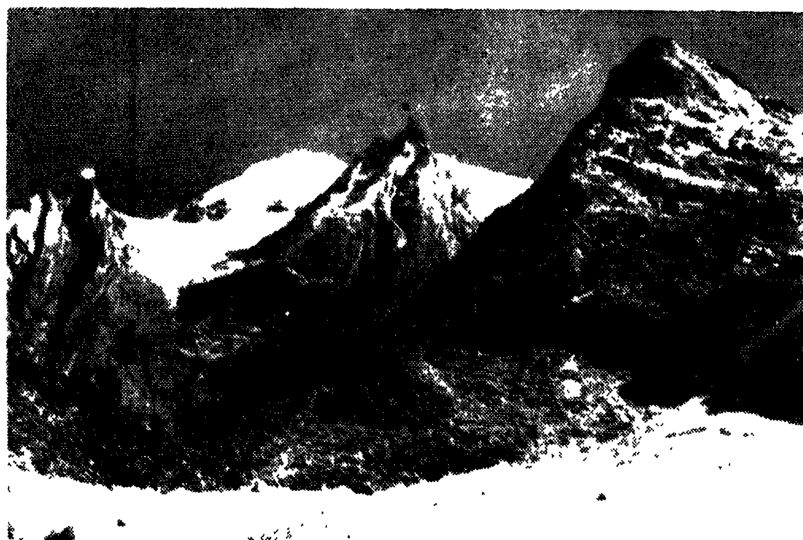
এক নম্বর শিবির। সামনে ব্রহ্মা পর্বত শিখর দেখা যাচ্ছে



সিক্‌ল মুন শিখর ও ব্রহ্মা হিমবাহ, এক নম্বর শিবির থেকে



তুষার ক্ষেত্রে দু-নম্বর শিবির



দু-নম্বর শিবির থেকে ব্রহ্মা-১ পর্বতশিখর



ব্রহ্মারাক্ষস। ব্রহ্মা পর্বতশিখরকে অবরোধ করে রাখা অসংখ্য অতিকায় তুষার গহ্বরের কয়েকটি

আদালতের সমন কিম্বা পুলিশের পরোয়ানা থেকে যদিওবা ছাড় পাওয়া যায়, হিমালয়ের আমন্ত্রণ উপেক্ষা করা যায় না। আর তা যায় না বলেই আজ আমি হিমালয়ে।

সত্যি বলতে কি এবারে আমার হিমালয়ে আসার কোন কথাই ছিল না, পর্বতাভিযান তো দূরের কথা। থাকবে কেমন করে? আমার এক ফরাসী বোন ভারত দর্শনে এসেছিল। তাকে নিয়ে প্রায় মাসখানেক দক্ষিণ-ভারত ভ্রমণ করেছি। তারপরে বম্বে গিয়ে তাকে বিমানে তুলে দিয়ে সবে দিনদশেক আগে কলকাতায় ফিরেছি। সুতরাং আমার এবছরের ভ্রমণ হয়ে গিয়েছে। বছরে একবারের বেশি বড়-ভ্রমণ হয়ে উঠে না।

কিন্তু কলকাতায় ফিরে এসেই শুনলাম অনুজপ্রতিম অমূল্য পা ভেঙ্গে বিছানায় শুয়ে আছে। ওকে দেখতে গেলাম। কিছুক্ষণ কথাবার্তার পরে অমূল্য হঠাৎ বলে উঠল—শঙ্কুদা, তোমাকে এবারে আমাদের সঙ্গে পর্বতাভিযানে যেতে হবে।

অবাক হয়ে প্রশ্ন করেছি—তুই পর্বতাভিযানে যাচ্ছিস!

—হ্যাঁ, যেতে তো হবেই। আগের থেকে সব ঠিক হয়ে আছে।

—কবে রওনা হচ্ছিস?

—৯ই সেপ্টেম্বর।

—সেকি! আজ যে পয়লা!

—হ্যাঁ।

—কিন্তু এই ভাঙা পা নিয়ে আটদিন পরে তুই পর্বতাভিযানে রওনা হতে পারবি?

—কেন পারব না? পাল্টা প্রশ্ন করেছে অমূল্য। বলেছে—পরশু প্লাস্টার কেটে দেবে। তারপরেও তো ছ'দিন বিশ্রাম নিতে পারছি।

ওর কথা শুনে হাসি পেয়েছে আমার। তবু বলেছি—আমার পা ভাঙ্গার পরে প্লাস্টার কেটে আমি একমাস বিশ্রাম করেছি। তারপরে প্রায় মাসছয়েক কলকাতার বাইরে যাই নি। পায়ের পরিচর্যা করেছি।

—সে তো জানি। তুমি কিছুদিন কোনচোকির 'নেচার কিওর' হাসপাতালেও ছিলে। কিন্তু তুমি দেখে নিও আমার ওসব কিছুই লাগবে না। তবে এবারে আমি আর মূল-শিবিরের ওপরে যেতে পারব না, আর তাই তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি। দুজনে পরামর্শ করে অভিযান পরিচালনা করা যাবে।

আবার হাসি পেয়েছে আমার। ১৯৬২ সাল থেকে অমূল্য পর্বতাভিযান পরিচালনা করে আসছে। কাজেই তার আমার সাহায্যের কোন প্রয়োজন থাকতে পারে না। তবু এ প্রসঙ্গে আর কথা না বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করেছি—স্বপন কি বলছে?

স্বপন মানে পর্বতারোহী ও বিলেত ফেরৎ অর্থোপেডিক সার্জন ডাঃ স্বপন রায় চৌধুরী। সে-ই আমার পা অপারেশন করেছিল এবং এখন অমূল্যের চিকিৎসক।

আমার প্রশ্নে অমূল্য যেন একটু বিব্রত হয়ে পড়ে। কিন্তু তা মুহূর্তের জন্য, তারপরেই সহাস্যে বলে উঠে—স্বপন পর্বতারোহী হলেও এম. এস., এফ. আর. সি. এস., ডাক্তার। সে বলেছে, অভিযানে গেলে আমাকে নিজ দায়িত্বে যেতে হবে। আমি তাই যাবো ঠিক করেছি।

এর পরে আর কথা চলে না। অতএব অন্য প্রশ্ন করেছি—এবারে কোথায় যাচ্ছিস?

—কিশ্‌তোয়ার-হিমালয়ে। কালীঘাটের ইন্‌স্টিটিউট অব্‌ মাউণ্টেনীয়ারিং এক্‌সপ্লোরেশনস এই অভিযানের আয়োজন করছেন। এবারে আমরা ২১,০৪৯ ফুট অর্থাৎ ৬,৪১৬ মিটার উঁচু ব্রহ্মা-১ পর্বতশিখরে বসে পিতামহের পুজো করব। তুমি তো এখনও হিমালয়ের এ অঞ্চলে যাও নি!

আমি মাথা নেড়েছি। সে আবার বলেছে—শঙ্কুদা, তুমি একবছরে গোমুখী ও গঙ্গাসাগরে গিয়েছো। এবারে চলো একবছরে কন্যাকুমারী ও কাশ্মীর ঘুরে আসবে।

প্রস্তাবটা প্রত্যাখ্যান করবার মতো নয়। এমন সুযোগ আর পাওয়া যাবে কি? তাছাড়া বিরাশি সালের পরে আমার আর হিমালয়ে যাওয়া হয় নি। তেরাশি সালে য়ুরোপ গিয়েছি, চুরাশি সালে পা ভেঙে ঘরে থেকেছি, পঁচাশি সালে আবার য়ুরোপে যেতে হয়েছে। সুতরাং সুযোগটি হাতছাড়া করা ঠিক নয়।

অতএব হিমালয়ের ডাকে সাড়া দিয়ে আমি ওদের সঙ্গী হয়েছি। গতকাল দুপুরে আমরা জম্মু পৌঁচেছি। আজ সকালে জম্মুতে কিশ্‌তোয়ারগামী এই বাসে উঠেছি। সকাল সাড়ে ছ'টায় বাস ছেড়েছে।

কিন্তু বাস কিংবা কিশ্‌তোয়ারের কথা পরে হবে, তার আগে আমার সঙ্গীদের সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিই।

নেতা অমূল্য সেন আমার পাঠক-পাঠিকাদের পূর্ব পরিচিত। আমার বিভিন্ন বইতে আমি তার কথা বলেছি। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একজন অফিসার। এখন বয়স ছেচল্লিশ। বিবাহিত, এক ছেলে ও এক মেয়ের বাবা। স্ত্রী দীপা হিমালয়-পাগল স্বামীর পর্বতারোহণে সর্বদা উৎসাহ দেয়।

দার্জিলিং হিমালয়ান মাউন্টেনীয়ারিং ইন্‌স্টিটিউট থেকে অমূল্য 'বেসিক', 'এ্যাড্‌ভান্স' এবং 'ইন্‌স্ট্রাক্টার' কোর্সের ট্রেনিং নিয়েছে। সে ১৯৬২ সাল থেকে পর্বতাভিযানে নেতৃত্বে করছে। অর্থাৎ এটি তার নেতৃত্বের রজতজয়ন্তী বর্ষ। সে চন্দ্রপর্বত (৬,৭২৮ মিঃ), কেদারনাথ ডোম (৬,৮৩১ মিঃ), রাধানাথ পর্বত (৬,৬১৭ মিঃ) ও পঞ্চচুলি (৬,৯০৪ মিঃ) শিখরে আরোহণ করেছে। পর্বতাভিযানে এটি তার দশম নেতৃত্ব। দু'বছর আগে এই ক্লাবের সদস্যদের নিয়ে সুদুর্গম সুদর্শন (৬,৫০৭ মিঃ) পর্বতশিখরে সে সফলকাম অভিযান পরিচালনা করেছে।

আমাদের সহনেতা গৌতম চক্রবর্তীর বয়স আঠাশ বছর। স্টেট ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়ায় কাজ করে। সে উত্তরকাশীর নেহেরু ইন্স্টিটিউট অব্ মাউন্টেনীয়ারিং থেকে বেসিক ট্রেনিং নিয়েছে। ৫,৮১৮ মিঃ উঁচু রুদ্রগয়রা শিখরে আরোহণ করেছে। ১৯৮৪ সালের সফলকাম সুদর্শন অভিযানেও সহনেতৃত্ব করেছে।

গৌতমের পরে বলতে হয় শ্রীকৃষ্ণের কথা, শ্রীকৃষ্ণ দাশগুপ্ত, আমাদের পর্বতারোহী সদস্য। সেও স্টেট ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়ায় কাজ করে এবং উত্তরকাশী থেকে বেসিক ট্রেনিং নিয়েছে। বয়স একত্রিশ। দীর্ঘদেহী ও সুদর্শন কৃষ্ণ সুদর্শন শিখরে আরোহণ করেছে।

তারপরে ছোটখাটো শিবু, শিবু দাস। বয়স ২৯। উৎসাহে ভরপুর। সে ডেকরেটিং ও ক্যাটারিং-এর ব্যবসা করে। পুজোর আগে অভিযানে এসে বহু টাকা হাতছাড়া করল। কিন্তু—এই লোকসানের জন্য তার বিন্দুমাত্র আফসোস নেই। কেনই বা থাকবে? হিমালয়ের নেশা যে ঘোড়দৌড়ের নেশাকেও হার মানায়।

শিবুও উত্তরকাশী থেকে বেসিক ট্রেনিং নিয়েছে। সেও রুদ্রগয়রা এবং সুদর্শন শিখরে আরোহণ করেছে।

আমাদের অপর তুই পর্বতারোহী সদস্য হল জগদীশ নস্কর ও তপন ঘোষ। তুজনেই উত্তরকাশী থেকে বেসিক ট্রেনিং নিয়েছে এবং রুদ্রগয়রা শিখরে আরোহণ করেছে। জগদীশের বয়স তেত্রিশ আর তপনের সাতাশ। জগদীশ পোর্ট ট্রাস্ট-এর কর্মী আর তপন কাজ করে কানাড়া ব্যাঙ্কে। জগদীশ সুদর্শন শিখরে আরোহণ করেছে। আর তপন আমাদের অভিযানের কোষাধ্যক্ষ।

অভিযানের ছ'জন পর্বতারোহী সদস্যের সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া গেল। ওরা ছাড়াও আমরা আরও ছ'জন সদস্য রয়েছি। আমাদের পরিচয় 'নন-ক্লাইম্বিং মেম্বার'। আমরা মূল-শিবিরে বসে ওদের শিখরারোহণে সাহায্য করব।

আমি ছাড়া আমার দলের বাকী পাঁচজন হল—মৃত্যুঞ্জয়, বিনয়, গোরাচাঁদ, শৈলেশ ও অমিতাভ। এরা কেউ ট্রেনিং নেয় নি, কিন্তু

সবাই হিমালয়ের দুর্গম পথে ও হিমবাহ অঞ্চলে পদচারণা করেছে। এবং এরা সবাই সফলকাম সুদর্শন অভিযানের সদস্য ছিল।

মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী ক্লাবের সম্পাদক ও অভিযানের ম্যানেজার চাকরি ও ব্যবসা করে। তার ডাকনাম জয়। সে সহনেতা গৌতমের বড় ভাই। বয়স একত্রিশ বছর। আগামী বছর বিয়ে করছে।

বিনয় ভট্টাচার্যের ডাক নাম টুলটুল। তার বয়স সাতাশ। অতিশয় উৎসাহী ও কর্মঠ সদস্য। একটা সওদাগরী অফিসে কাজ করে।

গোরাচাঁদ পাল ওদের দলে সবার বড় এবং সে-ই একমাত্র বিয়ে করেছে। বছর পাঁচেকের একটি মেয়ে আছে। গোরাও পোর্ট-ট্রাস্টের কর্মী। বয়স পঁয়ত্রিশ বছর।

শৈলেশ চক্রবর্তীর বয়স একত্রিশ। সে বিনয়ের সহকর্মী ও অভিযানের একজন উৎসাহী সদস্য। তার হাতের লেখাটা ভারী সুন্দর এবং গানের গলাটি বড়ই মিঠে।

অমিতাভ দেওয়ানজীর ডাকনাম রঞ্জু, আমরা বলি ডাক্তার। সে ডাক্তারের ছেলে। কিন্তু ডাক্তারী পাশ করা তো দূরের কথা, কোনদিন কম্পাউণ্ডারীও করে নি। সুতরাং সে হাফ ডাক্তার পর্যন্ত নয়। অথচ শেষ মুহূর্তে যখন নির্বাচিত ডাক্তার বলে বসলেন আসতে পারবেন না, তখন মুষড়ে পড়া অমূল্যকে ভরসা দিয়ে অমিতাভ বলেছে—তুমি এ ব্যাপারটা আমার ওপরে ছেড়ে দাও লীডার!

গৌতম ও টুলটুল ওকে সমর্থন করেছে—তুমি রঞ্জুর ওপরে অনায়াসে নির্ভর করতে পারো লীডার! রঞ্জু ওর বাবার কাছ থেকে চিকিৎসা বিদ্যার অনেকখানি আয়ত্ত করে নিয়েছে। আধুনিকতম ওষুধের ব্যবহার থেকে ইঞ্জেকশান দেওয়া পর্যন্ত সবই ওর নখদর্পণে।

গত দুদিনে তার কিছু প্রমাণ আমিও পেয়েছি। আর তাই সবার সঙ্গে আমিও অমিতাভকে ডাক্তার ডাকতে শুরু করেছি।

রঞ্জুর বয়স আঠাশ। চেহারাটি সুন্দর। একটা বড় কম্পানীতে

ভাল চাকরি করে। ছুটি পাবার অসুবিধে থাকায় ছুটি না নিয়েই অভিযানে চলে এসেছে। চাকরির কথা বাড়ি ফিরে ভাবা যাবে।

এই হল অভিযাত্রী সদস্যদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। এছাড়াও আমাদের দলে রয়েছে, দু'জন শেরপা পলদিন ও নিমা আর দু'জন উচ্চ-হিমালয়ের মালবাহক রাম সিং ও পেয়ার সিং। শেরপারা এসেছে দার্জিলিং থেকে আর মালবাহকরা উত্তরকাশী থেকে। কিন্তু তাদের কথা পরে হবে। এবারে আমি একটু নিজের কথা বলে নিই।

এতক্ষণ ধরে আমি যাদের সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিলাম, তাদের মধ্যে একমাত্র অমূল্য ছাড়া আর কারও সঙ্গেই আমার পরিচয় ছিল না। সত্যি বলতে কি হাওড়াতে রেলে উঠে প্রথম আলাপ হয়েছে। আমরা রেলে উঠেছি ৯ই সেপ্টেম্বর রাত দশটায়। আজ ১২ই সেপ্টেম্বর, এখন সকাল দশটা। মাত্র আড়াই দিন। কিন্তু এরই মধ্যে অপরিচয়ের সব ব্যবধান ঘুচে গিয়েছে। মনে হচ্ছে যেন কতকালের পরিচয়।

আমরা ৯ই সেপ্টেম্বর রাতে হিমগিরি এক্সপ্রেসে হাওড়া থেকে জম্মু রওনা হয়েছি। কিন্তু তখন আমরা মাত্র বারোজন, দশজন সদস্য ও দুজন শেরপা। গৌতম ও শিবু তিনদিন আগে উত্তরকাশী রওনা হয়ে গেছে। ওরা সাজ-সরঞ্জাম আনতে গিয়েছিল।

আমাদের ছোট অভিযান। সামান্য সাজ-সরঞ্জাম নিয়েই আমরা ব্রহ্মলোকে চলেছি। কিন্তু এটুকু যোগাড় করার জন্য অনেক হাঙ্গামা পোহাতে হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ইয়ুথ সার্ভিসেস, দার্জিলিং ও উত্তরকাশীর পর্বতারোহণ শিক্ষাকেন্দ্র থেকে সাজ-সরঞ্জাম আনতে হয়েছে। তপন ও জগদীশ গিয়েছিল দার্জিলিং আর গৌতম ও শিবু উত্তরকাশী। রাম ও পিয়ারকে নিয়ে ওরা গতকাল শেষরাতে সাহারাণপুর স্টেশনে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। আর তখন থেকেই আমরা ষোলজন।

আগেই বলেছি আজ সকাল সাড়ে ছ'টায় জম্মু থেকে আমাদের বাস ছেড়েছে। উধমপুর পার হয়ে এসেছি। বাস শ্রীনগরের সেই

সুপরিচিত পথ ধরেই এগিয়ে চলেছে। এই পথে আমরা বাটোট পর্যন্ত যাবো।

বাটোট আমার পরিচিত জায়গা। শ্রীনগর কিংবা পহেলগাম যাওয়া-আসার পথে বেশ কয়েকবার বাটোটে দুপুরের খাবার খেয়েছি। বাটোটে আমিষ ও নিরামিষ দুরকম খাবারই বেশ ভাল পাওয়া যায়।

সকালে মালপত্র গোছগাছ করে বাসে তোলার হাঙ্গামায় শুধু চা-বিস্কুট খেয়ে রওনা হতে হয়েছে। পথে উধমপুরে গাড়ি থেমেছে মাত্র বিশ মিনিট। তারই মধ্যে জয় আমাদের চানা-পুরী ও চা খাইয়েছে। কিন্তু পাহাড়ীপথের ঝাকুনি আর হিমালয়ের স্নিগ্ধ সমীরে সে খাবার বহুক্ষণ হজম হয়ে গিয়েছে। এখন আমরা বাটোটের পথ চেয়ে রয়েছি।

যথাসময়ে অর্থাৎ দুপুর বারোটায় বাস বাটোট পৌছল। সহযাত্রীরা সবাই উল্লসিত। মধ্যাহ্নে মধ্যাহ্ন-ভোজন সমাধা করা যাবে।

কিন্তু একি কাণ্ড! দোকান-পাট সব বন্ধ কেন? আজ কি এখানে বাজার বন্ধের দিন? কিন্তু খাবারের দোকান বন্ধ হবে কেন?

বাটোট বেশ ব্যস্ত জায়গা। অথচ আজ পথ প্রায় জনহীন। কেবল কয়েকজন যুবক রাস্তার মাঝে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে কি যেন বলছে। আমাদের থামতে নিষেধ করছে কি? হ্যাঁ তাই। ওরা আমাদের চলে যেতে বলছে। কিন্তু কেন?

কণ্ডাক্টর গম্ভীর স্বরে জানায়—বন্‌ধ।

আঁতকে উঠি। বহুক্ষণ ধরে আশায় ছিলাম, এখানে গরম গরম ভাত ডাল ও সবজি পেটে পড়বে, জঠরাগ্নি নির্বাপিত হবে। অথচ একি হোল?

যা হবার তাই হয়েছে। ভারত যে স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশ। আর বাটোট আমার ভারতভূমিরই একটি অংশ। অতএব এখানে বন্‌ধ থাকবে না কেন? রাজনৈতিক ফয়দা তোলার সবচেয়ে সহজ উপায় কাজ বন্ধ করা। আর কয়েক ডজন দাঙ্গাবাজ সক্রিয় 'ক্যাডার'

থাকলেই একটা মহানগরীর জীবনযাত্রা কয়েক মিনিটে স্তব্ধ করে দেওয়া যায়। ফলে বন্‌ধ এখন আসমুদ্র-হিমাচলকে অক্টোপাসের মতো নাগপাশে বন্দী করে ফেলেছে।

বাটোট বাজারে বাস থামল না। আমরা এগিয়ে চললাম। বাটোট ছাড়িয়ে শ্রীনগরের পথে খানিকটা এগিয়ে আসতেই দেখা হল চন্দ্রভাগার সঙ্গে। বহুদিন বাদে দেখা। লাদাখের পথে শেষবার কাশ্মীর এসেছি পাঁচ বছর আগে ১৯৮১ সালে। আর চন্দ্রভাগার জন্মভূমি লাহুলে গিয়েছি বিশ বছর আগে। আজ তাই চন্দ্রভাগাকে আবার কাছে পেয়ে ভারী আনন্দ হচ্ছে।

কিন্তু আজ শ্রীনগরের পথ আমাদের পথ নয়। তাই চন্দ্রভাগার তীর ধরে উত্তরে অর্থাৎ রামবানের দিকে না এগিয়ে বাস ডাইনে বাঁক নিল। নিম্ন-চন্দ্রভাগার পথ ছেড়ে আমরা উচ্চ-চন্দ্রভাগার তীরপথ ধরে দক্ষিণ-পূর্বে এগিয়ে চলি। বলাবাহুল্য এ পথটি শ্রীনগর-পথের মতো মসৃণ ও প্রশস্ত নয়। তাহলেও এটি জাতীয় সড়ক নম্বর 'ওয়ান বি'। এখন পথটি প্রশস্ত করার চেষ্টা চলেছে। ফলে মাঝে মাঝেই মাটি আর পাথরের স্তূপে প্রায় অগম্য হয়ে উঠেছে।

জম্মু থেকে বাটোট ১২০ কিলোমিটার আর বাটোট থেকে কিশ্‌তোয়ার ১০৯ কিলোমিটার। তাই ভেবেছিলাম সাড়ে পাঁচ ঘণ্টায় যখন বাটোট এসেছি, তখন কিশ্‌তোয়ার পৌছতে আর ঘণ্টা পাঁচেক সময় লাগবে। কিন্তু এখন পথের হাল দেখে মনে হচ্ছে, তা সম্ভব হবে না।

তবে পথটি ভারী ভাল লাগছে। শ্রীনগর পথের মতো অত সবুজ নয়, কিন্তু বড়ই বৈচিত্র্যময়। এ যেন হঠাৎ এক নতুন হিমালয়ে এসে পৌছলাম।

না, ঠিক নতুন বলব না। একে আমি যেন দেখেছি, দেখেছি হিমাচলে—কেলং ও মণিমহেশের পথে পথে। কাশ্মীর কিম্বা কুলুর মতো কোমল ও সবুজ যেমন নয়, তেমনি লাদাখের মতো নয় রুক্ষ ও কঠিন। দুইয়ের মাঝামাঝি এক বিচিত্র-সুন্দর কোমল-কঠিন হিমালয়। তবে

লাদাখের সঙ্গে যেন মিল বেশি। চন্দ্রভাগার ওপারে খাড়া উঠে যাওয়া পাহাড়ে নানা রঙের পাথরগুলোর দিকে তাকিয়ে আমার বার বার লাদাখের কথাই মনে পড়ে যাচ্ছে।

পথ শুধু দুর্গম নয়, সেই সঙ্গে সুন্দর ও ভয়ঙ্কর। ডানদিকে পথের পাশে কোথাও পাহাড়, কোথাও বন, কোথাওবা দু-চারটি বাড়ি-ঘর। আর বাঁদিকে বহু নিচে চঞ্চলা চন্দ্রভাগা। বিশ্ববিখ্যাত পর্বতারোহী ও সুলেখক ক্রিস বনিংটন এই পথের বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখেছেন— '…driving over the most spectacular route I have ever seen, along the precipitous sides of a deep-out gorge which, in places dropped sheer for over a thousand feet into a racing glacier river.'

বাটোট থেকে প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিটে ১৫ কিলোমিটার একটানা পথ চলে একটি ছোট জনপদ ও বাজার পাওয়া গেল। জায়গাটির নাম রামগড়। ড্রাইভার গাড়ি থামায়। সে-ও ক্ষুধার্ত।

নেমে আসি গাড়ি থেকে। তিনটি খাবারের দোকান রয়েছে। কিন্তু কোন্‌টিতে যাবো, তা ঠিক করবে জয়। সে আমাদের ম্যানেজার। অতএব জয় দোকান নির্বাচনের জন্য এগিয়ে যায়। আমরা খিদে চেপে চুপচাপ বাসের পাশে দাঁড়িয়ে থাকি। উপায় নেই, নেতার নির্দেশ। পর্বতাভিযানে না খেয়ে থাকার রেওয়াজ আছে কিন্তু শৃঙ্খলাভঙ্গের নিয়ম নেই।

মিনিট দশেক বাদে জয় ফিরে আসে, জানায়—তিনটি দোকানের দুটিতে কোন 'Meal' নেই, চা-বিস্কুট পাওয়া যাবে। আর একটিতে আট প্লেটের মতো ডাল-ভাত ও সবজি আছে। সেই খাবারই ষোলজনকে খেতে হবে। জনপ্রতি তিনটাকা করে দিতে হবে।

অগত্যা আধপেটা খেতে হল। তাহলেও জঠরাগ্নির জ্বালা অনেকখানি প্রশমিত হল। খাবার পরেই ড্রাইভার বাস ছেড়ে দিল।

কিশ্‌তোয়ারবাসী জনৈক যুবক আমার পাশের সিটে বসেছেন। জম্মু থেকে গাড়ি ছাড়ার পরে এতক্ষণ তার কোন কথা শুনি নি।

এবারে তিনি বলে ওঠেন—বাটোট বন্ধ হওয়ায় একটা লাভ হল।

ভদ্রলোক কি আমার সঙ্গে ইয়ার্কি করছেন? বাটোট বন্ধ হওয়ায় এতক্ষণ খিদেয় কষ্ট পাবার পরে আধপেটা খেয়ে খুশি থাকতে হচ্ছে। তাই সবিস্ময়ে জিজ্ঞেস করি—কি বলুন তো?

—বাটোটে আমাদের একঘণ্টা থামার কথা ছিল, কিন্তু এখানে খাবার না থাকায় আধঘণ্টার বেশি থামতে হল না। ফলে আধঘণ্টা সময় বেঁচে গেল।

ভদ্রলোকের কথা শুনে লজ্জা পাই। খারাপ লাগে আমার। জয়ের তৎপরতায় আমরা তবু আধপ্লেট ডাল-ভাত পেয়েছি, আর তাঁকে চা-বিস্কুট খেয়েই বাসে উঠতে হয়েছে। বড় দুঃখে তিনি এই রসিকতাটুকু করলেন।

একটু হেসে প্রশ্ন করি—আমরা কখন কিশ্‌তোয়ার পৌঁছব।

—জম্মু থেকে কিশ্‌তোয়ার ২২৯ কিলোমিটার। সাধারণতঃ পাহাড়ী পথে বাসে করে এই দূরত্ব অতিক্রম করতে ঘণ্টাদশেক সময় লাগে। কিন্তু বাটোট থেকে পথ ভাল নয় বলে আমাদের লাগে তেরো ঘণ্টার মতো। আজ আধঘণ্টা বেঁচে যাওয়ায় আশা করছি সাতটার আগেই পৌঁছে যাবো, অবশ্য যদি বৃষ্টি না নামে।

মাঝখানে কিছুক্ষণের জন্য চন্দ্রভাগা দূরে সরে গিয়েছিল। আমরা একটা পাহাড়ী নদীর সংকীর্ণ উপত্যকা দিয়ে এগিয়ে এসেছি। পথটি যেমন দুর্গম তেমনি বিপজ্জনক। এখন আবার চন্দ্রভাগার তীরে ফিরে এসেছি। তাই বার বার চন্দ্রভাগাকে দেখছি। দেখছি আর ভাবছি ওর কথা। ওর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা শ্রীনগর যাবার পথে ১৯৬২ সালে। তারপরে ওকে দেখেছি ওর জন্মভূমি লাহুলের তাণ্ডিতে। বড়ালাচা গিরিবর্ত্মের দক্ষিণ-পূর্বপ্রান্তের তুষারক্ষেত্র থেকে সৃষ্ট হয়েছে চন্দ্রা আর ঐ একই গিরিবর্ত্মের উত্তর-পশ্চিম দিকে জন্ম নিয়েছে ভাগা। চন্দ্রা প্রথমে দক্ষিণ-পূর্ববাহিনী ও পরে উত্তর-পশ্চিমবাহিনী হয়ে লাহুল উপত্যকার পূর্ব ও দক্ষিণদিক পরিক্রমা করে তাণ্ডি পৌঁচেছে। আর ভাগা দক্ষিণ প্রবাহিনী হয়ে লাহুলের পশ্চিমদিক

পরিক্রমা করে তাণ্ডি এসেছে। মিলিত হয়েছে চন্দ্রার সঙ্গে।' মিলিত ধারা চন্দ্রভাগা নাম নিয়ে উত্তর-পশ্চিমে প্রবাহিত হয়ে হিমাচল অতিক্রম করে জম্মুতে এসেছে। তারই তীর দিয়ে এগিয়ে চলেছে আমাদের বাস।

জম্মু থেকে চন্দ্রভাগা চলে গেছে পাকিস্তানে। একে একে মিলিত হয়েছে বিতস্তা, ইরাবতী, বিপাশা ও শতদ্রুর সঙ্গে। সেই সম্মিলিত সুবিশাল নদীর নাম পঞ্চনদ। অবশেষে পাকিস্তানের মিঠানকোটে পঞ্চনদ সিন্ধুনদে বিলীন হয়েছে।

চন্দ্রভাগা বৈদিক যুগের নদী। ঋগ্বেদে এই নদীকে বলা হয়েছে অসিক্নী, মানে কৃষ্ণবর্ণা নদী। এই নদীর জল নাকি সত্যই একটু কালচে। কি জানি আমরা তো এখান থেকে বুঝতে পারছি না।

মহাভারতের সভাপর্বে বলা হয়েছে—'কেউ যদি উপবাসী থেকে সাতদিন চন্দ্রভাগার পুণ্যধারায় অবগাহন করে, তাহলে তার মন পাপমুক্ত হয়, সে মহামুনি হয়ে যায়।'

মহামুনি হতে চাই না, কিন্তু চন্দ্রভাগার দিকে তাকালেই অবগাহন করতে ইচ্ছে করছে। অথচ এখন সে সুযোগ নেই। সুতরাং শুধু লুব্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকি।

বাস চলেছে এগিয়ে। মাঝে মাঝে গ্রাম। গ্রামের মানুষরা বাসে উঠছেন, উঠছে স্কুলের ছেলে-মেয়েরা। বাসে বসার জায়গা নেই। তারা দাঁড়িয়ে থাকছে। পাহাড়ী পথে চলমান গাড়িতে দাঁড়িয়ে থাকা যেমন কষ্টকর, তেমনি বিপজ্জনক। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় বাস খুবই কম। তাই এরা বিপদ মাথায় নিয়ে কষ্ট করে দাঁড়িয়ে থাকছে।

আর শুধু বাসের ভেতরের কথাই বা বলছি কেন? বাসের ছাদেও লোক রয়েছে। বেশ কয়েকজন যাত্রী রামগড় থেকে আমাদের মালপত্রের ওপর চেপে বসেছেন। আঁকাবাঁকা দুর্গম পথ, মাঝে মাঝে পাথর পড়ে প্রায় অগম্য। হেলে দুলে বাস চলেছে,

তার ওপরে এত যাত্রী। ড্রাইভার যদি মুহূর্তের তরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে, তাহলে··· ।

যাক্ গে, হিমালয়ের পথে বেরিয়ে এসব কথা ভাবতে নেই। জানি গতবছর কলকাতার একটা ট্যুরিস্ট্ বাস শ্রীনগর থেকে ফেরার পথে ভুল করে এ রাস্তায় চলে এসেছিল। আর ফিরে যেতে পারে নি।

ড্রাইভার ভুল বুঝতে পেরে গাড়ি ঘোরাতে চায়। সমতলের চালক, হিমালয়ের পথে গাড়ি চালাবার অভিজ্ঞতা ছিল না। তার ওপরে সংকীর্ণ পথ ও রাতের অন্ধকার, ফলে যা হবার তাই হয়েছে। ড্রাইভার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছে, বাস গড়িয়ে পড়েছে চঞ্চলা চন্দ্রভাগায়। যাত্রীরা প্রায় সকলেই সলিল সমাধি লাভ করেছেন।

আগেই বলেছি, হিমালয়ের পথে বেরিয়ে এসব কথা ভাবতে নেই। আর এসব ভাবনা যে সত্যিই অর্থহীন। চিরদিন থাকব বলে আমরা কেউ পৃথিবীতে আসি নি। একদিন সবাইকে এই সুন্দর ভুবন ছেড়ে চলে যেতে হবে। সুতরাং সেই যাওয়া যদি হিমালয়ের পথে হয়, তাহলে তার চেয়ে আনন্দের আর কি হতে পারে?

বেলা তিনটের সময় বাস পুল-ডোডা পৌঁছল। এ জায়গাটা জেলাসদর ডোডা ও মহকুমা সদর কিশ্তোয়ার পথের জংশন। ডোডা চন্দ্রভাগার অপর তীরে পাহাড়গুলোর পেছনে। যাতায়াতের জন্য একটি পুল রয়েছে চন্দ্রভাগার ওপরে। নিয়মিত বাস যাতায়াত করে।

ডোডার যাত্রীরা তাই নেমে পড়লেন এখানে। বাসের ভিড় কমে গেল। আমরাও হাত-পা খেলাবার জন্য বাস থেকে নেমে আসতে পারলাম। জয় একগ্লাস করে চা মঞ্জুর করল। চা খেয়ে আবার উঠে আসি বাসে। বাস এগিয়ে চলে।

ভারত স্বাধীন হবার আগে এসব অঞ্চল জম্মু দেশীয়রাজ্যের উধমপুর পরগণার অন্তর্গত ছিল। দেশ স্বাধীন হবার পরে পার্বত্য প্রকৃতির কথা বিবেচনা করে ১৯৪৮ সালে এই অঞ্চলকে একটি পৃথক

জেলার মর্যাদা দেওয়া হয়। সেই থেকেই ডোডা জেলাসদর, আর তার নামেই জেলার নাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা যে উদ্দেশ্য নিয়ে নতুন জেলা গঠন করা হয়েছিল, উনচল্লিশ বছরেও সে উদ্দেশ্য সফল হয় নি। ডোডা আজও জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যের সবচেয়ে অনুন্নত জেলা।

পুল-ডোডা থেকে কিশ্‌তোয়ার ৫৭ কিলোমিটার। পথের অবস্থা থেকে অনুমান করছি আরও ঘণ্টাতিনেক সময় লাগবে।

বিকেল পৌনে পাঁচটার সময় আবার বাস থামল। জায়গাটার নাম থাতরি। কয়েকজন যাত্রী নেমে গেলেন বাস থেকে। এখন আর বাসের ছাদে কোন যাত্রী নেই। ভেতরেও মাত্র আট-দশজন নারী-পুরুষ দাঁড়িয়ে। তাহলেও আমরা নামতে পারলাম না। কণ্ডাক্টার বাধা দিয়ে বলল—এখানে বাস দাঁড়াবে না। এঁরা নেমে গেলেই বাস ছেড়ে দেব।

অতএব চা খাবার সময় নেই। ম্যানেজার স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ে। ষোল কাপ চা। কম করেও আট টাকা বেঁচে গেল। হঠাৎ গৌতম বলে ওঠে—শঙ্কুদা, ঐ দেখুন, ওপরে কিশ্‌তোয়ার দেখা যাচ্ছে।

তাড়াতাড়ি সেদিকে তাকাই। দূরে অনেকটা উঁচুতে পাহাড়ের ওপরে বহু বাড়ি-ঘর।

শিবু বলে—ওখানে পৌঁছুলে মনে হবে পাহাড় নয়, মালভূমি।

—অথবা বেশ বড় একটা পাহাড়ের মাথা কেটে কারা যেন সুবিশাল সবুজ সমতলে রূপান্তরিত করেছে। জগদীশ যোগ করে।

শুধু ওরা তিনজন নয়, ওদের সঙ্গে তপন, কৃষ্ণ, গোরা, টুলটুল, শৈলেশ এবং জয় কিশ্‌তোয়ার এসেছে। একবার নয় দুবার, ১৯৮০ ও ১৯৮৫ সালে! এসেছে ব্রহ্মা-১ পর্বতের পথসমীক্ষা করতে। ব্রহ্মলোক অর্থাৎ ব্রহ্মা ও ব্রহ্মানী শৃঙ্গের পাদদেশে পৌঁছবার দুটি পথ। একটি কিবার নালা হয়ে সোনামার্গী, আরেকটি নাম্থ্ নালা হয়ে সত্তরচিন। ওরা দুবারে দুটি জায়গাই দেখে গিয়েছে।

কিন্তু ব্রহ্মলোকের কথা এখন থাক, কিশ্‌তোয়ারের কথাও পরে হবে। আপাতত আমাদের বাঁদিকের উপত্যকাটিকে দেখা যাক। নদীর তীরে প্রায় সমতলে তৈরি হয়েছে বাঁধানো পথ, সারি সারি গুদাম আর বাড়ি-ঘর। দাঁড়িয়ে আছে অনেকগুলো গাড়ি। বুঝতে পারছি এখানে কোন কর্মযজ্ঞ শুরু হয়েছে। কিন্তু কি ?

তপন বলে—দুল হস্তি পরিকল্পনা বা Dul Hasti Project. এই পরিকল্পনা রূপায়িত হবার পরে কিশ্‌তোয়ার অঞ্চলের চেহারা পালটে যাবে।

—কিন্তু পরিকল্পনাটি কি ?

—বিশদভাবে বলতে পারব না। কৃষ্ণ বলে—তবে ৮৫ সালে এখানে এসে যতটুকু শুনেছি, ততটুকু বলতে পারি।

—বেশ তাই বল।

কৃষ্ণ শুরু করে—এটি একটি Hydro Electric Project. তিনবছর আগে National Hydro Electric Power Corporation of India এই পরিকল্পনা হাতে নিয়েছেন। রাস্তা এবং কলোনী তৈরির কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

—কত খরচ পড়বে ? কৃষ্ণ থামতেই প্রশ্ন করি।

কৃষ্ণ উত্তর দেয়—৬৭০ কোটি টাকার পরিকল্পনা। শুনছি ৩৯০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে এখানে।

—এর নাম দুল হস্তি পরিকল্পনা কেন ? অমূল্য জিজ্ঞেস করে।

—এ জায়গাটার নাম দুল। এখানে চন্দ্রভাগার ওপরে বাঁধ তৈরি করে ১৩ কিলোমিটার লম্বা একটা Underground Tunnel-এর ভেতর দিয়ে জল নিয়ে যাওয়া হবে হস্তি। সেখানে তৈরি হবে Power-house. তাই এর নাম দুল-হস্তি পরিকল্পনা।

শিবু থামতেই জগদীশ বলে—শুনেছি, ভারত সরকার শিগ্‌গীরই এক ফরাসী কম্পানীর সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন করছেন। তারা বলেছেন আট বছরের মধ্যে এ পরিকল্পনা পূর্ণ রূপায়িত হবে।

—পরিকল্পনাটি রূপায়িত হলে এই অবহেলিত অঞ্চল অনেকখানি উন্নত হয়ে উঠবে। গৌতম যোগ করে।

ইংরেজীতে একটা কথা আছে—'বেটার লেট দ্যান নেভার'। গৌতমের কথা শুনে সেই কথাটাই মনে পড়ে গেল। কিশ্‌তোয়ারের অতীত যথেষ্ট গৌরবময় হলেও বর্তমানের কিশ্‌তোয়ার বড়ই অবহেলিত। অথচ স্বাধীনতার পর থেকেই জম্মু-কাশ্মীরের উন্নয়নের জন্য ভারত সরকার অত্যন্ত উদারহস্তে সাহায্য করে চলেছেন। সে সাহায্যের সামান্য অংশই ডোডা জেলার ভাগ্যে জুটেছে। ফলে এটি আজও এ রাজ্যের সবচেয়ে পেছিয়ে থাকা জেলা। সেই জেলায় এতবড় একটা প্রকল্প রূপায়িত হচ্ছে এর চেয়ে আনন্দ-সংবাদ আর কি হতে পাবে? অনেক দেরি হয়ে গেছে। তা হোক গে, তবু আমরা সানন্দে স্বাগত জানাবো। আশা করব, ভবিষ্যত ভারতের উন্নয়নে কিশ্‌তোয়ার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করবে।

নদীতীর থেকে সিঁড়ির মতো আঁকাবাঁকা পথ, ধাপে ধাপে ওপরে উঠে গিয়েছে। একটার পর একটা 'loop' পার হয়ে বাস ফুসতে ফুসতে ওপরে উঠছে। নিচের দিকে তাকালে মনে হচ্ছে, পথ নয় একটা আঁকাবাঁকা কালো ফিতে পাহাড়ের গায়ে জড়িয়ে আছে। আমাদের কয়েক ধাপ ওপরে আরেকটা বাস ওপরে উঠছে। জানি বলেই বলছি 'বাস,' নইলে মনে হচ্ছে একটা খেলনা। কি জানি ওখান থেকে আমাদের বাসকেও বোধকরি তা-ই মনে হচ্ছে।

অবশেষে উঠে এলাম সমতলে। শুধু সুন্দর নয়,জায়গাটার অবস্থান সত্যই বিস্ময়কর। চারিদিকে পাহাড় দিয়ে ঘেরা এক সুবিশাল সমতল। তারই ওপর দিয়ে বাঁধানো পথ। পথের দুদিকে বাড়ি-ঘর —শহর কিশ্‌তোয়ার। তাড়াতাড়ি ঘড়ি দেখি, সাড়ে ছ'টা। সারাদিনের ক্লান্তিকর বাসযাত্রার যতি আসন্ন। মনটা আনন্দে ভরে ওঠে।

পথের পাশে দোকান-পাটের মাঝে অনেকখানি জায়গা জুড়ে বাসস্ট্যাণ্ড। আরও কয়েকখানি বাস দাঁড়িয়ে রয়েছে। সেখানেই এসে থামল আমাদের বাস।

এখনও দিনের আলো রয়েছে। তবে আকাশে মেঘ। যেকোন সময় বৃষ্টি নামতে পারে। মালপত্র ভিজে যাবে। অনেক মাল।

সবাই হাত লাগিয়ে আধঘণ্টার মধ্যে হোটেলে চলে আসা গেল। বাসস্ট্যাণ্ডের কাছেই বড়রাস্তার ধারে হোটেল, নাম 'মায়া হোটেল'।

নিচের তলায় একখানি ও দোতলায় তিনখানি ঘর নেওয়া হয়েছে দৈনিক ভাড়া পয়ষট্টি টাকা। প্রতি ঘরে দুখানি করে খাট। আমরা ষোলজন। সুতরাং দু'জন করে শুতে হবে।

দোতলার প্যাসেজে রান্নার ব্যবস্থা হয়েছে। সবাই শ্রান্ত এবং ক্ষুধার্ত। তাই চায়ের পরেই খিচুরি চড়ল।

পেটভরা খিচুরি খেয়ে কোমল শয্যায় শুয়ে পড়া গেল। ব্রহ্মলোকে যাবার পথে আজই আমাদের শেষ আরাম। সুতরাং রাতের ঘুমকে রসিয়ে উপভোগ করতে হবে। তাড়াতাড়ি চোখ বুজি।

॥ দুই ॥

সকালে ঘুম ভাঙল গাড়ির শব্দে। বাসস্ট্যাণ্ডের কাছে বড় রাস্তার ধারে হোটেল। আর কিশ্‌তোয়ারের একমাত্র পরিবহন মোটর গাড়ি। তাই সকাল থেকেই গাড়ির শব্দ শুরু হয়ে গেছে।

'স্লীপিং-ব্যাগ'-এর 'জীপ' খুলে উঠে বসি। কিশ্‌তোয়ারের উচ্চতা মাত্র ৫০০০ ফুট। তার ওপরে সবে সেপ্টেম্বর মাস। স্লীপিং-ব্যাগ গায়ে দেবার মতো শীত নয়। কিন্তু গতকাল রাতে বেশ এক পসলা বৃষ্টি হওয়ায় একটু শীত-শীত করছিল। সুতরাং এযাত্রায় প্রথম শ্লীপিং-ব্যাগ গায়ে দেবার সুযোগ পেয়ে তার সদ্ব্যবহার করেছি।

ঘড়ি দেখি সাড়ে পাঁচটা বাজে। এটা পশ্চিম হিমালয় বাইরে নিশ্চয়ই এখনও অন্ধকার রয়েছে। তা থাক গে। আজ অনেক কাজ। সবাইকে জাগানো যাক।

কিন্তু গরম চায়ের মগ মুখের সামনে না ধরলে কেউ স্লীপিং-ব্যাগের জীপ খুলবে না। সবাই শ্রান্ত। তাছাড়া এখানেই আরামে শেষ ঘুম। আজ রাত থেকেই শোবার কষ্ট শুরু হয়ে যাবে।

মুখ-হাত ধুয়ে নিচে নেমে আসি। রাম সিং ও পেয়ার সিং-কে ডেকে তুলি। ওদের চা বানাতে বলি।

চা পেয়ে একে একে উঠে বসল সবাই। উঠতে চাইল না কেবল অমূল্য। সে সারারাত ঘুমুতে পারে নি, পায়ের ব্যথায় কষ্ট পেয়েছে। পাবারই কথা। পর্বতারোহী ডাক্তার স্বপনের পরামর্শ অগ্রাহ্য করে অমূল্য ভাঙা পায়ের প্লাস্টার কেটে এক সপ্তাহের মধ্যে পর্বতাভিযানে চলে এসেছে। স্বপন তাকে একমাস বাড়িতে বিশ্রাম নিতে বলেছিল

কথাটা শুনেই রঞ্জু বলে ওঠে—সেকি অমূল্যদা, আমাকে ডাকলেন না কেন? আমি একটা ওষুধ দিয়ে দিতাম। আপনার ব্যথা কমে যেত, ঘুমুতে পারতেন।

—তোমরা শুয়ে পড়েছো, সবাই ক্লান্ত। তাই আর ডাকাডাকি করি নি! অমূল্য জবাবদিহি করে।

'ডেপুটি-লীডার' গৌতম আপত্তি করে—কাজটা ঠিক ক'রো নি 'লীডার'! আগামীকাল থেকে 'ট্রেকিং' শুরু, প্রথম দিনেই কম করে ১৬ / ১৭ কিলোমিটার পথ হাঁটতে হবে। পথ ভাল নয়, যেমন চড়াই, তেমনি উৎরাই। তার ওপরে সারাদিন রোদ পাবে, পথের পাশে গাছপালা প্রায় নেই বললেই চলে।

—আচ্ছা, একটা কাজ করলে হয় না! শিবু বলে—লীডার তো পাতিমহলা থেকে সোন্দার পর্যন্ত ঘোড়ায় যেতে পারে। তাতে ছুদিনের হাঁটা বেঁচে যাবে।

সেচ্চার স্বরে শিবুর প্রস্তাব সমর্থন করে অপর চার পর্বতারোহী গৌতম, জগদীশ, কৃষ্ণ ও তপন। ওদের সবারই পরিচিত পথ, ওরা সমীক্ষায় এসেছিল। শুধু ওরা নয়, ম্যানেজার জয় ও মেডিক্যাল অফিসার রঞ্জু সমর্থন করে শিবুকে। শৈলেশ বিনয় এবং গোরাও মাথা নাড়ে।

কিন্তু যার সম্পর্কে এত আলোচনা, সেই নেতা সহাস্যে বলে ওঠে—অভিযানের নেতা ঘোড়ায় চেপে ব্রহ্মলোকে গেলে যে ব্রহ্মাজী বিগড়ে যাবেন!

—অর্থাৎ আপনি ঘোড়ায় চড়বেন না? এই তো? শৈলেশ সোজাসুজি প্রশ্ন করে।

অমূল্য উত্তর দেয়—না, মানে অভিযানের নেতা ঘোড়ায় চড়ে মূল-শিবিরে গিয়েছে, একথা প্রচারিত হলে শুধু আমার নয়, তোমাদেরও পর্বতারোহণ ছেড়ে দিতে হবে।

—১৯৬৪ সালের প্রি-এভারেস্ট অর্থাৎ নন্দাদেবী অভিযানের নেতা কিন্তু হেলিকপ্টারে করে মূল-শিবিরে গিয়েছিলেন। আমি আর চুপ করে থাকতে পারি না।

অমূল্য আবার একটু হাসে। হেসে আবহাওয়া হাল্কা করার চেষ্টা করে। তারপরে বলে—তা গিয়েছিলেন। কিন্তু ওসব হল

গিয়ে সরকারী পর্বতাভিযান। মূল-শিবির কেন ওঁরা হেলিকপ্টারে করে শিখরেও চলে যেতে পারেন, আমরা পারি না। কারণ ওঁরা গৌরী সেনের টাকায় হিমালয়ে আসেন আর আমরা এসেছি ভিক্ষে করে। ওঁদের মতো আচরণ করলে পরের বার আর কেউ আমাদের ভিক্ষে দেবে না।

অর্থাৎ ভাঙা পা নিয়েও অমূল্য হেঁটেই যাবে। অতএব কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। তার চাইতে কাজে লেগে যাওয়া যাক। আজ আমাদের অনেক কাজ। বাড়তি মাল গুছিয়ে এখানে রেখে যাবার ব্যবস্থা করতে হবে। সাজ-সরঞ্জাম ও রসদ 'রি-প্যাকিং' করা দরকার। কাচা বাজার ও কিছু প্রয়োজনীয় কেনাকাটা সেরে নেওয়া দরকার, দেখা করতে হবে তহসিলদার অর্থাৎ এস. ডি. ও. এবং পোস্ট মাস্টার মহাশয়ের সঙ্গে।

কিশ্‌তোয়ার থেকে বাসপথ প্রসারিত হচ্ছে মারু-চেনাব উপত্যকায়। এখন পাতিমহলা পর্যন্ত বাস যাতায়াত করছে। কিশ্‌তোয়ার থেকে পাতিমহলা ২৯ কিলোমিটার। কাল খবর নিয়ে জেনেছি, দৈনিক তুবার করে বাস যাতায়াত করে। প্রথম বাস সকাল ন'টায় আর দ্বিতীয়টি তুপুর আড়াইটেয়। ঠিক হয়েছে গৌতম ও শিবু সকালের বাসে পাতিমহলা চলে যাবে। ওরা সেখানে গিয়ে আমাদের আশ্রয় এবং মাল পরিবহনের ব্যবস্থা করে রাখবে। আমরা আড়াইটের বাস ধরব। তার আগে ভাগ ভাগ করে সব কাজ সেরে ফেলতে হবে।

সকালের খাবার খেয়ে গৌতম ও শিবুকে নিয়ে বাসস্টাণ্ডে আসি। ওরা কলকাতা থেকেও আমাদের সঙ্গে আসে নি। সাজ-সরঞ্জাম আনতে উত্তরকাশী চলে গিয়েছিল। পরশু শেষরাতে সাহারাণপুর স্টেশনে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। আজ আবার ওদের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হচ্ছে। তবে এটা নিত্যান্তই সাময়িক। সন্ধ্যার আগেই আবার দেখা হবে।

বাস এজেণ্টের সঙ্গে কথা বলে ব্যবস্থা করা গেল। তুপুরের বাস বেলা তুটোর সময় আমাদের হোটেলের সামনে আসবে। আমরা

মালপত্র তুলে দেব এবং মালের জন্য কোন বাড়তি ভাড়া দিতে হবে না। জম্মুতেও আমরা এ সুবিধা পেয়েছি। এঁদের সহযোগিতা সত্যই মনে রাখার মতো।

গৌতম ও শিবুকে নটার বাসে পাতিমহলা রওনা করে দিয়ে হোটেল ফিরে এলাম। বাজার পার্টি বাজারে চলে গেল। প্যাকিং ও রান্না পার্টি তাদের কাজ শুরু করে দিল। শৈলেশ ও তপনকে নিয়ে আমি ও অমূল্য বেরিয়ে এলাম পথে। এটি কিশ্‌তোয়ারের প্রধান পথ। পথের দুদিকে দোকানের সারি, মুদি মনোহারী, বাসনপত্র, জামা-কাপড় ও জুতো প্রভৃতি যাবতীয় জিনিসের দোকান। রয়েছে সেলুন রেস্তরাঁ ও খাবারের দোকান, ব্যাঙ্ক ও ইনসিওরেন্স অফিস। দেখতে দেখতে এগিয়ে চলি আর চলতে চলতে ভাবতে থাকি কিশ্‌তোয়ারের কথা।

জনপদ দিনে দিনে বড় হয়, উন্নত হয়, কিন্তু কিশ্‌তোয়ারের বেলায় হয়েছে ঠিক তার উল্টো। কিশ্‌তোয়ার যখন স্বাধীন রাজ্য, তখন এর চেয়ে অনেক বড় ছিল। এমন কি মোগল কিম্বা ডোগরা আমলেও কিশ্‌তোয়ার ওয়াজারাত অর্থাৎ জেলা হিসেবে গণ্য হয়েছে। ডোগরা আমলেও রামবান এবং গুল-গুলাবগড় কিশ্‌তোয়ার ওয়াজারাতের অন্তর্গত ছিল। ১৮৪৩ সালে ডোগরা সেনাপতি জরোয়ার সিং কিশ্‌তোয়ারের উজীর ওয়াজারাত বা জেলা শাসক হয়ে আসেন আর এখানে শেষ জেলাশাসক হলেন পণ্ডিত ডোগরা প্রসাদ ধর। ১৯০৩ সালে তাঁর কার্যকাল শেষ হয়। তারপরেই বৃটিশ অধিকার। ১৯২৪ সালে কিশ্‌তোয়ার জেলার মর্যাদা হারায় এবং তখন থেকেই এটি একটি তহসিল বা মহকুমা সদর।

বৃটিশ আমলে, কিশ্‌তোয়ার-ডোডা অঞ্চল উধমপুর জেলার অন্তর্গত ছিল। কিন্তু দেশ স্বাধীন হবার পরে এ অঞ্চলের পাহাড়ী প্রকৃতি ও অধিবাসীদের অনগ্রসরতার কথা বিবেচনা করে ১৯৪৮ সালে পৃথক ডোডা জেলার পত্তন করা হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা আজও এটি এ রাজ্যের সবচেয়ে পেছিয়ে থাকা জেলা।

৩৩° ১০´ ও ৩৩° ২৫´ অক্ষরেখা এবং ৭৫° ২৫´ ও ৭৬° ১০ দ্রাঘিমার মধ্যে অবস্থিত এই তহশিল। এটি জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের প্রায় পূর্ব-মধ্যাঞ্চল, লাদাখ চাম্বা ও অনন্তনাগ জেলার মাঝখানে অবস্থিত এই তহসিল। আয়তন ২৮২৩ বর্গমাইল কিন্তু জনসংখ্যা মাত্র ১ লক্ষ ২৫ হাজার, ১৫৬টি গ্রাম থেকে রাজস্ব আদায় হয়। মহকুমার বেশির ভাগ জায়গা জুড়েই বন ও পাহাড়। চাষের জমি খুবই কম। তাহলেও অধিকাংশ অধিবাসী কৃষিনির্ভর। তবে এই তহসিলে একটি নীলকান্ত মণির খনি (Saphire mine) আছে।

উন্নয়নের উপায় উদ্ভাবনের জন্য রাজ্য সরকার বছর তিনেক আগে এই অঞ্চলের জন্য একটি কমিশন গঠন করেছিলেন। তাঁরা কিশ্‌তোয়ার তহসিলকে পৃথক জেলার মর্যাদা দেবার সুপারিশ করেছেন। প্রস্তাবটি এখনও সরকারের বিবেচনাধীন। এটি কার্যকর হলে আশা করি কিশ্‌তোয়ার কিছু উন্নত হবে।

অনুন্নত হলেও কিশ্‌তোয়ার প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ ও সীমাহীন সৌন্দর্যের ভাণ্ডার। বনসম্পদ ও খনিজ সম্পদের উন্নয়ণ এবং পর্যটন শিল্পের প্রসার সাধন করলে কিশ্‌তোয়ারবাসীদের জীবনে সমৃদ্ধি আসবেই। কিন্তু সেই সুসময় কবে হবে?

আগেই বলেছি এখনও এ অঞ্চলের অধিকাংশ অধিবাসী কৃষিজীবি গম, ভুট্টা, যব, রাজমা বা পাহাড়ী ডাল ও সামান্য কিছু জাফরান এই তহসিলের প্রধান কৃষি সম্পদ। বলা-বাহুল্য শিক্ষার ক্ষেত্রে অতিশয় অনগ্রসর এই তহসিল। ১৯৭১ সালের জনগণনা অনুযায়ী যখন এই তহসিলের জনসংখ্যা ছিল ৯৭,৮৪৩ জন, তখন শিক্ষিতের সংখ্যা ছিল মাত্র ১১,৪৩৫ জন অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার মাত্র সাড়ে আট ভাগ। বিগত পনেরো বছরে বোধকরি শিক্ষিতের হার কিছু বেড়েছে। কারণ ইদানিং কিশ্‌তোয়ার শহরে একটি ডিগ্রি কলেজ ও পাঁচটি দ্বাদশ শ্রেণীর উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। এ ছাড়া এখন এখানে সাতটি উচ্চবিদ্যালয় এবং অনেকগুলি মাধ্যমিক

ও প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। বর্তমান কিশ্‌তোয়ার শহরের জনসংখ্যা প্রায় দশ হাজার।

কিন্তু কিশ্‌তোয়ার শহরের কথা এখন থাক। আমরা তহসিলদার অফিসের সামনে পৌঁছে গিয়েছি।

বড় রাস্তার পাশে একফালি মাঠ তারপরে লম্বা টিনের বাড়ি, সামনে খোলা বারান্দা। এটাই তহসিলদারের অফিস—কাছারী ও কালেক্টরেট।

আমরা মাঠ পেরিয়ে বারান্দায় উঠে আসি। জনৈক কর্মচারী জানালেন—তহসিলদারসাব ঘণ্টাখানেক বাদে আসবেন।

—তাহলে চলুন, পোস্টাপিসের কাজটা সেরে আসা যাক। তপন বলে।

সে ঠিকই বলেছে। এখানে বসে থেকে কি হবে? আমরা ওর সঙ্গে এগিয়ে চলি। বড়রাস্তা থেকে উৎরাই গলিপথ পেরিয়ে মিনিট তিনেক হেঁটে পোস্ট অফিসে পৌঁছন গেল।

পরিচয় দিতেই সানন্দে স্বাগত জানান পোস্টমাস্টারজী। মধ্যবয়সী ভদ্রলোক। নাম শান্তিপ্রসাদ শর্মা। আমাদের বসতে বলে চা-য়ের ফরমাস করেন। সহকর্মীদের ডেকে আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন।

কথায় কথায় শর্মাজী বললেন—আপনারা যখন কিবার নালার পথে ব্রহ্মজীর কাছে যাচ্ছেন, তখন মারু-চেনাব উপত্যকায় আপনাদের শেষ বড় গ্রাম সোন্দার। সোন্দারে কোন ডাকঘর নেই। ডাকঘর আছে আরও ২ কিলোমিটার এগিয়ে সুয়েদ গ্রামে। কিন্তু আপনারা তো সে পর্যন্ত যাচ্ছেন না। আপনারা মূল-শিবির থেকে লোক পাঠিয়ে সেখানে চিঠি ডাকে দিতে পারেন, কিন্তু আপনাদের ঠিকানা হবে আমার প্রযত্নে। আমি আপনাদের সব চিঠি এখানেই ধরে রাখব। ফেরার পথে আপনারা সেগুলো নিয়ে যাবেন।

অর্থাৎ অভিযান যতদিন চলবে, ততদিন আমরা কেউ বাড়ির খবর পাবো না। কিন্তু এ ছাড়া যে আর কোন উপায় নেই। পোস্ট

মাস্টারজী বলছেন, ওপরে চিঠি পাঠালে গোলমাল হতে পারে। হারিয়ে যাওয়ার চেয়ে এখানে ফিরে এসে চিঠি হাতে পাওয়া অনেক ভাল। অতএব অমূল্য সেইভাবে লিখে দেয় পোস্টমাস্টারজীকে।

ডাকটিকেট কিনে বিদায় নিই শর্মাজীর কাছ থেকে। অবশ্য শর্মাজীদের বলাই উচিত হবে। কারণ কেবল পোস্টমাস্টারজী নন, তাঁর সহকারী, টিকেট বিক্রেতা ও টেলিগ্রাফিস্ট তিনজনেই শর্মা। এরা সবাই স্থানীয় লোক। কিশ্‌তোয়ারে শতকরা ৪৫ জন হিন্দু। অফিস-কাছারী, স্কুল-কলেজ ও ব্যবসা-বাণিজ্যে হিন্দুদের প্রাধান্যই বেশি কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা, হিন্দু মুসলমান এখানে বড়ই সৌহার্দের সঙ্গে পাশাপাশি শান্তিতে বাস করছেন।

পোস্ট অফিস থেকে ফিরে এলাম তহসিলদার অফিসে। অফিস নয় আদালতে—কাছারীতে। তহসিলদার-সাহেব কাছারীতে বসে গিয়েছেন। মামলা চলছে। ভেতরে ঢুকব কি?

হাকিম সাহেব কি দেখতে পেয়েছেন আমাদের? তিনি পেশকারকে কি যেন বলছেন। পেশকার নেমে এলেন এজলাস থেকে। এগিয়ে এলেন দোরগড়ায়। জিজ্ঞেস করলেন—আপনারা কি সাহেবের সঙ্গে দেখা করবেন?

বুঝতে পারছি না আমাদের কালো চেহারা ও পোশাক ভদ্রলোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে কিনা? আকর্ষণ করার মতই বটে। সবার মুখে খোচা-খোচা দাঁড়ি আর গায়ে হলুদ গেঞ্জি, তাতে লাল রঙের লেখা—INDIAN BRAMMAH-1 (21, 049′) EXPEDITION, 1986; Organaised by Institute of Mountaineering Exploration, Calcutta—26.

অমূল্য মাথা নেড়ে উত্তর দেয়—হ্যাঁ।

পেশকারজী আবার জিজ্ঞেস করেন—আপনারা কোথা থেকে আসছেন?

—কলকাতা।

—আইয়ে, অন্দর আইয়ে!

আমরা তাঁর সঙ্গে ভেতরে আসি। তিনি হাকিমসাহেবকে বোধকরি আমাদের পরিচয় দেন। তারপরেই ইসারায় আমাদের এজলাসে উঠে আসতে বলেন।

হাকিমসাহেব আমাদের দেখিয়ে বিবদমান আইনজীবীদের কি যেন বলছেন? তিনি শুনানীর সাময়িক বিরতি ঘোষণা করলেন কি? বোধকরি তাই। কারণ সাক্ষী নেমে গেলেন কাঠগড়া থেকে। উকিলরাও কাগজপত্র গোছাচ্ছেন।

আমরা উঠে আসি এজলাসে। ইতিমধ্যে বাড়তি চেয়ায় এসে গেছে। তহসিলদার সাহেব আমাদের সবার সঙ্গে করমর্দন করে বসতে বলেন।

ভদ্রলোককে ভাল লাগে আমাদের। শুধু ব্যবহার নয়, চেহারাটিও ভারী সুন্দর। সুপুরুষ যুবা, বয়সে নবীন। বোধকরি সদ্য সিভিল সার্ভিস পাশ করেছেন। নাম খুরশিদ আহমেদ দেব।

এই একটা অদ্ভুত ব্যাপার এ অঞ্চলে। আগে কিশ্‌তোয়ার হিন্দু রাজ্য ছিল। অধিবাসীরা সবাই ছিলেন হিন্দু। শ' আড়াই বছর আগে সৈয়দ শাহ-ফরিদ্-উদ্-দিন সাহেব নামে জনৈক স্বানামধন্য ফকির বাগদাদ থেকে এখানে আসেন। তাঁর অলৌকিক শক্তিতে মুগ্ধ হয়ে কিছু মানুষ মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেন। সেই শুরু। এখন কিশ্‌তোয়ার তহসিলের শতকরা পঞ্চান্নজন মুসলমান। কিন্তু তাদের অনেকেই এখনো পিতৃপুরুষের বংশটি নামের সঙ্গে যুক্ত করে রেখেছেন। তাই আমাদের তহসিলদার সাহেবের নাম খুরশিদ আহমেদ দেব।

দেবসাহেব আমাদের অভিযানের কথা শুনে ভারী খুশি হলেন। তিনি সোন্দার গ্রামের পাটোয়ারী (পুলিশের প্রতিনিধি) ও ফরেস্ট বাংলোর চৌকিদারকে চিঠি লিখে দিলেন। লিখলেন উর্দুতে কিন্তু ইংরেজীতে অনুবাদ করে আমাদের তাঁর চিঠির বক্তব্য বুঝিয়ে দিলেন।

এই একটা বিচিত্র ব্যাপার। ভারতের প্রত্যেক রাজ্যে এখন স্থানীয় ভাষা সরকারী ভাষার স্বীকৃতি পেয়েছে। কিন্তু ইংরেজী ছাড়া আন্তঃরাজ্য ভাববিনিময় সম্ভব হচ্ছে না। তাহলে ইংরেজীকে অন্যতম

সরকারী ভাষা হিসেবে বজায় রাখলে কি দোষ হত?' তাছাড়া আন্তর্জাতিক প্রয়োজনে যে ইংরেজী অপরিহার্য, এটা অস্বীকার করার মতো নির্বোধ আমরা নিশ্চয়ই নই। জাতীয় সংহতি আমাদের এখন প্রধান সমস্যা। সেই সমস্যার সমাধানে ইংরেজী আমাদের সবচেয়ে বেশি সাহায্য করতে পারে। অর্থহীন হিন্দীপ্রীতি যে জাতীয় সংহতিকে বিনষ্ট করে ফেলছে, এটা এখনও উপলব্ধি না করতে পারলে যে দেশের বড়ই ক্ষতি হয়ে যাবে।

কিন্তু থাক গে এসব কথা। তার চাইতে দেবসাহেবের কথা শোনা যাক। তিনি বলছেন—সোন্দারে কোন পুলিশচৌকি নেই। পুলিশচৌকি আছে আরও খানিকটা এগিয়ে সিরশি গ্রামে। আমি ওয়্যারলেস করে তাদের জানিয়ে দিচ্ছি আপনাদের অভিযানের কথা। তারা প্রয়োজনে সাহায্য করবে।

চা খেয়ে বিদায় নিলাম দেবসাহেবের কাছ থেকে। বিদায় বেলায় তিনি অভিযানের সাফল্য কামনা করলেন। নেতাকে বললেন—ফেরার পথে সবাইকে নিয়ে আমার বাড়িতে এসে চা খেতে হবে।

আমরা সানন্দে সম্মত হই। বেরিয়ে আসি পথে। কিশ্‌তোয়ারের পথ। তারই কথা ভাবতে ভাবতে পথ চলি। কথা নয় ইতিহাস। কিন্তু কিশ্‌তোয়ারের নির্ভেজাল ইতিহাস আমি কোথায় পাবো? অতীতের ভারত যে ইতিহাসের প্রতি একেবারেই শ্রদ্ধাশীল ছিল না। তাই ভারতের অন্যান্য স্থানের মতো কিশ্‌তোয়ারেও কোন অতীত ইতিহাস নেই।

ভারতের অধিকাংশ অঞ্চলের মতো জম্মু-কাশ্মীর এবং লাদাখেও ইংরেজরাই প্রথম ইতিহাসের অনুসন্ধান করেন। ১৮৫৮ ও ১৮৯০ সালে তাঁরা গেজেটীয়ার প্রকাশ করেন। সেই গেজেটীয়ার থেকে জেনেছি—

হিমালয়ের অন্যান্য রাজ্যের মতো কিশ্‌তোয়ারেও মধ্যযুগে রাজপুত রাজারা রাজত্ব করেছেন। এবং তাঁরা স্বাধীন নরপতি ছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রথম যাঁর নাম জানা যায়, তিনি রাজা ভগবান সিং।

অন্তত শ' তিনেক বছর আগে কিশ্‌তোয়ারে ভগবান রাজত্ব করতেন। বিস্মৃতির মাঝে তাঁর নামটি স্মরণীয় হয়ে আছে কারণ তিনি শক্তিতে হীনবল হয়েও মোগলসম্রাটের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন। বলা বাহুল্য সেই অসম যুদ্ধে তাঁকে পরাজয় বরণ করতে হয়। দিল্লীশ্বর কিন্তু তাঁকে ক্ষমা করেছিলেন। তবে সেই সন্ধির ফলে রাজাকে অনেকখানি স্বাধীনতা হারাতে হয়। ঠিক হয় দিল্লীর দরবার থেকে মনোনীত দুজন উজীরের সঙ্গে পরামর্শ করে তিনি রাজকর্ম পরিচালনা করবেন। জিউ পাল ও কাহন পাল নামে দুজন দিল্লীবাসী ক্ষত্রিয় উজীর নির্বাচিত হয়ে এলেন। তাঁদের বংশধরগণ পুরুষানুক্রমে কিশ্‌তোয়ারে দিল্লীর প্রতিনিধিত্ব করেছেন। এবং আজও তাঁরা কিশ্‌তোয়ারে রয়ে গিয়েছেন।

ভগবান সিংয়ের পরে রাজা মান সিং ও রাজা জয় সিং কিশ্‌তোয়ারে রাজত্ব করেছেন। তখন পর্যন্ত কিশ্‌তোয়ার একটি হিন্দুরাজ্য।

তারপরে রাজা গিরাত সিং কিশ্‌তোয়ারের সিংহাসনে বসলেন! তাঁরই রাজত্বকালে সৈয়দ শাহ ফরিদ্‌-উদ্‌-দিন সাহেব বাগদাদ থেকে এখানে আসেন। রাজা তাঁর অলৌকিক শক্তির পরিচয় পেয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন। পরবর্তীকালে রাজা গিরাত দিল্লীর সম্রাটের [সম্ভবতঃ মহম্মদ শাহ ১৭১৯-৪৬ খ্রীঃ] প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলেন। সম্রাট খুশি হয়ে তাঁর নাম নাম রাখলেন রাজা সৈয়াদত ইয়ার খান।

রাজধর্ম গ্রহণ করলে ব্যবহারিক জীবনে সুবিধে হয়। সুতরাং কিশ্‌তোয়ারবাসীদের মধ্যে ধর্মত্যাগের প্রবণতা দেখা দিল। এবং কিছুকালের মধ্যেই কিশ্‌তোয়ারের প্রায় অর্ধেক মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন। কিন্তু আজও কিশ্‌তোয়ারী মুসলমানদের সঙ্গে কাশ্মীরী মুসলমানদের আচার ব্যবহারে প্রচুর পার্থক্য রয়ে গেছে। এঁদের পূর্বপুরুষগণ ধর্মত্যাগ করলেও হিন্দু সংস্কৃতিকে পরিত্যাগ করেন নি। ফলে এ অঞ্চলে কোন সাম্প্রদায়িক বিরোধ নেই। হিন্দু-মুসলমান শান্তিতে বসবাস করছেন।

ধর্ম-ত্যাগ করে এঁরা অনেকেই পিতৃপুরুষের বংশটি পরিত্যাগ করেন নি, একথা আগেই বলেছি। আর এই বিচিত্র নিয়মটি প্রচলন করে গেছেন সেকালের রাজারা। গিরাত সিং-য়ের পরে রাজা হলেন আমলকি সিং। তাঁর পরে মিহর সিং।

মিহরের পরে কিশ্‌তোয়ারের সিংহাসনে বসেন রাজা সুজান সিং। তাঁর পরে এনায়েতুল্লা সিং। এবং অবশেষে রজো মহম্মদ তেজ সিং। তিনি কিশ্‌তোয়ারের শেষ স্বাধীন রাজা। ঔরঙ্গজেব কর্তৃক নিযুক্ত উজীরদের বংশধরগণ এতকাল রাজাদের পরামর্শদাতার কাজ করে আসছিলেন। তেজ সিং এই বংশানুক্রমিক নীতির পরিবর্তন ঘটালেন। তিনি লাকপত নামে জনৈক স্থানীয় জমিদারকে উজীর নিযুক্ত করলেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর যোগ্যতা ও আনুগত্যে সন্দিহান হয়ে উঠলেন। এবং শেষ পর্যন্ত তাঁকে পদচ্যুত করলেন।

অপমানিত লাকপত জম্মুতে পালিয়ে গেলেন। দেখা করলেন শিখ সেনাপতি গুলাব সিংয়ের সঙ্গে! তিনি তাঁকে কিশ্‌তোয়ার আক্রমণের পরামর্শ দিলেন। কত সহজে কিশ্‌তোয়ার দখল করা যায়, তার উপায় বলে দিলেন।

সাম্রাজ্যলোভী গুলাব সিং বিশ্বাসঘাতক ও দেশদ্রোহী লাকপতের পরামর্শ মেনে নিলেন। সেনাবাহিনী নিয়ে ডোডা পৌঁছলেন। তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল। রাজা তেজ সিং ভয় পেলেন। পাছে শিখবাহিনী তাঁর সাধের কিশ্‌তোয়ার ধ্বংস করে ফেলে! তাই তিনি তাড়াতাড়ি ডোডা এসে গুলাবের বশ্যতা স্বীকার করে নিলেন। গুলাব তাঁকে বন্দী করে লাহোর পাঠিয়ে দিলেন। এটি সম্ভবতঃ ১৮৩০ সালের ঘটনা।

রাজা তেজ সিংয়ের দুই ছেলে—জামাল ও জরোয়ার! ডোগরা অধিকারের পরে তাঁদের কি পরিণতি হয়েছে, সে সম্পর্কে ইতিহাস নীরব। ইতিহাস শুধু বলে—বিনাযুদ্ধে বশ্যতা স্বীকার করেও তেজসিং তাঁর সাধের কিশ্‌তোরারকে রক্ষা করতে পারেন নি।

১৮৫৮ সালে প্রকাশিত ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর গেজেটীয়ারে কিশ্‌তোয়ার প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

'The population consisting of Mohamedans and Hindus are proverbially poor, the place having suffered excessively from the oppression of the Sikhs since the expulsion of the rightful Rajahs·r. and whose power extended northwards as far as Ladakh.'*

* Gazetteer of the Territories under the Govt. of East India Company and the Native States on the Continent of India.

॥ তিন ॥

হোটেলে ফিরে এসে দেখি, সদস্যরা সকলেই নিজেদের কাজ শেষ করে ফেলেছে। জয় ও জগদীশ রান্নার পাট চুকিয়েছে, কৃষ্ণ গোরা রঞ্জু ও টুলটুল কেনাকাটা ও প্যাকিং শেষ করেছে। হোটেল ম্যানেজারের ঘরে সদস্যদের বাড়তি জিনিস রেখে দেওয়া হয়েছে।

অতএব নিশ্চিন্তে খেতে বসা গেল। ভাত, ডাল, তরকারী ও বেগুনী। খাওয়াটা সত্যই খুব ভাল হল। কিন্তু ভরপেট খেয়ে বিশ্রামের অবকাশ পাওয়া গেল না। বাস এসে পড়ল। সুতরাং খেয়ে নিয়েই মালপত্র ঘাড়ে তুলতে হল।

বাস ছাড়ল যথা সময়ে, বেলা আড়াইটেয়। আমরা বিদায় নিচ্ছি শহর কিশ্‌তোয়ারের কাছ থেকে। মাত্র ঘণ্টা বিশেক বাস করেছি এই শহরে। কিন্তু এরই মধ্যে কেমন যেন একটা মায়া পড়ে গেছে জায়গাটার ওপরে।

কেনই বা পড়বে না? গতকাল সন্ধ্যায় প্রথম পদার্পণ করলেও আমি যে এই সুপ্রাচীন শহরের কথা শুনে আসছি বহু বছর ধরে। শুনেছি, একদা ভদ্রাওয়ার অঞ্চল কাবুলের আমীর তিমুর শাহর অধীন ছিল। কিন্তু স্থানীয় রাজ্যপাল আবদুল্লা নিজেকে স্বাধীন নরপতি রূপে ঘোষণা করে ভদ্রাওয়ার কিশ্‌তোয়ারের রাজাকে দিয়ে দেন। ফলে কিশ্‌তোয়ার রাজ্যের সীমা লাদাখ পর্যন্ত প্রসারিত হয়। এখনও ভদ্রাওয়ার ডোডা জেলার একটি মহকুমা।

ইংরেজ ঐতিহাসিকরা কিশ্‌তোয়ারের মানুষদের খুবই প্রশংসা করছেন। বলছেন—

'The People of Kishtwar are a fine-made race in general, especially the Hindu portion, and are morally much superior to the Kashmiris, being more straightforward and cheerful.'

শুনেছি কিশ্‌তোয়ারের ভাষার সঙ্গেও কাশ্মীরী ভাষার পার্থক্য বিস্তর। বরং এখানকার ভাষার সঙ্গে নাকি হিমাচলী ভাষার মিল অনেক বেশি।

কিশ্‌তোয়ারের কথা শুনেছি কাকাবাবুর (শ্রদ্ধেয় সুসাহিত্যিক শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র) কাছে। তিনি তাঁর 'সেই রাজা সেই রাণী' ঐতিহাসিক উপন্যাসে কিশ্‌তোয়ারের এক রাজকন্যার কথা লিখেছেন। কাহিনীটি মনে পড়ছে আমার।

সম্রাট প্রথম বাহাদুর শা মারা গেলেন (১৭১২ খ্রীঃ)। কঠোর সংগ্রাম ও খুন-খারাপির পরে সম্রাটের প্রথম পুত্র মুইজ-উদ্দীন জাহান্দার শা নাম নিয়ে দিল্লীর মসনদে বসলেন। কিন্তু তাঁর নবাবী মাত্র বছরখানেক স্থায়ী হল। তাঁর ভাইপো ফররুকশিয়র পরের বছরই (১৭১৩ খ্রীঃ) তাঁকে হত্যা করে মসনদ দখল করলেন। তিনি ছ' বছর রাজত্ব করছেন। ১৭১৯ সালে তাঁর ওমরাহ সৈয়দ হুসেন তাঁকে হত্যা করেন।

কাকাবাবুর কাহিনীর নায়ক এই ফররুকশিয়র আর নায়িকা কিশ্‌তোয়ারের রাজকন্যা। অপরূপা সুন্দরী তিনি। কাকাবাবুর ভাষায়—'তুষার-মণ্ডিত হিমগিরির মতো তাঁর গাত্র-বর্ণ। পার্বত্য -কুসুমের পেলবতা তাঁর ত্বকে, হিমালয়ের অনন্ত রহস্য তাঁর দৃষ্টিতে।'

হিমালয় পার হয়ে তাঁর রূপের খ্যাতি গিয়ে পৌছল লাহোরে। সুবাদার আবদুস সামাদ খাঁ লুব্ধ হলেন। শিকারের ছলে তিনি কিশ্‌তোয়ারে এলেন।

না, রাজকন্যাকে দেখতে পান নি তিনি। আড়াল থেকে শুধু দেখতে পেয়েছিলেন তাঁর হাত দুখানি। আর তাতেই সুবাদার অস্থির হয়ে উঠলেন। মোহাচ্ছন্ন সুবাদার ছুটে এলেন রাজার [সম্ভবতঃ রাজা জয় সিং] কাছে। রাজকন্যার সেই দেবদুর্লভ হাত দুখানি ধরবার অধিকার প্রার্থনা করে লাহোরে ফিরে গেলেন।

রাজা তাঁর প্রার্থনা পূর্ণ করতে ইতস্তত করছেন জানতে পেরে ভয় দেখালেন। বললেন তিনি কিশ্‌তোয়ারকে 'গুড়িয়ে চেনাবের

জলে ধুয়ে সমভূমি করে দেবেন। এখানে আপেলের চাষ করাবেন।'

তবু রাজা সম্মত হলেন না। কিশ্‌তোয়ার ছোট হলেও একটি স্বাধীন রাজ্য। স্বাধীন নরপতি হয়ে তিনি কেমন করে তাঁর মেয়েকে একজন সুবাদারের হাতে সম্প্রদান করেন ?

ভাগ্যদেবতা বোধকরি তাঁর অবস্থা উপলব্ধি করে থাকবেন। তাই রাজা খবর পেলেন সম্রাট ফররুকশিয়র শিকার করতে তাঁর রাজ্যের সীমান্তে ছাউনী ফেলেছেন। রাজা স্থির করলেন—'শৃগালের ভক্ষ্য হওয়ার চেয়ে সিংহের ভক্ষ্য হওয়াই ভাল। ...সূর্য হাতের কাছে থাকতে খদ্যোতের কাছে কোন্ কমলিনী আত্মসমর্পণ করে ?

পাছে সংবাদটা ছড়ায় এবং সুবেদার বাধা দেন—এই ভয়ে কাউকেই তিনি জানান নি, এমনকি কন্যার মাকেও নয়। এক সন্ধ্যারাত্রিতে চুপিচুপি মেয়েকে আর জন-পাঁচেক মাত্র সশস্ত্র বিশ্বস্ত অনুচর নিয়ে ঘোড়ায় চেপে রওনা হয়েছিলেন।'

তিনদিন তিন রাত ঘোড়া ছুটিয়ে তাঁরা পৌঁচেছিলেন তরুণ রূপবান ও উদার বাদশা ফররুকশিয়রের শিবিরে। সেখানে 'মধ্যরাত্রির প্রমোদ বিলাস সবেমাত্র তখন শেষ হচ্ছে।

অনুমতি পেয়ে রাজকন্যাকে নিয়ে রাজা সম্রাটের সামনে এলেন। মেয়ের মুখের ওপর থেকে ওড়নাটা সরিয়ে দিয়ে শুধু বললেন, "আমার বংশের ও আমার দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ কুসুম আপনাকে নিবেদন করতে এনেছি জাহাঁপনা, দয়া করে গ্রহণ করুন।"

নিবেদিত পুষ্পার্ঘ্য বাদশা তখনই—সেই মুহূর্তেই গ্রহণ করেছিলেন। কোন অনুষ্ঠানের বিলম্ব তাঁর সহ্য হয় নি।

'আদর করে বাদশা তাঁর পার্বতী প্রিয়ার নাম রেখেছিলেন নূরমহল। তারপরে বাদ্‌শা যতদিন বেঁচেছিলেন, ততদিন তাঁর সেই অলোক সাধারণ রূপের ঘোর বাদ্‌শার দৃষ্টি থেকে মুছে যায় নি। তাঁর অসংখ্য দাসী, একাধিক মহিষী এবং আরও নানা প্রমোদ সহচরীর মধ্যে নূরমহলই ছিলেন প্রধান এবং তাঁর প্রিয়তমা।'

তাহলেও কিশ্‌তোয়ারের নূরমহল আগ্রার নূরজাঁহা হতে পারেন নি। সে সুযোগও তাঁর ছিল না। কারণ ফররুকশিয়র জাহাঙ্গীর নন। তাছাড়া ফররুকশিয়রের মৃত্যুর পর নূরমহলের কি দশা হয়েছিল, তাও জানার দরকার নেই আমার। আমি শুধু জানি, কিশ্‌তোয়ারের কন্যা কিছুকালের জন্য আগ্রার হারেমে প্রধানা হতে পেরেছিলেন। এবং সে গৌরব কিশ্‌তোয়ারের কাছে চিরস্মরণীয়।...

—শঙ্কুদা, দেখুন কতবড় ময়দান!

জয়ের কথায় আমি অতীতের কিশ্‌তোয়ার থেকে বর্তমানের কিশ্‌তোয়ারে ফিরে আসি। তাকিয়ে দেখি, সে ঠিকই বলেছে। পথের বাঁদিকে সুবিশাল সবুজ মাঠ। পাঁচ হাজার ফুট উঁচুতে এতবড় সমতল সত্যিই বিস্ময়কর। অবশ্য সারা কিশ্‌তোয়ার শহরটাই এক প্রাকৃতিক বিস্ময়। চারিদিকে পাহাড়ের মাঝে ৮ কিলোমিটার দীর্ঘ ও ৩ কিলোমিটার প্রশস্ত সমতলে এই শহর। পাশ দিয়ে বয়ে চলছে চন্দ্রভাগা।

কিন্তু শহর কিশ্‌তোয়ার নয়, আমি ময়দানটিকে দেখি। শুধু বড় নয়, সুন্দরও বটে। ময়দানের এপাশে বাসপথ, ওপাশে সারি সারি বাড়ি-ঘর। তারপরেই পাহাড়, খাড়া উঠে গেছে ওপরে। পাহাড় নয়, যেন প্রকৃতির প্রাচীর। কিন্তু সে প্রাচীর রক্ষা করতে পারে নি কিশ্‌তোয়ারকে।

ভারতের পর্যটন মানচিত্রে কিশ্‌তোয়ারের নাম নেই। যাঁরা একাধিকবার কাশ্মীর ভ্রমণে এসেছেন, তাঁরাও অনেকে কিশ্‌তোয়ারের নাম জানেন না। অথচ প্রকৃত হিমালয়-প্রেমীদের কাছে কিশ্‌তোয়ার অত্যন্ত জনপ্রিয় হতে পারে। প্রচারের অভাবে কিশ্‌তোয়ার অবহেলিত থেকে যাচ্ছে। কিশ্‌তোয়ারের অবস্থান হিমালয়ের গহন -গিরি-কন্দরে। দূরত্ব কিন্তু বেশি নয়, জম্মু থেকে ২২৯ কিলোমিটার আর বাটোট থেকে মাত্র ১০৯ কিলোমিটার।

ভাবছি কিশ্‌তোয়ারের কথা কিন্তু দেখছি পথের পাশে পাহাড়-গুলিকে। পাহাড় নয়, গাছে ছাওয়া সুনিবিড় বন। নিচের দিকে

ঝোপঝাড় আর ওপরে পাইনবন। বন ছাড়িয়ে পাথর, নানা রঙের পাথর। শীতকালে নিশ্চয়ই তুষারে শুধুই সাদা হয়ে যায়।

বন সম্পদে এত সমৃদ্ধ হয়েও কিশ্‌তোয়ার বড়ই দরিদ্র। কিশ্‌তোয়ার আজও এরাজ্যের সবচেয়ে অনুন্নত অঞ্চল। তাই কাশ্মীর উপত্যকার অধিবাসীরা ঠাট্টা করে, বলেন—'কিশ্‌তোয়ারের মানুষ দিনে ক্ষুধার্ত রাতে শীতার্ত।' তাঁদের মতে একজন মোটা মানুষও এখানে এসে কিছুকাল বাস করলে নাকি ফকিরের লাঠির মতো রোগা হয়ে যায়।

আমার অবশ্য সে ভয় নেই। বয়সের ভারে শরীরে যে মেদ জমেছে, তার কিছু কমবে, এই আশা করে এবারে আমি হিমালয়ে এসেছি। তবে সে আশা কতখানি সফল হবে, এ সম্পর্কে এখুনি আমার মনে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। কারণ আমার সহযাত্রীরা সঙ্গে প্রচুর খাবার নিয়ে এসেছে এবং তার মধ্যে মাছ, মাংস ও ডিমের পরিমাণ রীতিমত উল্লেখযোগ্য।

পথের বাঁধানো অংশ বোধকরি শেষ হয়ে গেল। পাথর মেশানো নরম মাটির পথ। ধুলো উড়ছে। পথের পাশে ঘর-বাড়ি ক্ষেত ও খেলার মাঠ। দেখতে দেখতে চলেছি। মাঝে মাঝেই গাড়ি থামছে। ধুলো ঢুকছে আর লোক উঠছে। কিছুক্ষণ আগেও তারা গাড়িতে উঠছিল। এখন আর সে উপায় নেই। তাই কণ্ডাক্টর তাদের ছাদে উঠবার পরামর্শ দিচ্ছে এবং তারা সে পরামর্শ মেনে নিচ্ছে।

ছাদের অধিকাংশ জায়গা জুড়েই আমাদের মালপত্র, বিশেষ করে রুকৃস্যাকৃগুলো সব দাঁড় করানো। তার ওপরে বসলে যে ছিঁড়ে যাবার সম্ভাবনা। কিন্তু কি করা যাবে? জয় একবার কথাটা বলেছিল কণ্ডাক্টরকে। সে মৃদু হেসে সবিনয়ে উত্তর দিয়েছে—"ছিঁড়বে কেন সাব, ছিঁড়বে না। ওরা তো ত্রিপলের ওপরে বসেছে।

এ আশ্বাসে আশ্বস্ত হওয়া ছাড়া আমাদের যে আর কিছু করার নেই। বাস আছে অথচ ভিড় নেই, এটি তো এ দেশে হবার উপায়

নেই। এই একটি ব্যাপারে এক আশ্চর্য জাতীয় সংহতি এ দেশে। বাসের ভিড় দেখে কলকাতা কিম্বা কিশ্‌তোয়ার বুঝতে পারার উপায় নেই। অথচ এমনটি হওয়া উচিত নয়। কারণ পাহাড়ী পথে দাঁড়িয়ে যাত্রী নেওয়া অমার্জনীয় অপরাধ, বিপজ্জনকও বটে।

কিশ্‌তোয়ার থেকে পাতিমহলা ২৯ কিলোমিটার। কিন্তু এই পথটুকু যেতে কতক্ষণ সময় লাগবে, বুঝতে পারছি না। কারণ বাস যতক্ষণ চলছে, তার চেয়ে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকছে।

তাহলেও একসময় আমরা শহরের সমতল অংশ ছাড়িয়ে এলাম। বাস নিচে নামতে শুরু করল। গতকাল যেমন আঁকাবাঁকা পথে একটানা ওপরে উঠে এসেছি, আজ তেমনি পথে নিচে নেমে চলেছি। শুধু আমরা নই, আমাদের সঙ্গে নদীও নিচে নামছে। আর তাই সে মাঝে মাঝে অপরূপ জলপ্রপাতের সৃষ্টি করেছে।

সহসা সহনেতা আমাকে জানায়—সবচেয়ে সুন্দর প্রপাতটি শহরের বিপরীত দিকে। সময় পেলে ফেরার পথে দেখিয়ে আনব।

—সেটা বুঝি এগুলোর চেয়ে বড় ? জিজ্ঞেস করি।

কৃষ্ণ উত্তর দেয়—হ্যাঁ। কয়েক শ' ফুট ওপর থেকে লাফিয়ে পড়ছে। ভারী সুন্দর। সত্যি দেখবার মতো।

তা হোক গে, কিন্তু সে দেখা তো ফেরার পথে। ফেরার কথা এখন নয়, পেছনের কথাও আর নয়। এবারে সামনের দিকে তাকানো যাক। পাহাড়ের গা বেয়ে আঁকাবাঁকা পথ। আমরা কেবলি নিচে নেমে যাচ্ছি। নিচে আরও নিচে। পাইনবন ছাড়িয়ে নদীর বেলাভূমির দিকে। এখন বেলা সওয়া তিনটে।

পথের পাশে কাঁটাগাছ আর ঝোপঝাড়। মাটি আর পাথরের পথ। সঙ্কীর্ণ পথ। একখানি গাড়ি যেতে পারে। উল্টোদিক থেকে হঠাৎ কোন গাড়ি উঠে এলে সমূহ বিপদ। তবে শুনেছি সে বিপদ ঘটে না। কারণ এপথে আসা-যাওয়ার সময় বাঁধা। এপথে সবসময়—'ওয়ান ওয়ে ট্র্যাফিক।'

এখন পথের পাশে পাহাড়গুলো দেখে আমার ত্রিপুরার কথা মনে

পড়ে যাচ্ছে। এগুলিকে অবশ্য মাটির পাহাড় বলা উচিত হবে না, তবে মাটির ভাগ খুবই বেশি। বৃষ্টি পড়লে নিশ্চয়ই পথ তুর্গম হয়ে ওঠে। তখন বাস চলে কি?

হয়তো চলে। তবে চলা উচিত নয়। পথের পাশে রক্ষা-প্রাচীর বা 'গার্ড' নেই। পাশেই বয়ে চলেছে উত্তাল ও উদ্বেলিতা চন্দ্রভাগা। পিচ্ছিল পথে একটু এদিক-ওদিক হলেই অতল সমাধি।

এখন এসব ভাবনা কেন? এখন তো বৃষ্টি পড়ছে না! পড়ছে না, কিন্তু যে কোন সময় পড়া শুরু হতে পারে। আজ সকাল থেকেই মেঘলা আকাশ? গতকাল রাতে কিশ্‌তোয়ারে বৃষ্টি হয়েছে। হিমালয়ে বৃষ্টির চেয়ে বড় শত্রু নেই। এখন ব্রহ্মাজী ভরসা।

ঘণ্টাখানেক হল আমরা কিশ্‌তোয়ার থেকে রওনা হয়েছি। কতটা দূরত্ব অতিক্রম করেছি জানি না, কিন্তু নেমে এসেছি অনেক নিচে, একেবারে নদীর বেলাভূমিতে। প্রায় সমতলে, তুটি নদীর সঙ্গমে। আর বলা বাহুল্য তুটি নদীর একটি চন্দ্রভাগা। অপর নদীটি মারু-চেনাব। চেনাব মানে চন্দ্রভাগা। কিন্তু মারু-চেনাব চন্দ্রভাগা নয়, কিশ্‌তোয়ার হিমালয়ের অন্য এক নদী। এটি লাদাখের দ্রাস অঞ্চলে সৃষ্ট হয়ে কিশ্‌তোয়ার তহসিলের মারোয়া উপত্যকা বেয়ে এখানে এসে চন্দ্রভাগার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। * চন্দ্রভাগার শাখানদী বলে সুপ্রাচীন কাল থেকে এরও স্থানীয় নাম চন্দ্রভাগা।

গতকাল বাটোট ছাড়াবার পরে দেখা হয়েছিল চন্দ্রভাগার সঙ্গে। সেই থেকে সে ছিল আমার সঙ্গে। তারই তীরপথে কিশ্‌তোয়ার পৌঁচেছি। আজও তার সঙ্গে এতক্ষণ পথ চলে এই বাণ্ডারকোট এসেছি। হ্যাঁ, সহযাত্রীরা বলছেন—এ জায়গাটার নাম বাণ্ডারকোট। বলছেন—এখানে বিদায় নিতে হবে চন্দ্রভাগার কাছ থেকে। এখান থেকে মারু-চেনাব সঙ্গী হবে আমাদের।

মনটা খারাপ হয়ে যায়। আগেই বলেছি, চন্দ্রভাগার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ১৯৬২ সালে, প্রথমবার শ্রীনগর যাবার পথে।

* লেখকের 'লাদাখের পথে' দ্রষ্টব্য।

কিন্তু সেবারে সে পরিচয় থেকে কোন প্রাণের সম্পর্ক গড়ে ওঠে নি। তারপরে চন্দ্রভাগার সঙ্গে দেখা হয়েছে ১৯৬৬ সালে। দেখা হয়েছে তার জন্মস্থান তাণ্ডিতে, খোকসার থেকে কেলং যাবার পথে। সেবারে চন্দ্রভাগাকে বড় আপন করে কাছে পেয়েছি। বিশবছর আগের সেই মধুর স্মৃতি আজও আমার মনে অক্ষয় হয়ে আছে।

সে যাত্রায় যারা আমার সঙ্গী ছিল, তারা কেউ সঙ্গে নেই আজ। আর তাদের মধ্যে একজন অকালে চিরকালের জন্য আমাদের ছেড়ে চলে গেছে। অথবা চিরকালের জন্য রয়ে গেছে এই দেবতাত্মা হিমালয়ে। তার নাম শ্রীমতী সুজয়া গুহ। ১৯৭০ সালের সফলকাম ললনা (২০,১৩০´) অভিযানের সুযোগ্যা নেত্রী। চন্দ্রভাগার উপনদী ভাগার তীরে তার দেহ পঞ্চভূতে মিশে আছে। গতকাল চন্দ্রভাগার সঙ্গে দেখা হবার পর থেকেই কেন যেন বার বার আমার সুজয়ার কথা মনে পড়েছে। তাই চন্দ্রভাগার কাছে আমি তার আত্মার শান্তি কামনা করেছি। *

লাহুল হিমালয়ের সেই প্রাণধারা চন্দ্রভাগার কাছ থেকে এবারে নিতে হবে বিদায়। এখান থেকে মারু-চেনাবের তীরে তীরে পথ চলে আমরা পৌঁছব পাতিমহলা।

কিন্তু পাতিমহলার কথা এখন থাক। এখন বাণ্ডারকোটের কথা হোক, সঙ্গমটিকে দেখা যাক। চন্দ্রভাগা এসেছে পুব থেকে আর মারু-চেনাব উত্তর থেকে, মিলিতধারা প্রবাহিত হয়েছে পশ্চিমে। আমরা পশ্চিম থেকে এসেছি এবারে উত্তরে যাবো। দুটি নদীই ওপর থেকে প্রচুর পাথর এনেছে বয়ে। দুই বিপরীত স্রোতের মুখে পড়ে তারা সঙ্গমে সুবিশাল এক প্রস্তর-বদ্বীপ সৃষ্টি করেছে।

অনেকখানি জায়গা জুড়ে সঙ্গম। সঙ্গমতীরে থরে থরে কাঠ সাজানো রয়েছে। দুটি নদীই উচ্চ-হিমালয় থেকে কাঠ পরিবহন করে এনেছে। বন-বিভাগের শ্রমিকরা সেই কাঠ জল থেকে তুলে

* লেখকের 'লীলাভূমি-লাহুল' দ্রষ্টব্য।

তীরে জড়ো করেছেন। এখান থেকে গাড়ি করে এইসব কাঠ নিচে নিয়ে যাওয়া হবে।

উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজ বণিকরা কাঠ পরিবহনের জন্য যে পদ্ধতির প্রচলন করেছিলেন, আজও আমরা তা অনুসরণ করে চলেছি। অথচ এই পদ্ধতিতে শতকরা প্রায় পঁচিশ ভাগ কাঠ পাওয়া যায় না।

যাক্ গে এসব কথা বলা আর অরণ্যে রোদন করা একই কথা। তার চাইতে পথের দিকে নজর দেওয়া যাক।

পাহাড় থেকে নেমে এসেছিলাম সঙ্গমে। কয়েক মিনিট ধরে সঙ্গমতীরে প্রায় সমতল পথ পেরিয়ে উঠে এলাম একটা পুলের ওপরে। পুল পেরিয়ে পৌঁছলাম চন্দ্রভাগার অপর তীরে। খানিকটা প্রায় সমতল পথ চলে মারু-চেনাবের তীরে এলাম। আবার শুরু হল পাহাড়ে ওঠা।

পথের ডানদিকে ন্যাড়া পাহাড়, কোথাও খাড়া কোথাও বা আস্তে আস্তে ওপরে উঠেছে। আর পথের বাঁদিকে মারু-চেনাব। অনেক নিচে বয়ে চলেছে কিন্তু তার উচ্ছ্বসিত প্রবাহকে দেখতে পাচ্ছি না। নদীর ওপারে পাহাড়, সীমাহীন পাহাড়। পাহাড়ের গায়ে গাছপালার বাহার।

এখন বিকেল চারটে। দুলতে দুলতে বাস চলেছে। দুলছে পথ অসমান বলে। কিন্তু তার চাইতেও বড় কথা, সংকীর্ণ পথ। দোলানীটা একটু যদি বেশি হয় আর তার ফলে বাসটা যদি কাঁত হয়ে পড়ে, তাহলে বিক্ষুব্ধা চেনাবের বুকে আশ্রয় নিতে হবে।

বাসের ভেতরের অবস্থা আরও খারাপ। ভিড় প্রায় কলকাতার অফিস টাইমের মতো। সর্বত্র লোক দাঁড়িয়ে আছে। কোথাও বা তিনসারি। বাসের দোলানী বেশি হলেই তাঁরা টাল সামলাতে না পেরে গায়ের ওপর পড়ে যাচ্ছেন। এবং আমাদের নির্বিকার ভাবে বসে থাকতে হচ্ছে।

না, নির্বিকার থাকা গেল না। একটি যুবতী কয়েকমাসের শিশুকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ধাক্কা খাচ্ছে। কোলের বাচ্চাটিকে

সামলে রাখা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে। অতএব জয় উঠে দাঁড়ালো। মেয়েটি যেন স্বর্গ হাতে পেল। একবার বলতেই সে ধপ করে বসে পড়ল জয়ের জায়গায়।

কিন্তু জয়ের পক্ষেও এই দোদুল্যমান বাসে এত ভিড় ঠেলে দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব হচ্ছে না। তাই তাড়াতাড়ি ওর হাত ধরে পাশে বসাই। তিনজনের সিটে চারজনের জায়গা হল কোনমতে।

এতক্ষণ আঁকাবাঁকা চড়াই পথে ওপরে উঠছিলাম, এবারে আবার শুরু হল সিঁড়ি ভাঙ্গা। এক ধাপ ছাড়িয়ে আরেক ধাপ, তারপরে আবার এক ধাপ। কিছুক্ষণ আগে যেমন ধাপে ধাপে নেমে এসেছি, এখন আবার তেমনি ওপরে উঠছি। তখন পাশে ছিল চন্দ্রভাগা, এখন মারু-চেনাব — দুটি নাম হলেও আসলে একই ধারা।

অনেকটা ওপরে উঠে এসেছি। আরও উঠছি। উঠেই চলেছি। তাই তো চলব। আমরা যে নিচে নেমে গিয়েছিলাম।

হিমালয়ের পথ জীবনপথের মতো নয়। এপথে নিচে নামলে আবার ওপরে ওঠা যায়। এপথে পতন ও উত্থান একে অপরের পরিপূরক। তাই কিশ্‌তোয়ার থেকে যতটা নেমে আমরা সঙ্গমে পৌঁচেছিলাম, এখন আবার ততটাই ওপরে উঠতে হবে। কারণ পাতিমহলার উচ্চতা ও ৫০০০ ফুট।

পথের কথা অগেই বলেছি। সুন্দর সন্দেহ নেই, তবে সেই সঙ্গে ভয়ঙ্করও বটে। একটু এধার-ওধার হলেই বিক্ষুব্ধা নদীর বুকে আশ্রয় নিতে হবে। কিন্তু কথাটি বোধকরি চালকের খেয়াল নেই। বাসে খুবই ভিড় হয়েছে। সুতরাং বনেটের ওপরে তিনজন লোক বসেছেন। তাঁদেরই একজনের সঙ্গে সমানে গল্প চালিয়েছে চালক। কখনও বা স্টীয়ারিং ছেড়ে দিয়ে সিগারেট ধরাচ্ছে।

জয় আমাকে আশ্বস্ত করে—আপনি অযথা ভয় পাচ্ছেন, এদের অভ্যেস আছে।

—তা আমিও জানি। কিন্তু ভাই দুর্ঘটনা সর্বদাই দুর্ঘটনা।

ওর হাতে যখন এতগুলো মানুষের প্রাণ, তখন ওর আরেকটু সাবধান হওয়া উচিত।

এবারে জয় মাথা নাড়ে। আমি আবার বলি— আমি ভয় পেয়ে কথাটা বলি নি জয়! ভয় পাবার কি আছে? একদিন তো সবাইকে যেতে হবে। আর সেই যাওয়া যদি হিমালয়ের পথে হয়, তার চাইতে বড় সৌভাগ্য আর কি হতে পারে? কিন্তু এই ভয়ঙ্কর ও সুন্দর পথ পাড়ি দেবার সময় আমার কেবলি মনে হচ্ছে জীবন মৃত্যুর চেয়ে অনেক বেশি সত্য, বেশি সুন্দর আর বেশি মহান। তাই জীবন আত্মহত্যা করবার জন্য নয়।

তিনজনের সিটে চারজন বসেছিলাম, এখন পাঁচজন হয়েছি। জনৈক প্রৌঢ় সিটের হাতলে বসেছেন। তিনি মাঝে-মাঝেই আমার ঘাড় ধরে ধাক্কা সামলাচ্ছেন। কি করব? ঘাড়ধাক্কা খেয়েও বসে থাকতে হচ্ছে।

বিকেল সওয়া চারটে। সহযাত্রীরা জানালেন—ওপরে ওঠার পালা শেষ হল। এবারে মোটামুটি সমতল। পালমার এসে গেল

তুবছর আগেও পালমার পর্যন্তই বাসপথ ছিল গতবছর পাতিমহলা পর্যন্ত পথ প্রসারিত হয়েছে। পথ এগিয়ে চলেছে কয়েকবছরের মধ্যে এখেলা পর্যন্ত বাস চলাচল করবে। করলেই ভাল। হিমালয়ে মোটরপথ আধুনিক যন্ত্রসভ্যতার পথিকৃত।

পালমার একটি ছোট উপত্যকা। বলা বাহুল্য কিশ্‌তোয়ারের মতো সমতল নয়। পথের ওপরে ও নিচে কয়েকটি বাড়িঘর এবং কিছু চাষের জমি নিয়ে পালমার। ক্ষেতে আলু, পালং, মূলা ও কফি ফলে আছে। ফলে আছে রামদানা ও ভুট্টা।

পথের পাশে পাহাড় ভেঙে খানিকটা জায়গা সমতল করা হয়েছে। সেখানে এসেই থামল আমাদের বাস।

অনেক যাত্রী নেমে যাচ্ছেন। জয় যে মেয়েটিকে সিট ছেড়ে দিয়েছিল, সে-ও বাচ্চা নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। তাড়াতাড়ি ওকে গিয়ে সিটটা দখল করতে বলি। বলা যায় না, অন্য কেউ হয়তো বসে

পড়বে। অবশ্য তাতে খুব বেশি একটা ক্ষতি হবে না কারণ এখান থেকে পাতিমহলা মাত্র ৩ কিলোমিটার। তাহলেও জয় গিয়ে তাড়াতাড়ি নিজের জায়গায় বসে পড়ে।

বসে বলে—আমরা আবার কিশ্‌তোয়ারের সমান উঁচুতে উঠে এসেছি। এখানকার উচ্চতাও ৫০০০ ফুট। আর তাই তাকিয়ে দেখুন, কিশ্‌তোয়ার কেমন পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

তাড়াতাড়ি সেদিকে তাকাই। সত্যই তাই। ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে কিশ্‌তোয়ারকে। আমরা দেখি। বার বার দেখি।

দেখতে দেখতে বাস ছেড়ে দেয়। এখন বিকেল সাড়ে চারটে। গৌতম বলে—পালমার বড় জায়গা নয় কিন্তু মাধ্যমিক স্কুল আর পোস্টাপিস আছে। পাতিমহলা এখন বাসপথের প্রান্তসীমা হলেও সেখানে কোন ডাকঘর নেই।

না, থাক। ডাকঘরের দরকার নেই আমার। সভ্য জগৎ, শুধু সভ্য জগৎ কেন, মনুষ্যলোকের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলেছি ব্রহ্মলোকে। এখন ডাকঘর দিয়ে কি করব? তার চেয়ে ব্রহ্মলোকের প্রবেশ তোরণটিকে দেখা যাক।

হ্যাঁ, এই পথই ব্রহ্মলোকের পথ। সবে তৈরি হয়েছে। গত বছর থেকে বাস চলাচল করছে। এখনও স্থিতি লাভ করে নি। কয়েকটা শীত ও বর্ষা সইবার পরে হিমালয়ের পথ মোটামুটি স্থায়ী হয়।

তাছাড়া পথের এ অংশটা যেমন সংকীর্ণ, তেমনি অসমতল। ফলে বাসের দোলানী আরও বেড়েছে। এবং পথ মাঝে মাঝেই মেয়েদের চুলের কাঁটার মতো বাঁকা—ওপরে উঠেছে কিম্বা নিচে নেমে গেছে। ফলে ড্রাইভার বাঁকের মুখে এসে গাড়ি থামিয়ে দিচ্ছে। তারপরে খানিকটা পেছনে গাড়ি নিয়ে আবার সামনে এগিয়ে বাঁক ফিরছে। পথের পাশে কোথাও রক্ষা প্রাচীর নেই।

কেবল বাঁক ফিরবার জন্যই বাস থামছে না। যাত্রী নামবার জন্যও থামছে এবং বার বার থামছে। ড্রাইভার বেচারী কি করবে? সবাই নিজের বাড়ির সামনে নামতে চাইছে।

অবশেষে বিকেল সওয়া পাঁচটার সময় আমরা পাতিমহলা পৌঁছলাম। তার মানে তিন কিলোমিটার পথ আসতে প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময় লাগল।

লাগুক গে। এখানে তো অফিস করতে আসি নি যে সময়ে পৌঁছতে হবে। আর তাই নেতা নির্দেশ দেয়—অন্য যাত্রীরা নেমে যান, তারপরে আমরা নামব।

এটা পশ্চিম হিমালয়, আজ তেরোই সেপ্টেম্বর, সুতরাং সন্ধ্যে হতে এখনও দেরি আছে। কিন্তু রোদ নেই। মেঘলা আকাশ। হিমালয়ে মেঘ দেখলে মন ময়ূরের মতো নেচে ওঠে না, অজানা আশঙ্কায় আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। তারপরেই মনে পড়ে এখন সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহ। গাড়োয়াল-কুমায়ুনে দেখেছি, পর্বতাভিযানে আসার শ্রেষ্ঠ সময় এখন। এখানেও মেঘ কেটে রোদ উঠবে। প্রকৃতির করুণা ছাড়া যেমন পর্বতাভিযান সফল হতে পারে না, তেমনি পর্বতারোহীকে হতে হয় আশাবাদী। মেঘলা আকাশ আমাদের তাই নিরাশ করতে পারে না।

কিন্তু পর্বতাভিযানের প্রসঙ্গ থাক। অন্যান্য যাত্রীরা প্রায় সকলেই বাস থেকে নেমে পড়েছেন। আমরাও উঠে দাঁড়াই।

বাস থেকে নামতেই গৌতম ও শিবু স্বাগত জানায়। ওরা আমাদের আশ্রয় ও মাল পরিবহনেব ব্যবস্থা করতে সকালের বাসে এখানে চলে এসেছে। শিবু বলে—সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে, কাল সকালেই পদযাত্রা শুরু করছি।

ওরা বাসের ছাদ থেকে মালপত্র নামাতে লেগে যায়। আমি আর অমূল্য পথের পাশে এসে দাঁড়াই। পাহাড় ভেঙে পথের খানিকটা অংশ চওড়া করা হয়েছে। সেখানেই বাস এসে থেমেছে। তাই বলে জায়গাটা সোজাসুজি বাস ঘোরাবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। সামনে পেছনে করে কোনমতে বাসখানিকে ঘোরাতে পারা যাবে।

বাসস্ট্যাণ্ডে কয়েকটি দোকান। সবই পাথর আর কাঠের ঘর। মাটির মেঝে। একটি মুদি, একটি দর্জি ও গুটি তিনেক চায়ের

দোকান। চায়ের দোকানে নাকি ফরমাস দিলে ডাল ভাত ও সবজি পাওয়া যায়।

পথের বাঁদিকে নদী, ডানদিকটা আস্তে আস্তে-উঁচু হয়ে গিয়ে বনময় পাহাড়ে মিশেছে। সেখানে কয়েকখানি ঘর ও একফালি ক্ষেত। নদীর ওপারে পাহাড়ের গায়েও অনেকটা জুড়ে ক্ষেত। সামনে খানিকটা দূরে পথের পাশে আরও কয়েকটি বাড়ি দেখতে পাচ্ছি।

শেরপা ও মালবাহকদের সহায়তায় সদস্যরা ডানদিকের দোকানের দাওয়ায় মালপত্র রাখছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখি আর ভাবি, গৌতম ও শিবু নিশ্চয়ই এরই কোন ঘরে আমাদের রাতের আশ্রয় ঠিক করেছে। কারণ এখানে এর চেয়ে ভাল ঘর দেখছি না। তবু তো আজ ঘরে বাস করতে পারব। কাল থেকে কিভাবে রাত কাটবে কেবল হিমালয় জানেন। আমি শুধু জানি আজ আমার বাসযাত্রার যতি পড়ল। আগামীকাল থেকে চরণযুগলকে সম্বল করে দুর্গম থেকে দুস্তর পথে যেতে হবে এগিয়ে।

॥ চার ॥

—বাবুজি ! চায় ।

ঘুম ভেঙ্গে যায় । কোমল কিশোরীর কণ্ঠস্বর । মনে পড়ে সব কথা, শ্যামার কথা ।

তাড়াতাড়ি উঠে বসি । ষোড়শী শ্যামার হাত থেকে মগটা হাতে নিই । এতো চা নয়, জীবনসুধা । ঠোঁটে ঠেকিয়ে স্বর্গসুখ উপভোগ করি । আর ভাবতে থাকি গতকাল বিকেলের কথা, পাতিমহলার কথা, শ্যামার কথা ।

বাস থেকে মালপত্র নামাবার পরে পথের পাশের ঘরখানি দেখিয়ে শিবু বলেছে—এই ঘরে থাকব আমরা ।

—এই চায়ের দোকানে !

—হ্যাঁ । তবে এটা শুধু চায়ের দোকান নয়, দোকানীর বাড়িও বটে । এখানে এর চেয়ে ভাল আশ্রয় নেই ।

থাকলেও সুখের কিছু ছিল না । পর্বতাভিযানে এসে ঘরে থাকতে পারছি, এটাই বড় কথা । ঘর কি রকম, তা নিয়ে মাথা ঘামানোর সুযোগ নেই । সুতরাং তিন ধাপ মাটির সিঁড়ি ভেঙে উঠে এসেছি দোকানের দাওয়ায় । দাওয়ার একদিকে ছাউনীর নিচে চায়ের দোকান, আরেকদিকে ছোট একখানি ঘর । দোকানের পেছনে একফালি বারান্দা । এই নিয়ে দোকানীর দোকান ও বাড়ি । নাম রুস্তম বাট । বয়স ছ'য়ের ঘরে । দীর্ঘদেহী । যৌবনে যে স্বাস্থ্যবান ও সুপুরুষ ছিলেন এখনও বেশ বোঝা যায় ।

রুস্তমজী জাতিতে গুর্জ্জর । আগে ভেড়া চরাতেন । বছর দশেক আগে স্ত্রী বিয়োগের পরে স্থায়ী হয়েছেন এখানে । সামান্য কিছু জমি আর এই দোকান দিয়ে সংসার প্রতিপালন করছেন ।

এখন অবশ্য সংসার খুবই ছোট । ছয় মেয়ের মধ্যে পাঁচজনেরই

বিয়ে হয়ে গেছে। তারা সবাই সুখে স্বামীর ঘর করছে। এখন ছোট মেয়ে শ্যামাকে নিয়ে তাঁর সংসার।

রুস্তম বাট নামটি শুনে আরেকজনের কথা মনে পড়েছে আমার। তাঁর নাম আক্রাম বাট মল্লিক। তিনি হারিয়ে যাওয়া অমরনাথ গুহাকে খুঁজে বার করেছেন। তিনিও ছিলেন যাযাবর গুর্জর। হিমালয়ের গহন-গিরি-কন্দরে ভেড়া চরাতেন। একদিন একটা ভেড়া গেল হারিয়ে। ভেড়া খুঁজতে খুঁজতে আক্রাম বাট গিয়ে উপস্থিত হলেন একটি গুহায়। দর্শন করলেন স্বয়স্তু তুষারলিঙ্গ। *

তাই তাঁর বংশধরগণ আজও যাত্রীদের অর্ঘ্যের অংশ পেয়ে যাচ্ছেন। পুণ্যার্থীরা অমরনাথজীকে যে অর্থ বস্ত্র ও ফল-মিষ্টি নিবেদন করেন, তা তিনভাগ করা হয়। একভাগ পান ছড়ির মহান্ত মহারাজ, একভাগ মার্তণ্ডের পাণ্ডারা (অমরনাথের পূজারীরা) আরেক ভাগ আক্রাম বাটের বংশধরগণ। এবং তাঁরা এখন পহেল-গামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধনী পরিবার।

আরেকজন বাট এখন আমাদের আশ্রয়দাতা। তাঁরই কিশোরী কন্যা এই শীতল সকালে চা এনে ঘুম ভাঙ্গিয়েছে আমার। না, কেবল আমার নয়, সেই সঙ্গে সবার। আমি আর অমূল্য চৌকিতে শুয়েছি, বাটসাহেবের বাড়ির একমাত্র চৌকি। শিবু, তপন ও গৌতম শুয়েছে মেঝেতে, বাকি সবাই সামনের দাওয়া ও পাশের বারান্দায়।

না, শ্যামা ও তার বাবা কাল ঘরে ঘুমোয় নি। রাত সাড়ে দশটায় আমাদের খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকেছে। তারপরে বাপ-বেটি নিজেদের কম্বল বের করে আমাদের বিছানা করে দিয়েছে এবং আমাদের অপ্রস্তুত করে নিজেরা পাশের বাড়িতে শুতে চলে গেছে। আজ সকালে শ্যামা এসে চা বানিয়ে ঘুম ভাঙ্গিয়েছে আমাদের।

অথচ কতই বা বয়স মেয়েটার? বছর ষোলো হবে হয়তো। দেখতেও কিন্তু ভারী সুন্দর। টানা-টানা চোখ, উঁচু নাক, মাথায় একরাশ কালোচুল, বেশ লম্বা আর স্বাস্থ্যটাও ভাল।

---

* লেখকের 'অমরতীর্থ অমরনাথ' দ্রষ্টব্য।

কেবল গায়ের রঙটা কাশ্মীরীদের মতো অত ফর্সা নয়। আর তাই বোধকরি শ্যামাকে এত সুন্দর দেখায়।

যাক্ গে শ্যামার কথা। অমূল্যকে বলি—কাল রাতে তো ভাল ঘুম হয়েছে ?

—হ্যাঁ। রঞ্জু যে ওষুধটা দিয়েছিল, খুবই ভাল।

—তাহলে লীডার, আমাদের মেডিক্যাল অফিসার মেডিসিনের ক্লাশ না করেও ভাল ডাক্তার ? সঙ্গে সঙ্গে সহনেতা সুযোগ নেয়। কারণ তারই আশ্বাসে নেতা ডাক্তার না নিয়ে অভিযানে এসেছে।

এত সহজে হার মানবার মানুষ নয় আমাদের নেতা। সে বলে—রঞ্জুর প্রকৃত পরীক্ষা এখনও আরম্ভই হয় নি। কাজেই সে কেমন ডাক্তার, তা আমি যথাসময়ে বলব। আপাতত শ্যামার প্রশংসা করা যাক। কারণ সে চা করে আমাদের ঘুম না ভাঙালে রওনা দিতে দেরি হয়ে যেত।

আমরা সমস্বরে সমর্থন করি তাকে। সত্যই শ্যামা আমাদের অশেষ উপকাব সাধন করেছে। এখুনি ঘোড়াওয়ালা এসে যাবে। পদযাত্রার প্রথমদিনেই আজ আমাদের দীর্ঘ ও দুর্গম পথ পাড়ি দিতে হবে। তাছাড়া হিমালয়ের আবহাওয়াকে বিশ্বাস নেই। উচ্চ-হিমালয়ে সাধারণতঃ দুপুরের পরে আবহাওয়া খারাপ হয়ে যায়।

সত্যি বলতে কি এমন আতিথেয়তা এবারে প্রত্যাশা করি নি। কারণ নিজের অভিজ্ঞতা থেকে, জানি কাশ্মীরের অধিকাংশ মানুষ পর্যটকদের ওপর নির্ভরশীল হয়েও মোটেই অতিথিবৎসল নয়। সুযোগ পেলেই তারা পর্যটকদের শোষণ করে। কিশ্‌তোয়ারে এসেই অবশ্য এর ব্যতিক্রম চোখে পড়েছিল। এখানে পৌঁছে ধারণাটি পালটে গেল। নইলে এই পাতিমহলায় শ্যামার মতো মেয়ে আর বাটসাহেবের মতো বাপ থাকবে কেন ?

ছোট গ্রাম পাতিমহলা। পঁচানব্বুইখানি ঘরে শ'সাতেক মানুষের বাস। চার শ' নাকি ভোটার আছে এ গ্রামে। আছে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত একটি স্কুল। ছেলে-মেয়েরা একসঙ্গে পড়ে। শ্যামাও পড়েছে

ক্লাশ ফাইভ পর্যন্ত। তারপরে ছোড়দির বিয়ের পর থেকে বাবাকে চাষাবাদ আর দোকানদারীতে সাহায্য করছে। না করেই বা কি করবে? সামান্য আয়, বাবা লোক রাখবেন কেমন করে?

গতকাল বিকেলে শ্যামা আমাদের ক্ষেতের সবজি খাইয়েছে। ধান যব ভুট্টা রামদানা রাজমা (পাহাড়ী ডাল) আলু, টমেটো ও সবজির চাষ হয় এ গ্রামে। তবে যা হয়, তা নাকি এদের খেতেই লেগে যায়। বাইরে চালান করতে পারে না।

কথাটা কাল বলেছে শ্যামা। আমাদের সবজি এনে দেবার পরে তপন তাকে দাম দিতে চেয়েছিল। শ্যামা বলেছে—ইয়ে কলকাত্তা নহী হ্যাঁয়।

অর্থাৎ এটা কলকাতা নয়, এখানে সবজি বিক্রি হয় না। আসল কথাটি বোধকরি অন্য—এরা দরিদ্র হলেও শহর কিম্বা সমতলের মানুষদের মতো পয়সার কাঙাল নয়।

ওরা জায়গা দিয়েছেন, তাই কালরাতে আমরা বাপ-বেটিকে আমাদের সঙ্গে খেতে বলেছিলাম। কিন্তু বাটসাহেব সবিনয়ে সে নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছেন। বলেছেন—আমরা দুপুরেই রাতের রান্না সেরে রেখেছি। আপনাদের সঙ্গে খেলে আমাদের খাবার নষ্ট হয়ে-যাবে।

অর্থাৎ আমরা কাল কোনভাবেই কৃতজ্ঞতার ঋণ শোধ করতে পারি নি। ভেবেছি আজ যাবার সময় চায়ের দামের সঙ্গে কিছু টাকা বেশি দিয়ে যাবো। এখন নিতে আপত্তি না করলে হয়।

আবার পাতিমহলার ভাবনাটা পেয়ে বসে আমাকে। পাতিমহলা এখন বাসপথের প্রান্তসীমা। মারু-চেনাব উপত্যকার মানুষদের কিশ্‌তোয়ার কিম্বা জম্মু যাতায়াতের পথে এখানে থামতে হয়। তাই বলে পাতিমহলার তেমন কোন উন্নতি হয় নি। বাটসাহেব বলেছেন—চার শ' ভোটার আছে আমাদের গ্রামে। তারই লোভে ভোটের আগে নেতারা আসেন। আমাদের নানা প্রতিশ্রুতি দেন। ভোট মিটে গেলে কেউ কথা রাখেন না। তবু নাকি এবছর রাস্তা আর

জলের জন্য চল্লিশ হাজার টাকা বরাদ্দ হয়েছে। কিন্তু কোথায়, কাজ তো কিছু দেখতে পাচ্ছি না।

আরও অনেক কথা বলেছেন বাটসাহেব। কিন্তু থাক্ সে সব কথা। শ্যামা কিম্বা পাতিমহলার কথা ভেবে আর সময় নষ্ট করা উচিত হবে না। তাড়াতাড়ি উঠে পড়ি। প্রাতঃকৃত্য সেরে ফিরে আসি বাটসাহেবের দোকানে। পাতিমহলা মাত্র পাঁচ হাজার ফুট উঁচু হলেও জল বেশ ঠাণ্ডা। সেই জলেই মুখ-হাত ধুতে হল। এখন একটু শীত-শীত করছে।

কিন্তু দোকানে ফিরে এসেই আবার গরম চা পাওয়া গেল। শুধু চা নয়, শ্যামা ইতিমধ্যে ব্রেকফাস্ট রেডি করে ফেলেছে। গরম-গরম পরোটা ও চা দিয়ে প্রাতঃরাশ ভালই হল।

• ঘোড়াওয়ালা এসে গেল। শেরপা ও মালবাহকদের নিয়ে শিবু জগদীশ টুলটুল ও গোরা মাল বোঝাই শুরু করে দিল।

অমূল্য বলে—টুলটুল ও গোরা আমাদের সঙ্গে চলো। গৌতম ও কৃষ্ণ এখানে থাকুক। আমি নন-ক্লাইম্বিং মেম্বারদের নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি। তোমরা ঘোড়ার পিঠে মাল চাপিয়ে রওনা হবে।

নেতার নির্দেশে রুক্স্যাক্ পিঠে তুলি, আইস এ্যাক্স হাতে নিই। কিন্তু চলতে গিয়ে থামতে হয়, বাটসাহেব আমাদের জন্য জোরে জোরে আল্লাহ্‌তাল্লার দোয়া প্রার্থনা করছেন আর শ্যামা? সে সজল চোখে তাকিয়ে রয়েছে আমাদের দিকে। শ্যামা কাঁদছে। কিন্তু কেন? আমরা তো ওর কেউ নয়। একদিন আগেও সে চিনত না আমাদের। তবু আমাদের বিপদশঙ্কুল পদযাত্রার প্রাক্কালে সে চোখের জল ফেলেছে। শ্যামা যে গুর্জর কিশোরী হলেও ভারতের নারী, যার কোন যুগ নেই, ধর্ম নেই, সমাজ নেই। তাই তিরিশ বছর আগের ঋষিকেশের অঞ্জলির সঙ্গে তিরিশ বছর পরের পাতিমহলার শ্যামা মিলে মিশে এক হয়ে গেল। *

সেদিন যেমন অঞ্জলির অনুরোধের উত্তরে নীরব ছিলাম, আজও

* লেখকের 'বিগলিত-করুণা জাহ্নবী-যমুনা' দ্রষ্টব্য।

তেমনি নীরবে এগিয়ে চলি সামনে। সেদিনের অঞ্জলির মতো আজকের শ্যামাও পড়ে থাকে পেছনে। আমি এগিয়ে চলি ব্রহ্মলোকের পথে।

নির্দিষ্ট সময় অর্থাৎ সকাল ঠিক সাড়ে-সাতটাতেই রওনা দেওয়া গেল। সবার আগে চলেছে অমূল্য, চলেছে খোঁড়াতে খোঁড়াতে। তার পেছনে জয়, রঞ্জু, শৈলেশ, গোরা, টুলটুল ও আমি। গৌতম, কৃষ্ণ, তপন, শিবু ও জগদীশ ঘোড়ার পিঠে মাল বোঝাই করে শেরপা ও মালবাহকদের নিয়ে রওনা হবে। ছ'টা ঘোড়া নিতে হয়েছে। শুনেছি সোন্দার গ্রাম পর্যন্ত ঘোড়া যেতে পারবে। তারপরে মালবাহক নিতে হবে। ঘোড়াওয়ালা মহম্মদ ইক্‌বাল বলেছে, সোন্দারে মালবাহক পেতে কোন অসুবিধে হবে না।

শুধু ঘোড়া নয়, দুটি মানুষও আমরা নিয়েছি পাতিমহলা থেকে। দুজনে মাসতুতো ভাই, দুজনের একই নাম—আবদুল রসিদ। বয়স বাইশ ও তেইশ বছর। ছোট ভাইয়ের গায়ের রংটা খুব ফর্সা নয় আর সে একটু খাটো। বড় ভাই ফর্সা এবং বেশ লম্বা। ছোটর বিয়ে ঠিক হয়েছে আর বড় বউকে তালাক দেবার কথা ভাবছে। কারণ বউ তার মায়ের সেবা করতে চায় না।

এরা মূল-শিবিরে আমাদের সব কাজে সাহায্য করবে এবং প্রয়োজনে এক নম্বর শিবির পর্যন্ত মাল বইবে। পর্বতারোহণের ভাষায় এদের বলা হয় Low altitude porter বা 'LAP' আর গৌতম ও শিবু যে রাম সিং ও পেয়ার সিংকে নিয়ে এসেছে, তাঁরা হল High altitude porter বা 'HAP' তারা তিন নম্বর শিবির পর্যন্ত মাল বইবে এবং বরফের ওপরে শেরপাদের সর্বরকমে সাহায্য করবে।

মোটরপথ প্রসারিত হচ্ছে। পাতিমহলার পরে ২ কিলোমিটারের মতো পথ তৈরি হয়ে গেছে। সেই সমতল ও সুপ্রশস্ত পথ দিয়ে আমরা এখন চলেছি এগিয়ে।

পথে এখনও রোদ আসে নি। তবে রোদ উঠেছে। রোদ

পড়েছে চেনাবের ওপারে। প্রভাতী সূর্যের আলোয় ওপারের পাহাড় আর বন, ক্ষেত আর বাড়ি-ঘব সোনালী হয়ে উঠেছে। রঞ্জু ও গোরা তাড়াতাড়ি ক্যামেরা বের করে।

সমতল পথটি সামান্য উৎরাই হয়ে একটা নালার ধারে পৌঁছল। নালা পেরিয়ে আবার আস্তে আস্তে উঠে যাওয়া পথে এগিয়ে চলি। আমাদের বাঁয়ে চেনাব, ডাইনে বনময় পাহাড়।

সকাল সওয়া আটটা। সুখের পথ শেষ হল। এবারে মোটরপথ ছেড়ে দিয়ে খাড়া চড়াই বেয়ে পাহাড়ের ওপর উঠে যেতে হবে। টুলটুল বলে—একটু বিশ্রাম করে নিন।

আমাকে নিয়ে ওদের দুশ্চিন্তা অনেক। আমার বয়স হয়েছে, আমার ডানপায়ের মালাইচাকি নেই। আমি ওর অনুরোধ উপেক্ষা করি না। আইস এ্যাক্‌সে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই জিরিয়ে নিই একটু। চারিদিকে চেয়ে দেখি। ওপারের পাহাড়টা নরম মাটির। আস্তে আস্তে ওপরে উঠেছে। তার ঢালে ক্ষেত ও বাড়ি-ঘর। সোনালী রোদে মনে হচ্ছে একখানি রঙীন ছবি।

আর এপারে ঝোপঝাড়ে ছাওয়া পাহাড়। পথ থেকে প্রায় খাড়া উঠে গেছে ওপরে। তারই গা বেয়ে আকাবাঁকা পথ। পরশু আমরা যেমন খাড়া পথে কিশ্‌তোয়ারে এসেছি। তফাৎ তখন বাসে বসে চড়াই পেরিয়েছি আর এখন শুধুই শ্রীচরণ ভরসা।

কেবল চড়াই হলেও বা কথা ছিল। সারা পথ জুড়ে বড় বড় পাথর। কোনোটিতে হয়তো পা দিলে নড়ে উঠবে। তখন ভারসাম্য রক্ষা করে তাড়াতাড়ি অন্য পাথরে পা রাখতে হবে। সেটি শক্ত হলে রক্ষে, নইলে আছাড় অবশ্যম্ভাবী। পাথরের ওপরে আছাড় মানেই মারাত্মক। পা ভাঙার পরে এই আমি প্রথম হিমালয়ে এলাম। আমি কি পারব এই পথ পাড়ি দিতে?

পারতেই হবে। পর্বতাভিযানে এসেছি যে! না পারলে চলবে কেমন করে?

গোরা বলে—এবারে আস্তে আস্তে চলুন, একটানা প্রায় হাজার-

খানেক ফুট ওপরে উঠতে হবে। সাতাশটা 'লুপ' আছে এখানে। তাড়াহুড়া করলে শ্রান্ত হয়ে পড়বেন।

এখনও এখানে রোদ আসতে পারে নি। তবু উইণ্ডপ্রুফ জ্যাকেট আর মাফলার খুলে রুক্‌স্যাকে ভরে নিই। তারপরে একটা লজেন্স মুখে ফেলে চলা শুরু করি।

একটানা প্রায় আধঘণ্টা চড়াই ভাঙা গেল। কিন্তু আর পারছি না, বড্ড ক্লান্ত লাগছে। টুলটুল বলে—একটু জিরিয়ে নিন।

ঠিকই বলেছে সে। একটা পাইনগাছের গোড়ায় বসে পড়ি। রুক্‌স্যাক্ থেকে জলের বোতল বের করি। একটু জল খাই। গলা শুকিয়ে দম বেরিয়ে আসছিল। এখন আরাম লাগছে।

চার বছর বাদে এমন দুর্গম পথে এসেছি। তাই বোধহয় এত তাড়াতাড়ি এমন ক্লান্ত হয়ে পড়েছি—অনভ্যাস আর বয়সের ভারে! তবু তো একনাগাড়ে এতটা পথ উঠে আসতে পেরেছি।

কিন্তু আমার কথা থাক। ভাবছি অমূল্যর কথা। সে কেমন করে এই চড়াই ভাঙছে? না, অমূল্য সত্যই একটা বিস্ময়।

চড়াই শেষ হল। গোরার ভাষায় সেই সাতাশটা 'লুপ' পার হওয়া গেল। একটা পাহাড় পার হয়ে আরেকটা পাহাড়ের পাদদেশে পৌঁছলাম। এ পাহাড়টা নিচের পাহাড়গুলির মতো ন্যাড়া নয়। এখানে সারি সারি পাইনগাছ। কিছু ঘাস আর কাঁটা ঝোপও রয়েছে। এখানে-ওখানে নানা রঙের ছোট-ছোট ফুল রয়েছে ফুটে।

ভেবেছিলাম এখানে পৌঁছুলে, সারাদিনের জন্য না হোক, অন্তত কিছুক্ষণের জন্য চড়াই-উৎরাই শেষ হবে, বেশ খানিকটা সমতল পথ পাওয়া যাবে। কিন্তু সে অনুমান মিথ্যে হল। সরু পায়ে-চলা পথটি এঁকেবেঁকে নেমে গেছে নিচে। তার মানে এখন উৎরাই, পরে আবার চড়াই হবে।

সে আর আমরা কি করব? যিনি স্রষ্টা, তিনি যা ভাল মনে করেছেন, তাই গড়েছেন। আমি পথিক। আমার কাজ শুধুই পথ-চলা।

এখনও রোদ আসে নি। তবু এতক্ষণ গরম লাগছিল। কিন্তু কয়েক মিনিট বসার পরেই শীত লাগতে শুরু করল। তাছাড়া সামনে দীর্ঘ ও দুর্গম পথ। বেলা ন'টা বেজে গেছে। অতএব আবার রুকস্যাক্ পিঠে তুলে নিই। টুলটুলের সঙ্গে এগিয়ে চলি।

গৌতম শিবু তপন কৃষ্ণ ও জগদীশ ঘোড়ার পিঠে মাল তুলে রওনা হয়েছে। ওরা কিন্তু আমাদের ধরে ফেলল। শুধু তাই নয়, আমাদের ছাড়িয়ে গেল। যাবার সময় শিবু বলে গেল—আস্তে আস্তে আসুন। এখেলায় 'হট্-লাঞ্চ্' খাওয়াবো।

শিবু কি সান্ত্বনা দিয়ে গেল। দিক গে, আমরা তো আর ওদের মতো পর্বতারোহী নই। আমরা ওদের সঙ্গে পারব কেন? তার চেয়ে বরং হট্-লাঞ্চের কথাই ভাবা যাক। হট্-লাঞ্চ্ মানে বিরিয়ানী কিংবা কালিয়া কোপ্তা নয়, গরম গরম ডাল ভাত ও সব্জি। তাই যথেষ্ট। শ্যামার সাধের পরোটা যে এক চড়াই পেরোতে গিয়েই হজম হয়ে গিয়েছে।

দেখতে দেখতে এগিয়ে চলেছি। এতক্ষণ বাঁদিকেই বেশি তাকিয়েছি। কারণ বাঁয়ে চেনাব বইছে আর কিশ্তোয়ার হিমালয়ের সৌন্দর্যের পসরা উপহার দিচ্ছে। এবারে ডাইনেও তাকাতে হচ্ছে। ডাইনে সংরক্ষিত বনাঞ্চল, সারি সারি পাইনের অপরূপ বাহার। তার-কাঁটার বেড়া দিয়ে পথ থেকে বনকে পৃথক করা হয়েছে। সেই বেড়ার পাশ দিয়ে পথ চলতে চলতে আমরা বনের রূপ দেখছি। মাঝে মাঝে গাছের ওপরে নম্বর লেখা। নম্বর নয়, গাছগুলোকেই দেখছি আমরা। বড় বড় পাইনগাছ। বন-বিভাগের ভাষায় 'নীডল্ পাইন'। শুনেছি এগাছের কাঠ খুবই মূল্যবান এবং এরা শুধু হিমালয়ের এই অঞ্চলেই জন্মায়।

পথের আরেক পাশে কোথাও পাহাড়টা ধীরে ধীরে চেনাবের চঞ্চল ধারায় মিশে গেছে, কোথাও বা একবারে খাড়া নেমে গিয়েছে। চেনাবের বিরামহীন প্রণবধ্বনি শুনতে শুনতে আমরা এতক্ষণ ধীরে ধীরে ব্রহ্মলোকের পথে এগিয়ে চলেছিলাম। কিন্তু আগেই বলেছি, এখন ডানদিকেই বেশি নজর দিতে হচ্ছে।

পাইনবনের ধারে পথের পাশে ঘাস আর ঝোপঝাড়। ফুটে আছে নানা রঙের অসংখ্য অজানা ফুল। তারা মাথা দুলিয়ে স্বাগত জানাচ্ছে। ফুলবনের মাঝে মিশে আছে কিছু ভাঙ গাছ। শুনেছি স্থানীয়রা এইসব গাছের সবুজ পাতা দিয়ে মুড়ে বিড়ি কিংবা সিগারেট খায়। দারুণ নাকি মৌজ আসে। কিন্তু আমি সে রসে বঞ্চিত। অতএব বন দেখতে দেখতে এগিয়ে চলেছি।

আবার চেনাবের দিকে তাকাই। চলা বন্ধ হয়ে যায়। সচল নদী নয়, মনে হচ্ছে অচল একখানি আঁকাবাঁকা রূপোলী রেখা। অসংখ্য মানিক জ্বলে আছে তার বুক জুড়ে। আমি দেখি আর দেখি। কিন্তু আমি যে পর্বতাভিযানে এসেছি। আমার তো থামবার অধিকার নেই। অতএব আবার এগিয়ে চলতে হয়। একটু বাদে বাঁকের আড়ালে রূপোলী রেখা যায় হারিয়ে।

সকাল সাড়ে ন'টা নাগাদ একটি ছোটগ্রাম পাওয়া গেল। আবদুল রসিদ দুভাই পথের ধারে মাল রেখে একটু জিরিয়ে নিচ্ছিল। আমাদের দেখে লজ্জা পায়, তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ায়। বলে—এ গাঁয়ের নাম খেরাইল। খানদশেক ঘর আর পঞ্চাশজনের মতো মানুষ নিয়ে গ্রাম।

না শুধু রসিদরা নয়। গোরা, জয়, শৈলেশ আর রঞ্জুও এগিয়ে এসে বসে আছে এখানে। বসে আছে একটা চায়ের দোকানের সামনে। আমাকে দেখে রঞ্জু ছুটে আসে কাছে। পিঠ থেকে রুক্‌স্যাক্ খুলে নিয়ে বলে—একটু বিশ্রাম করে একগ্লাশ চা খেয়ে নিন।

—Well done Soncuda, well done.

আমার প্রশংসা করতে করতে অমূল্য এসে হাজির হয়।

হেসে বলি—আমার তারিফ না করে নিজের প্রশংসা কর। সত্যি তুই অবাক করলি ভাই! ভাঙা পা নিয়ে কি করে এই দুর্গমপথ পার হয়ে এলি?

অমূল্য এসে আমার পাশে বসে। সঙ্গে সঙ্গে ওর মুখের হাসি মিলিয়ে যায়। সে যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পড়ে। একটু বাদে করুণ কণ্ঠে

বলে ওঠে—সত্যই শম্ভুদা, সাত্য বড্ড কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু কি করব বলো, হাঁটতে যখন শুরু করেছি, শেষ তো করতেই হবে।

—এখনও ঘোড়াওয়ালাকে বললে হয়তো একটা ঘোড়া যোগাড় করে দিতে পারবে।

—কিন্তু তোমাদের তো বলেছি শম্ভুদা, ঘোড়ায় চেপে আমি পর্বতাভিযানে যেতে পারব না। পায়ে হেঁটে না যেতে পারলে, বাড়ি ফিরে যাবো।

এর পরে আর কোন কথা চলে না। অতএব অন্য প্রসঙ্গ তুলতে হয়। তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করি—আমরা পাতিমহলা থেকে কতদূর এলাম ?

—চার কিলোমিটার। দোকানী উত্তর দেন।

—সেকি ! এতক্ষণে মাত্র ৪ কিলোমিটার ! আমি বিস্মিত।

মৃদু হেসে দোকানী বলেন—জী সাব !

—দু'ঘণ্টায় মাত্র ৪ কিলোমিটার হেঁটেছি। অমূল্য বলে—এত আস্তে তো চলা যাবে না। এখনও ১২/১৩ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে হবে।

—তা তো বুঝলাম। কিন্তু পেরে উঠব কি ?

—পারতেই হবে। অমূল্য যেন গর্জে ওঠে। বলে—ছক মতো না চলতে পারলে, অভিযান ব্যর্থ হয়ে যাবে।

অতএব তাড়াতাড়ি চা খেয়ে নিয়ে আবার এগিয়ে চলি।

পথ একই রকম—আঁকাবাঁকা আর চড়াই-উৎরাই। রোদ এসে গেছে। রোদে পুড়ে চড়াই ভাঙছি। লাভ হচ্ছে না কিছু। চড়াইয়ের পরেই আবার উৎরাই।

খেরাইল থেকে রওনা হয়ে ঘণ্টাখানেক হেঁটেছি। এখন বেলা এগারোটা। একঘণ্টায় কতটা এসেছি বুঝতে পারছি না। জানি না আজকের গন্তব্যস্থল আর কতদূরে ? তবে বড়ই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। পা-দুটো ক্রমেই অবাধ্য হয়ে উঠেছে ! কেবল ক্লান্তি নয়, সেই সঙ্গে ক্ষুধা। বার বার কেবল শিবুর কথা মনে পড়ছে। সে নাকি

এখেলায় আমাদের 'হট্-লাঞ্চ্' খাওয়াবে। এখেলা বোধকরি আর বেশিদূর নয়।

পথ দুর্গম, পথ কষ্টকর। কিন্তু সামনে কিংবা পেছনে তাকালে পথটি ভারী সুন্দর দেখায়! গাছে ছাওয়া উঁচু-নিচু আঁকাবাঁকা পথ। পথ নয়, যেন একখানি রঙীন ছবি।

শুধু পথের কথাই বা বলি কেন? নদীর কথাও না হয় বাদই দিলাম। নদীর ওপারের দৃশ্যও তাকিয়ে থাকবার মতো। পাহাড়গুলি প্রায় নদীর সমান্তরাল হয়ে সোজা উঠে গিয়ে আকাশের সঙ্গে মিশেছে। তার গায়ে সবুজের বিস্তার সামান্য কিন্তু রঙের বাহার অসামান্য। গাছপালা প্রায় নেই বললেই চলে। সারা পাহাড়টা মসৃণ পাথর দিয়ে গড়া। কিন্তু সে পাথর কালো নয়, লাল হলুদ আর সাদা সহ নানা রঙের পাথর।

ওপারেব সবুজ সামান্য কিন্তু এপারে সবুজ সীমাহীন। ওপারে খাড়া পাহাড় কিন্তু এপারে পাহাড়টা আস্তে আস্তে উঁচু হয়েছে। তারই বুক জুড়ে সবুজ। ঝোপ-ঝাড় ঘাস ফুল তো রয়েছেই তার সঙ্গে পাইনের সারি। আর সেই তারকাঁটার বেড়া।

কিন্তু বেড়া দিয়ে রাখলেই কি বন-সংরক্ষণ হয়ে গেল? সকাল থেকে হাঁটছি অথচ এখন পর্যন্ত বনবিভাগের কোন কর্মরত শ্রমিকের সঙ্গে দেখা হল না। তাছাড়া যেখানে পথের এই হাল, সেখানে কেমন করেই বা বনের রক্ষণ ও উন্নয়ন সম্ভব? মনে পড়ছে সুইজারল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও পশ্চিম-জার্মানীর কথা। আল্পস, এ্যালসাস ও ব্ল্যাক-ফরেস্ট অঞ্চলে কি সুন্দর ও মসৃণ পথ। সেই পথ দিয়ে দিনরাত গাড়ি চলেছে। পর্যটক আর বনসম্পদ যাওয়া-আসা করছে। অথচ এই সীমাহীন বনাঞ্চলের কাছে সে বনসম্পদ কিছুই নয়। হিমালয়ের বনসম্পদ আমাদের জাতীয় সমৃদ্ধির একটা উৎস হতে পারে।

হতে পারে কিন্তু হয় নি। এবং বোধকরি হবেও না। কারণ কর্তব্য আর সততা শব্দদুটি যে বিদায় নিতে বসেছে ভারতীয় অভিধান থেকে।

চড়া রোদ উঠেছে। গরম লাগছে, পিপাসা পেয়েছে, খিদেয় পেটব্যথা করছে। বড়ই ক্লান্ত লাগছে। পা-দুটো আর চলতে চাইছে না। একটু জিরিয়ে নিতে পারলে হ'ত।

একটা ছোট পাইনগাছ পথের ওপর ছায়া বিছিয়েছে। কাউকে কিছু না বলে পিঠ থেকে রুক্‌স্যাক্ নামাই। গাছের ছায়ায় বসে পড়ি।

কেউ আপত্তি করে না। ওরাও বসে পড়ে। এখন শুধু জয় ও শৈলেশ আমার সঙ্গে রয়েছে। অমূল্য সহ সবাই এগিয়ে গেছে। ওরা বোধকরি এতক্ষণে খেতে বসে গেছে।

না। আর বসে থাকার কোন মানে হয় না। তার চেয়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে হট্-লাঞ্চ্ করে নেওয়াই ভালো। তাছাড়া এখনও সামনে সুদীর্ঘ পথ পড়ে রয়েছে। বেশিক্ষণ বিশ্রামের অবকাশ নেই।

অতএব রুক্‌স্যাক্ পিঠে তুলে আবার চলা শুরু করি। ওরাও সঙ্গী হয়!

সকালের দিকে পথচারীর সাক্ষাৎ পাই নি। এখন মাঝে মাঝেই দু-চারজন নারী-পুরুষের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। ওরা ক্ষেতে যাচ্ছে, কেউ ক্ষেত থেকে ঘরে ফিরছে। মাথায় তাদের ভুট্টা রামদানা কিংবা ঘাসের বোঝা। শীত এসে যাচ্ছে। শীতের খাদ্য ও জ্বালানী সঞ্চয় করে রাখতে সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

কিশ্‌তোয়ার পৌঁছবার পরেই লক্ষ্য করেছি, আজও দেখছি, এ অঞ্চলের পোষাক বড়ই বৈচিত্র্যময়। এঁরা এখনও নিজেদের হাতে তৈরি পোষাক পরেন। ছেলেরা সাধারণতঃ পায়জামা ও কুর্তা। কেউবা জ্যাকেট ব্যবহার করেন। মাথায় টুপি আর পায়ে ঘাসের জুতো। মেয়েরা অনেকেই ছেলেদের মতো হাতে তৈরি পশমের সালোয়ার পরেছেন। আবার কেউবা পুট্টু মানে একটুকরো দিশী কম্বল গলায় বেধে হাঁটু পর্যন্ত ঝুলিয়ে দিয়েছেন। অনেকে আবার তারই ওপরে কুর্তা পরে নিয়েছেন। তবে সবারই পায়ে ঘাসের জুতো।

জয় বলে—এঁরা দরিদ্র গ্রামবাসী, এঁরা বড় একটা শহরে যান না। তাই এঁদের এই পোষাক। যাঁরা শহরে গিয়েছেন তাঁরা 'টেরিকট' অথবা 'টেরিউলের' প্যান্ট্-কোট কিংবা সালোয়ার-কামিজ পরেন। আর পায়ে দেন হান্টার অথবা হকি-শু জাতীয় জুতো।

শহরবাসীদের কথা বলতে পারি না কিন্তু গাঁয়ের এই মানুষগুলি ভারী ভাল। ভাঙা ভাঙা হিন্দীতে ওঁরা আলাপ করেন। ব্রহ্মলোকের কথা শুনে ওঁরা হাতজোড় করে ব্রহ্মাজীকে প্রণাম জানিয়ে বলেন—ব্রহ্মাজীর পুজো দিতে যাচ্ছেন শুনে সুখী হলাম। আপনারা ভাগ্যবান। আমরা তো এত কাছে থেকেও কোনদিন ব্রহ্মাজীর কাছে যেতে পারি নি। তবে তিনি বড়ই জাগ্রত। তিনি নিশ্চয়ই আপনাদের ভাল করবেন।

গতকাল কিশ্তোয়ারে বসেই গৌতম সবাইকে বলে দিয়েছে, আমরা যেন স্থানীয়দের কাছে পর্বতারোহণের কথা না বলি। কারণ হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে এ অঞ্চলের মানুষ পুরুষানুক্রমে ব্রহ্মা শিখরকে ভয় এবং ভক্তি করে আসছেন।

—শঙ্কুদা! ঐ দেখুন এখেলা দেখা যাচ্ছে।

তাড়াতাড়ি সামনে তাকাই। সত্যি তাই। খানিকটা দূরে একটা উপত্যকা ও কিছু বাড়ি-ঘর। মনটা আনন্দে ভরে ওঠে। ওখানে পৌঁছে বিশ্রাম করতে পারব, জল পাবো, হট্-লাঞ্চ্ জুটবে। চলার বেগ বেড়ে যায়। চলতে চলতে উপত্যকাটিকে দেখি।

নদীটি সরে গেছে দূরে। নদীর তীর থেকে আস্তে আস্তে উঠে ক্ষেতগুলি পথে এসে মিশেছে। পথের ডানদিকেও ক্ষেত আর ঘর-বাড়ি। বাড়ি বেশি নয়। কিন্তু ঘরগুলো বেশ শক্ত ও সুন্দর। একটা তিনতলা ঘরও দেখতে পাচ্ছি।

গাঁয়ের মানুষ ক্ষেতে কাজ করছেন। তাঁরা হাত নেড়ে স্বাগত জানাচ্ছেন। আমরা হাসিমুখে হাত নেড়ে এগিয়ে চলি।

মাটি আর পাথরের প্রায় সমতল পথ। পাথর বাঁদিকে বনবিশ্রাম

গৃহ, নদীর ধারে। নদীর ওপারে সারি সারি সীমাহীন পাহাড়ের ঢেউ। প্রথমে সবুজ, তারপরে কালো আর ধূসর পাহাড়।

না, সাদা পাহাড় দেখা যাচ্ছে না এখনো। তবে দেখব, আজ না দেখতে পেলেও কাল আশাকরি আমি তুষারমৌলি হিমালয়ের হাতছানি দেখতে পাবো।

দুপুরবেলা অর্থাৎ বারোটার সময় এখেলা বনবিশ্রাম গৃহে পৌঁছলাম। পথের পাশে নদীর ধারে সুন্দর একটি একতলা বাড়ি। টিনের চাল, পাথরের দেওয়াল। সামনে ছোট একফালি জায়গা, তারপরে খোলা বারান্দা। পাশে একখানি ছোট ঘর, সেখানে জলের কল। পাশের পাহাড় থেকে ঝরণার জল পলিথিনের পাইপ দিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে এখানে। গেটের সামনে একখানি সাইনবোর্ড। তাতে লেখা—এটি সংরক্ষিত বনাঞ্চল। এখানে শিকার নিষিদ্ধ। এই অঞ্চলে নানা জাতের পাখি বানর ও হরিণ আছে। আছে কালো ভালুক, সাপ ও বাঘ।

ভাবি—কারো সঙ্গেই তো দেখা হ'ল না এখনো।

বারান্দাতেই বসেছিল ওরা—কৃষ্ণ জগদীশ তপন গৌতম রঞ্জু ও গোরা।

অমূল্য টুলটুল ও শিবুকে দেখতে পাচ্ছি না কেন? ওরা কোথায় গেল?

কাছে আসতেই কৃষ্ণ আমার রুক্স্যাক্ খুলে নেয়। বলে—বসুন। জল খান।

সে মগ বের করে। শৈলেশ বলে—শুধু জল নয়, খানিকটা গ্লুকোজ মিশিয়ে দে।

জল খুবই ঠাণ্ডা। অল্প অল্প করে গলায় ঢালতে হ'ল। কিন্তু তাই খেয়েই যেন দেহে প্রাণ ফিরে এলো।

তপন বলে—এ জায়গাটার নাম এখেলা। সেদিন কিশ্‌তোয়ারে তহসিলদারসাব বলেছেন, কয়েক বছরের মধ্যেই এই পর্যন্ত বাস আসবে। এখানকার উচ্চতা ৫৫০০ ফুট।

তখন আর যাত্রীদের এই দুর্গম ৮ কিলোমিটার পথ হাঁটতে হবে না। হ্যাঁ, সকাল সাড়ে সাতটায় রওনা হয়ে এই সাড়ে চারঘণ্টায় আমরা মাত্র ৮ কিলোমিটার পথ পার হয়েছি। আজ আরও ৮ কিলোমিটার হাঁটতে হবে। আবহাওয়া ভাল থাকলে তেমন একটা অসুবিধে হবে না। কিন্তু তার আগে কিছু খাওয়া দরকার। শিবু বলেছে হট্-লাঞ্চ্ খাওয়াবে। কোথায় সে ?

গৌতম বলে—লীডারকে নিয়ে টুলটুল ও শিবু ওপরে চলে গেছে। একটু ওপরেই দোকান। সেখানেই খাবার পাওয়া যাবে।

বিশ্রামগৃহ থেকে মিনিট পাঁচেক চড়াই ভেঙে একফালি প্রশস্ততর পথে পৌঁছন গেল। সেখানেই পাহাড়ের পাশে পরপর তিনখানি চা ও খাবারের দোকান। অর্থাৎ রেস্তোরাঁ-কাম-হোটেল। পাইস-হোটেলও বলা যেতে পারে। তারই একটা দোকানের সামনে অমূল্য ও টুলটুল বসে রয়েছে। শিবু কোথায় ? সে নিশ্চয়ই হোটেলের ভেতরে হট্-লাঞ্চ্-এর তদারকি করছে। আচ্ছা, কি পাওয়া যাবে এখানে ? গরম গরম ডাল-ভাত ও সবজি তো বটেই। চাই কি 'ওমলেট' অথবা আলুভাজাও পাওয়া যেতে পারে। না পেলেও ক্ষতি নেই। পুলকিত পদক্ষেপে এগিয়ে চলি।

কিন্তু অমূল্য ও টুলটুল চা খাচ্ছে কেন ? বোধকরি শ্রান্তি দূর করতে। হিমালয়ে চা পানের কোন নির্দিষ্ট নিয়ম নেই। 'এ্যানি টাইম্ ইজ্ টী টাইম্'।

আমরা কাছে আসতেই অমূল্য বলে—টুলটুল, শঙ্কুদাদের চা দিতে বলো !

নেতার পাশে বসে বলি—এখুনি তো হট্-লাঞ্চ্ পাওয়া যাবে। আবার চা কেন ?

—লাঞ্চ্ পাওয়া যাবে না শঙ্কুদা ! নেতার কণ্ঠস্বরে হতাশা।

কেউ যেন আমাকে ধাক্কা দিয়ে খাদে ফেলে দিল। তলিয়ে যাবার প্রাক্কালে আপনা থেকেই ক্ষীণস্বরে প্রশ্নটা বেরিয়ে এলো মুখ থেকে—পাওয়া যাবে না ?

—না। অমূল্য উত্তর দেয়। বলে—আগে অর্ডার না দিলে এরা কেউ এতগুলো লোকের খাবার দিতে পারে না। আমরা চাইলে এখন অবশ্য রান্না করে দিতে পারে, কিন্তু অন্তত ছু-ঘণ্টা বসতে হবে। আমাদের পক্ষে খাবারের জন্য এখন এখানে ছু-ঘণ্টা বসে থাকা সম্ভব নয়।

সত্যই তাই। সবে অর্ধেক পথ এসেছি। এখানে ছু-ঘণ্টা দেরি করলে গন্তব্যস্থল সেওয়াবাতি পৌছতে রাত হয়ে যাবে। তাছাড়া আকাশের অবস্থাও ভাল নয়, যেকোন সময় বৃষ্টি নামতে পারে।

চায়ের অর্ডার দিয়ে টুলটুল ফিরে আসে।

জিজ্ঞেস করি—শিবু কোথায়?

—ছু কিলোমিটার দূরে আরেকটা হোটেল আছে। শিবু এগিয়ে গেছে খাবারের ব্যবস্থা করতে।

—ঘোড়াওয়ালারাও মালপত্র নিয়ে এগিয়ে গেছে। নইলে চিনি দিয়ে চিড়ে ও ছাতু খাওয়া যেতে পারত। গৌতম আপসোস করে।

—তোমরা ছু-ছুবার সমীক্ষায় এসেও খবরাখবর নিয়ে যাও নি। নেতার স্বরে তিরস্কার।

জগদীশ জবাবদিহি করে—তুমি বিশ্বেস করো লীডার, ছুবারই যাতায়াতের পথে আমরা এখানে গরম খাবার পেয়েছি।

—পেয়েছো তার কারণ তোমরা ছিলে পাচ-ছ' জন আর আজ আমরা আঠারোজন।

ওরা মাথা নাড়ে। অর্থাৎ নিজেদের ভুল স্বীকার করে নেয়।

চা আসে। শুধু চা। সেই 'হট্-টী' দিয়েই 'হট্-লাঞ্চ্' সমাধা করে রওনা দিতে হয়। এখন বেলা সাড়ে বারোটা।

এখেলার পরে খানিকটা জায়গা বেশ ছায়াশীতল। তাছাড়া আকাশের মেঘ যেন ক্রমেই ভারী হচ্ছে। কখন বৃষ্টি নামবে কে জানে? তাড়াতাড়ি পা চালাই।

এখন বেলা দেড়টা। এখানে পথের বাঁদিকে নদীর ধারে

একফালি জায়গা রয়েছে। সেখানে এক ভেড়াওয়ালা পরিবার অস্থায়ী ছাউনী ফেলেছে। বড় একটা পাথরের আড়ালে আগুন জ্বলছে। কয়েকটা পোটলা-পুটলি এখানে-ওখানে পড়ে আছে। দুটি ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে কি সব কাজকর্ম করছিল। আমাদের দেখতে পেয়েই তারা ছুটে উঠে আসে পথে। ছোট্ট দুটি হাত বাড়িয়ে কোমল কণ্ঠে বলে—সাব মিঠা দে !

মিঠা মানে লজেন্স। ওরা জানে আমরা পাহাড়ে বেড়াতে এসেছি। আমাদের কাছে লজেন্স আছে। কিন্তু আমার পকেটের লজেন্স ফুরিয়ে গেছে। অসহায় ভাবে রঞ্জুর দিকে তাকাই। সে পকেটে হাত ঢুকিয়ে বলে—আমার পকেটে যে মাত্র একটা রয়েছে। রুকস্যাকে আছে। কিন্তু আবার রুকস্যাক্ নামাবো !

—দেখি, আমার পকেটে আছে কিনা। জয় পকেটে হাত ঢোকায়। একটু বাদে বলে ওঠে—আছে। একটা নয়, দুটোই রয়েছে দেখছি।

জয় ছেলে-মেয়ের হাতে লজেন্স দুটি দিতেই তারা উল্লাসে ফেটে পড়ে। হাত নেড়ে মায়ের উদ্দেশে কি যেন বলতে থাকে।

মা সাড়া দেয়। কাজ ফেলে সে-ও দেখছি এদিকে আসছে। তারও কি 'মিঠা' চাই নাকি ? আমরা দাঁড়িয়ে থাকি।

সে আসে। দীর্ঘাঙ্গী যুবতী। ছেলে-মেয়ের মা। দুঃসহ শীত সয়ে আর কঠোর পরিশ্রম করে জীবনধারণ করতে হয়। গৃহহীনা নিরাশ্রয়। তবু যেমন সুশ্রী, তেমনি স্বাস্থ্যবতী। কিন্তু পোষাকটি বড়ই জীর্ণ। তাই সোজাসুজি তার দিকে তাকাতে লজ্জা লাগছে। দুঃখও হচ্ছে।

সে কিন্তু মোটেই লজ্জাবতী নয়। ওর কোন দুঃখ আছে বলেও মনে হয় না। হাসি-খুশি মেয়েটি সেলাম জানায় আমাদের। তারপরে ভাঙা ভাঙা হিন্দীতে বলে—আপনাদের নিশ্চয়ই তেষ্টা পেয়েছে। আমার কাছে খানিকটা মাঠা (ঘোল) আছে কিন্তু শক্কর (চিনি) নেই। খেতে পারলে দিতে পারি।

মাঠা মানে মাখন তুলে নেওয়া দুধ। ঠাণ্ডা জায়গা বলে নষ্ট হয় না। খেতেও নাকি খুবই ভাল। আমরা তৃষ্ণার্তও বটে। কিন্তু এই দরিদ্র পরিবারের খাবারে ভাগ বসানো ঠিক নয়। তাই বলি—সামনে খাবারের ব্যবস্থা হয়েছে। এখন আমরা আর কিছু খাব না।

সে-ও জোর করে না, হয়ত বা সাহস পায় না। কেবল জিজ্ঞেস করে—আপনারা কোথায় যাচ্ছেন ?

উত্তর শুনে আবার বলে—আমরাও ব্রহ্মাজীর কাছেই গিয়েছিলাম। শীত আসছে বলে নেমে যাচ্ছি। আপনারাও দেরি করবেন না। ব্রহ্মাজীর পুজো হয়ে গেলেই তাড়াতাড়ি নেমে আসবেন।

কি বলব ? বিচিত্র এই দেশ। এ দেশের যাযাবর মানুষদের বুকেও কত মমতা।

সে আবার বলে—সামনে আমার বড় ছেলে ও তার বাবার সঙ্গে দেখা হবে। ওরা ভেড়া চড়াতে গিয়েছে।

মেয়েটি ও তার ছেলে-মেয়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এগিয়ে চলি। চলতে চলতে কিন্তু ওদের কথাই ভাবতে থাকি। এ অঞ্চলে এই ছিন্নমূল কষ্টসহিষ্ণু মানুষগুলোকে বলা হয় গুর্জর, আর হিমাচলে গদ্দি। এঁরাই অমরনাথ ও মণিমহেশ আবিষ্কার করেছেন। *

বৈচিত্র্যময় ভারতের এক বিচিত্র জাতি এই গুর্জর। এঁদের ইতিহাস ও সমাজ নিয়ে গবেষণার বিশেষ সুযোগ রয়েছে। জনৈক ইংরেজ ঐতিহাসিক বলেছেন, এঁদের পূর্বপুরুষগণ মধ্য-এশিয়ার বিজয়ী দলগুলির অন্যতম। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে তাঁরা বহুদলে বিভক্ত হয়ে ভারতে আগমন করেন। তাঁদের কতগুলি দল ভারতীয়দের সঙ্গে মিলে মিশে এক হয়ে গিয়েছেন। কর্মক্ষমতা কষ্টসহিষ্ণুতা সাহস ও বীরত্বের বিনিময়ে তাঁরা এবং তাঁদের উত্তরপুরুষগণ ভারতের রাজনীতিতে উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করেছে। অর্থাৎ আপন শক্তিতে

* লেখকের 'হিমতীর্থ হিমাচল' দ্রষ্টব্য।

উত্তর ও মধ্য ভারতের অধিকাংশ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মিশ্রিত এই জাতিই পরবর্তীকালে রাজপুত রূপে পরিচিত। **

ইংরেজ ঐতিহাসিকের ধারণা, যেসব জাতির সংমিশ্রণে রাজপুতজাতির অভ্যুত্থান, তাঁদের মধ্যে গুর্জরগণই নাকি সবচেয়ে শক্তিশালী ছিলেন।

কিন্তু গুর্জরদের সব শাখাই ভারতের আর্যদের সঙ্গে মিশে যান নি। কয়েকটি শাখা অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে নিজেদের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছেন। আর তাই তাঁরা আজও যাযাবর বৃত্তি অবলম্বন করে চলেছেন। তাঁরাই আজকের গুর্জর।

সমতলে স্থায়ী না হওয়ায় স্বাভাবিক ভাবে এঁরা হিমালয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। এঁরা এখন কতকগুলি ছোট-ছোট দলে বিভক্ত। পশুপালনই এঁদের প্রধান জীবিকা। এঁরা আজও চাষাবাদ করতে শেখেন নি এবং এঁদের মধ্যে এখনও লেখা-পড়ার প্রচলন হয় নি। এঁরা ভেড়া-ছাগল গরু-ঘোড়া ও কুকুর নিয়ে হিমালয়ের দুর্গম উপত্যকা আর গ্রাবরেখায় ঘুরে বেড়ান। গ্রীষ্মকালে গুর্জররা পশুচারণের জন্য হিমালয়ের স্থায়ী তুষাররেখা অর্থাৎ তৃণভূমির প্রান্তসীমা পর্যন্ত চলে যান, আবার শীতের তুষারপাত শুরু হবার আগেই নিচে নেমে আসেন।

এঁদের জীবিকা বৈচিত্র্যময় ও রোমাঞ্চকর। অথচ এঁরা বড়ই দরিদ্র। বিজ্ঞানের কোন অবদানের এঁরা অংশীদার নন। বিংশ শতাব্দীর মানুষ হয়েও এঁরা মধ্যযুগে রয়ে গিয়েছেন। এটি যেকোন দেশের পক্ষে চরম অগৌরবের।

—একি পথ কোথায়?

শৈলেশের কথায় আমার ভাবনা থেমে যায়। তাড়াতাড়ি সামনে তাকাই। সত্যই সামনে আর পথ নেই। ধস নেমে পথ

** 'With a pen and Rifle in Kishtwar' by Otto Rothfeld, F. R. G. S., I. C. S., 1918

নিশ্চিহ্ন। এখন কোনদিকে যেতে হবে ? শৈলেশ জয় ও রঞ্জু রয়েছে আমার সঙ্গে। আমরা কেউ পর্বতারোহী নই। টুলটুলকে নিয়ে ঘোড়াওয়ালার সঙ্গে অমূল্য এগিয়ে গেছে। তবে গৌতমরা পেছনে রয়েছে। ওদের জন্য অপেক্ষা করতে হবে কি ?

শৈলেশ বলে—পথ বুঝতে না পারলে অপেক্ষা করতে হবে বৈকি! কিন্তু তার আগে জায়গাটা একবার দেখে নেওয়া দরকার।

আমরা মাথা নেড়ে সমর্থন করি ওকে। শৈলেশের মতো রঞ্জু এবং জয়ও পিঠ থেকে রুকস্যাক্ খুলে রাখে। জয় বলে—আপনি একটু এখানে বসুন শঙ্কুদা! আমরা দেখছি পথের হদিশ পাওয়া যায় কিনা ?

আমি তার পরামর্শ মেনে নিই। বলি—সাবধানে পা ফেলে এগিও, একেবারে ধারে যেও না।

পথের হদিশ পেতে দেরি হয় না। শুধু তাই নয়, ওরা জানায়—লীডার টুলটুল ও ঘোড়াওয়ালা নিচে দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের সাবধানে নামতে বলছে।

এই না হলে অমূল্য। ভাঙা পা নিয়েও নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে সর্বদা সচেতন।

তাড়াতাড়ি উঠে দাড়াই। এগিয়ে আসি ধসের ওপ রে। অমূল্য দেখতে পায় আমাকে। চিৎকার করে বলে—শঙ্কুদা, তুমি ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকো। আগে ওদের নামতে দাও। তারপরে ঘোড়াওয়ালা যাচ্ছে। সে তোমাকে নিচে নিয়ে আসছে।

নেতার নির্দেশ। অতএব তাই করতে হয় আমাকে। ঘোড়াওয়ালার হাত ধরে নেমে আসি পথে। একটু হাসে অমূল্য। স্বস্তির হাসি বলে—জায়গাটা দেখেই মনে হল, তোমার অসুবিধে হবে। তাই ঘোড়াওয়ালাকে নিয়ে বসে রইলাম।

—কতক্ষণ বসে আছিস ?

—তা প্রায় আধঘণ্টা হবে।

কি বলব ? নিজের পায়ের এই অবস্থা। পা ফেলতে কষ্ট হচ্ছে।

অথচ আমাদের জন্য এখানে আধঘণ্টা বসে আছে। নিঃশব্দে এগিয়ে চলি।

যারা সামনে কিংবা পেছনে রয়েছে, তাদের কথা বলতে পারছি না, কিন্তু আমাদের চারজনেরই খুব খিদে পেয়েছে। আশ্চর্য পথ, একটা চায়ের দোকান পর্যন্ত নেই।

না, আছে। সামনে একটা বেশ বড় বাড়ি দেখা যাচ্ছে। ওখানে হয়তো কোন দোকান থাকতে পারে। তাড়াতাড়ি পা চালাই, ক্ষেতের পাশ দিয়ে পথ। ক্ষেতে প্রচুর ভুট্টা, কুমড়ো ও শাক ফলে আছে।

ক্ষেত পার হয়ে বাড়িটার সামনে আসি। না, শুধুই বাড়ি, কোন দোকান নেই।

বড্ড ক্লান্ত লাগছে। দেহের দোষ কি? অভুক্ত থেকে কি এমন দুর্গম পথ পারি দেওয়া যায়? খাবার না পাই, একটু বিশ্রাম করে নেওয়া যাক।

কাউকে কিছু না বলে পথের ওপরেই বসে পড়ি। আমার দেখা-দেখি ওরাও বসে।

বাড়িটায় দোকান নেই কিন্তু মানুষ আছে। তারাই দাঁড়িয়ে আছে দোতলার বারান্দায় —দুটি কিশোর-কিশোরী ও একটি যুবতী। এবং আমাদের বসতে দেখেই কিশোর ও কিশোরী নেমে আসে পথে, আমাদের কাছে।

কাছে এসে কিশোরী জিজ্ঞেস করে—তোমরা কোথা থেকে আসছ, কোথায় চলেছো?

রঞ্জু উত্তর দেয়। শুনে কিশোর জিজ্ঞেস করে—ব্রহ্মাজীর কাছে চলেছো কেন, তাঁর পুজো দেবে বুঝি?

—হ্যাঁ।

—তোমাদের কাছে মিঠা আছে?

—আছে। এই যে নেও। বলতে বলতে রঞ্জু রুকস্যাক্ থেকে লজেন্স বের করে ছেলে-মেয়ে দুটিকে দেয়।

লজেন্স মুখে পুড়ে মেয়েটি হাসিমুখে জিজ্ঞেস করে—তোমাদের কাছে কি আর মিঠা আছে ?

—কেন বলো তো ? শৈলেশ জিজ্ঞেস করে।

না, সে মোটেই লজ্জা পায় না। বরং সহজ স্বরে বলে—থাকলে, দিদির জন্য একটা নিয়ে যেতাম। বলতে বলতে সে দোতলার দিকে দেখায়। তাকিয়ে দেখি যুবতীটি এখনও সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

রঞ্জু আরেকটা লজেন্স বের করে তার হাতে দিতেই কিশোর-কিশোরী ছুটে পালাতে চায়। আমি বাধা দিই। বলি—এ ক্ষেতগুলো কি তোমাদের ?

—হ্যাঁ। আমাদের বাবার।

—তিনি বাড়ি আছেন ?

—না। কাল কিশ্‌তোয়ার গিয়েছেন। কিন্তু কেন ব'লো তো ?

—থাকলে, তাঁর কাছ থেকে কয়েকটা ভুট্টা কিনতাম। আমাদের বড্ড খিদে পেয়েছে।

—খিদে পেয়েছে !

—হ্যাঁ। সকালে ঠিকমতো খাওয়া হয় নি।

—তা, আগে বলবে তো ! কিশোরী রীতিমত ধমক লাগায়। বলে—তোমরা একটু বসো। আমরা দিদিকে জিজ্ঞেস করে আসি।

—হ্যাঁ যাও, ব'লো আমরা দাম দেব।

কিশোর বলে—আমাদের তো মা নেই। তাই দিদি বললেই তোমাদের ভুট্টা দিয়ে দেব।

বুকটা কেঁপে ওঠে। এই প্রাণচঞ্চল কিশোর-কিশোরী মাতৃহীনা। ভগবানের কি বিচার বুঝতে পারি না।

ওরা ছুটে যায় বাড়িতে। আমরা বসে থাকি। মনে হচ্ছে যেন 'ইণ্টারভিউ' দিতে এসেছি। ম্যানেজারের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় বসে আছি।

ভাই-বোন দোতলায় পৌঁছে গিয়েছে। দিদিও দাঁড়িয়েছিল ওখানে। কতই বা বয়স। ওদের থেকে কিছু বড়। তাকে লজেন্সটা

দিয়েছে। ভালই করেছে। লজেন্স খেতে খেতে সে ওদের কথা শুনছে। তার সিদ্ধান্তের ওপর আমাদের ভুট্টা পাওয়া না-পাওয়া নির্ভর করছে।

ওরা তিনজনেই নেমে আসছে নিচে। তাহলে কি দিদি আমাদের আবেদন মঞ্জুর করেছে ?

বোধকরি তাই। নইলে সে কেন বোনকে নিয়ে ভুট্টাক্ষেতে ঢুকছে! ভাই ছুটতে ছুটতে আমাদের কাছে আসে। হাঁফাতে হাঁফাতে বলে—তোমরা একটু বসো। দিদি বলেছে, তোমাদের ভুট্টা দেবে।

মনে মনে ভগবানকে ধন্যবাদ দিই। তারপরেই আবার ওদের কথা মনে পড়ে। ভগবানকে বলি—ঠাকুর, তোমার যদি এতই করুণা, তাহলে এদের প্রতি তুমি এমন অকরুণ হলে কেমন করে ? এই ফুলের মতো নিষ্পাপ ও সুন্দর ছেলে-মেয়েদের মাকে তুমি অকালে অপহরণ করলে কেন ?

একটি নয়, দুটি করে ভুট্টা পাওয়া গেল। এখনও ঠিকমতো পাকে নি, কাচা রয়েছে। তাহলেও খেতে ভারী মিঠে।

শৈলেশ বাংলায় বলে—কত দেওয়া উচিত ?

আমি বলি—ওঁদের দিদিকে জিজ্ঞেস করো।

—না। জয় আপত্তি করে। সে বলে—আমি পাঁচটা টাকা দিয়ে দিচ্ছি।

সে তাই করে। পকেট থেকে একখানি পাঁচটাকার নোট বের করে সে কিশোরীর হাতে দিয়ে দেয়। কিশোরী দিদির দিকে তাকায়।

—ওয়াপস দে দে! এই প্রথম সে কথা বলল।

আমরা তার দিকে তাকাই। সে অপেক্ষাকৃত কোমল কণ্ঠে বলে—বাবুজি, আমরা গাঁয়ের গরীব মানুষ। আমাদের কিই বা আছে ? আপনারা পরদেশী পথিক, আপনাদের ভুখ লেগেছে, তাই ক'টা ভুট্টা খেতে দিয়েছি। তার জন্য রূপেয়া দিচ্ছেন কেন ?

এ প্রশ্নের উত্তর হয় না। কারণ এই আতিথেয়তা, এই প্রীতি, এতো টাকা দিয়ে কেনা যায় না। অতএব চুপ করে থাকি। জয় কেবল নীরবে হাত পেতে নোটখানি ফেরত নেয়।

দিদি খুশি হয়। আমাদেরও মান বাঁচে, ধন্যবাদ দিয়ে বিদায় নিতে চাই। পারি না। দিদি আবার বলে—আমাদের ক্ষেতে অনেক কুমড়ো ফলেছে, আপনারা নিয়ে যাবেন নাকি গোটা দুয়েক? রান্না করে সবাই মিলে সবজি খাবেন।

—পেলে তো ভালই হয়। শৈলেশ বলে।

—তাহলে একটু দাঁড়ান, আমি নিয়ে আসছি। বলেই বোনকে নিয়ে সে ক্ষেতে ঢুকে যায়।

ভাইয়ের হাত ধরে দাঁড়িয়ে থাকি। একটু বাদে ছোটো দুটি মিষ্টি কুমড়ো নিয়ে ওরা ফিরে আসে। জয় কুমড়োদুটি তার রুক্স্যাকে ভরে নেয়।

তারপরে ওদের ধন্যবাদ দিয়ে এগিয়ে চলি।

দিদি বলে—ফেরার পথে সবাইকে নিয়ে আসবেন! বাবা থাকবেন, চা খেয়ে যাবেন।

আমরা ভুট্টা খেতে খেতে মাথা নাড়ি। এগিয়ে চলি। চলতে চলতে ভাবি—এমন সহজ সরল ও মধুর আতিথেয়তা কি সমতলে পাওয়া যায়? বোধকরি না। কিন্তু কেন? এদের জীবনেও তো সমস্যা কিছু কম নয়। তবু এরা এমন সরল আর উদার রয়েছে কেমন করে? একি হিমালয়ের প্রভাব? হবে হয়তো।

ভুট্টাগুলি ভারী মিষ্টি। ঠিক যেন এই ছেলে-মেয়েদেরই মতো। মনে মনে বার বার ওদের আশীর্বাদ করি। জীবনদেবতাকে বলি—ওদের জীবনও এই ভুট্টার মতই মিষ্টি হোক্। ওরা যেন এমনি মন নিয়েই জীবন কাটাতে পারে।

এখন বেলা তিনটে। যা আশঙ্কা করেছিলাম, তাই হোল। বৃষ্টি নামল। কোথাও দাঁড়াবার জায়গা নেই। জয় শৈলেশ ও রঞ্জুর 'হুড' দেওয়া 'উইণ্ড চীটার' গায়ে রয়েছে। ওরা মাথা ঢেকে নেয়।

আমি রুকস্যাক্ থেকে 'ওয়াটার প্রুফ' নামিয়ে নিই।

ওয়াটার প্রুফ গায়ে দিয়ে পথ চলা অসুবিধে। তবু চলতে হয়। উপায় কি?

বৃষ্টি অবশ্য বেশিক্ষণ হল না। আকাশ যতই মেঘলা হোক্, কিছুক্ষণ বাদে বৃষ্টি থেমে গেল। ভালই হল। হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। জোর কদমে এগিয়ে চলি।

বেলা সাড়ে তিনটের সময় স্বর্গ হাতে পাই। দেখতে পাই সবাইকে। পথের পাশে একখানি বড় পাথরের নিচে দাঁড়িয়ে ওরা মগে করে কি যেন খাচ্ছে। শিবু পরিবেশন করছে। ঘোড়াগুলিও পথের পাশে গাছপালা চিবুচ্ছে। মালপত্র সব নামানো হয়েছে। তাহলে কি দোকানে খাবার না পেয়ে শিবু রান্না করে ফেলেছে?

কাছে আসতেই জগদীশ বলে—মগ বের করুন।

—খিচুরি রেঁধেছিস নাকি?

—না। আমাদের অদৃষ্ট মন্দ। রবিবার বলে আজ পথের দোকানটাও বন্ধ। তাই তো এতটা ছুটে এসে একটু আগে ঘোড়াওয়ালাদের ধরতে পেরেছি। রান্না করার সময় কোথায়? শিবু বলে।

গোরা বলে—জল ও চিনি দিয়ে চিড়ে ও ছাতু মাখা হয়েছে, খানিকটা খেয়ে নিন।

হায় হরি! কোথায় হট্-লাঞ্চ্ আর কোথায় ঠাণ্ডাজলে চিড়ে ও ছাতুমাখা!

কিন্তু পেটের তাগিদে তাই গলাধঃকরণ করতে হল। তারপরে আবার শুরু করি পথচলা।

নেতা ও সহনেতা ছাড়া পর্বতারোহী সদস্যরা সবাই এগিয়ে গিয়েছে। গোরা ওদের সঙ্গে গেছে। ওরা রাতের আশ্রয় ঠিক করে রাখবে।

অমূল্য পেছনে আসছে। টুলটুল ওর সঙ্গে আছে। গৌতম রয়েছে আমাদের সঙ্গে।

চলতে চলতে ত্নজন গুর্জরের সঙ্গে দেখা হয়। ত্নজনেরই বলিষ্ঠ চেহারা, মুখে চাপ দাঁড়ি ও মাথায় পাগড়ি। হিন্দী বলতে পারে। চিনি ও কেরসিন আনতে এখেলায় গিয়েছিল। কথায় কথায় বলে—আমরা পাঁচ ভাই। সবাই সাদি করেছি। একসঙ্গে থাকি। ছেলে-মেয়ে মিলে আমরা একচল্লিশ জন। আমাদের প্রায় হাজার খানেক ভেড়া-ছাগল, আঠারটা গরু-বাছুর, পাঁচটা ঘোড়া ও চারটে কুকুর আছে।

—ঘোড়া দিয়ে কি করেন? রঞ্জু জিজ্ঞেস করে।

বড়ভাই উত্তর দেয়—আমাদের মালপত্র অনেক। যেমন তাঁবু, জামাকাপড়, খাবার-দাবার। ঘোড়া সেসব বয়ে নিয়ে যায়। তাছাড়া বাচ্চা বুড়ো ও অসুস্থদের আমরা ঘোড়ার পিঠে বসিয়ে দেই।

কথায় কথায় আরও অনেক কথা বলে ওরা—আমরা মে মাসে জম্মু থেকে পাহাড়ে রওনা হই। আপনারা যেখানে যাচ্ছেন, আমরাও সেই সোনামার্গী অঞ্চলে গ্রীষ্মকাল কাটাই। এখন নিচে নেমে যাচ্ছি। ত্নধ-ঘোল, ঘি-মাখন ও পশম বিক্রি করেই আমরা বেঁচে আছি।

হাঁটতে হাঁটতে ওদের শিবিরে এসে পেঁছিই। পথের পাশে একটি নাতিপ্রশস্ত প্রায় সমতল প্রান্তরে তাঁবু ফেলেছে ওরা। আমাদের দেখে সবাই কাজ ফেলে ছুটে আসে। ছোটরা মিঠা চায়, বড়রা ওষুধ। অতএব রঞ্জু বিপদে পড়ে। মিঠা অর্থাৎ লজেন্সের ব্যাপারে আমরা ওর শরিক হই। রুক্স্যাক্ কুড়িয়ে যা পাওয়া যায়, তাই পরিবেশন করি। কিন্তু ওষুধের ব্যাপারে আমরা ওকে কোন সাহায্যই করতে পারি না।

কোন সাহায্যের প্রয়োজনও হয় না রঞ্জুর। সে রোগী দেখতে শুরু করে দেয়। নানা রোগের রোগী। কারও চোখের অসুখ, কারও বুকের অসুখ, কারও বা গলার। কারও শ্বাসকষ্ট, কারও দাঁত ব্যথা, কারও বা ঘা হয়েছে। একটি যুবতী একটা হাড়সর্বস্ব শিশুকে কোলে নিয়ে রঞ্জুর সামনে এসে দাঁড়ায়। সে তাকে পরীক্ষা করতে

লেগে যায়। জনৈকা বৃদ্ধা বলেন—ডগ্‌দারসাব, বাচ্চাটাকে একটু ভাল দাওয়াই দিয়ে দিন।

পরীক্ষা শেষে রঞ্জু বলে—এর ওষুধ আমার কাছে নেই। এর 'জণ্ডিস' (কামলা) হয়েছে। তাড়াতাড়ি একে কিশ্‌তোয়ার নিয়ে যান। হাসপাতালে ভর্তি করে দিন। দেরি হলে বাঁচাতে পারবেন না।

ওরা রঞ্জুর কথা শোনে, কিন্তু বলে না কিছুই। মুমূর্ষু মেয়েটির জন্য কারও তেমন আকুলতা চোখে পড়ে না আমার।

একটু বাদে আমরা বিদায় নিই গুর্জর পরিবারের কাছ থেকে। সেই রোগা মেয়েটা ছাড়া আর সবাইকে ওষুধ দিয়েছে রঞ্জু। তাই তার কথাই আমার মনে পড়ে বার বার।

ভাবি মেয়েটাকে কি কেউ কিশ্‌তোয়ার নিয়ে যাবে না ?

বোধকরি না। কারণ গুর্জররা আজও পরিবার পরিকল্পনার প্রতি শ্রদ্ধাশীল নন। এদের সন্তানসংখ্যা বড়ই বেশি। অতএব দু-একটা মরে গেলে কি এসে যায় ?

বিকেল সাড়ে ছ'টার সময় আমরা সেওয়াবাতি এলাম। আশ্চর্য ! উচ্চতা এখেলার সমান—৫৫০০ ফুট। তার মানে সারাবিকেল চড়াই ভাঙা বৃথা হল।

সেওয়াবাতি ছোট গ্রাম। পথের পাশে দুটি চা ও খাবারের দোকান, আর নিচে পাহাড়ের ঢালে কয়েকটি ঘর নিয়ে গ্রাম। শুনেছি দোকানে দু-চারজন যাত্রীর রাত্রিবাসের ব্যবস্থা আছে। যাত্রীরা যাতায়াতের পথে সাধারণত সামান্য ভাড়ার বিনিময়ে দোকানেই রাত কাটায়। আমরা সংখ্যায় অনেক, সে সুযোগ নেই। আমাদের আজ তাঁবু ফেলতে হবে।

দোকানের সামনে আসতেই শিবু বেরিয়ে আসে। এখন আর ওর লজ্জার কিছু নেই। কারণ 'হট্-লাঞ্চ্' না পেলেও হট্-ডিনার আমরা পাব।

শিবু আমার পিঠ থেকে রুক্‌স্যাক্ খুলে নিয়ে বলে—দোকানের বারান্দায় উঠে বসুন। চা বিস্কুট খেয়ে ঘরে চলে যান।

—ঘর ! আজও কি আমরা ঘরে থাকতে পারব ?

—হ্যাঁ। জগদীশ উত্তর দেয়। বলে—কালকের চেয়ে ভাল ঘরে।

—কোথায় ?

—স্কুলে। গৌতম ইসারা করে ঘরখানি দেখায়।

সত্যই তাই। পথ থেকে সামান্য নিচে, বেশ বড় একখানি ঘর। টিনের চাল ও কাঠের মেঝে, একপাশে প্রশস্ত খোলা বারান্দা।

খুশি হবার মতো ব্যাপারই বটে। জিজ্ঞেস করি—কত ভাড়া লাগবে ?

—কিছু না। কেবল এই দোকান থেকে চা-বিস্কুট খেতে হবে আর কাল সকাল ন'টার আগে ঘর ছেড়ে দিতে হবে, স্কুল বসবে। শিবু উত্তর দেয়।

এর চেয়ে ভাল ব্যবস্থা আর কি হতে পারে ? অতএব খুশি হয়ে মাষ্টারসাবের চায়েব দোকানে উঠে আসি।

মাষ্টারসাবকে চা বানাতে বলে বাইরে তাকাই। এখনও সন্ধ্যে হতে কিছু দেরি আছে। ভালই হল দিনের আলোতেই দিনের পথচলা শেষ হোল। প্রথম দিনের পদযাত্রায় এগারো ঘণ্টা ধরে দুর্গম পথ পাড়ি দিলাম। হোক্‌গে, এখন তো বিশ্রাম। শুধু তাই নয় আজও ঘরে রাত্রিবাস করতে পারব।

সুখের ভাবনা শেষ হবার আগেই মাষ্টারসাব গরম চায়ের গ্লাশটা এগিয়ে ধরেন। আমি সকৃতজ্ঞ চিত্তে গ্রহণ করি।

॥ পাঁচ ॥

আজ আরেকটু ঘুমিয়ে নেওয়া যেত। আজ মাত্র ৮ কিলোমিটার হাঁটতে হবে। পথও নাকি কালকের চেয়ে ভাল। অমূল্য বলেছে, আটটায় রওনা হবে।

তবু ঘুম ভেঙে গেল। ঘড়ি দেখি—ছটা বাজতে দশ। স্লীপিং-ব্যাগের জীপ খুলে উঠে বসি। সকালে ঘুম ভেঙে গেলে আমি আর শুয়ে থাকতে পারি না।

ছ'খানি ঘর আর তার লাগোয়া বেশ চওড়া বারান্দা নিয়ে সেওয়াবাতি গ্রামের এই প্রাইমারী স্কুল। মাষ্টারসাব সামনের ঘর ও বারান্দাটি আমাদের ছেড়ে দিয়েছেন। সাধারণতঃ বড় দল হলে তিনি নাকি তাঁদের এখানে আশ্রয় দান করে থাকেন। ত্ব-চারজনের দল হলে দোকানেই থাকতে পারেন।

ঘরখানি আকারে মাঝারী। কাঠের মেঝে। এককোণে একটা ফায়ারপ্লেস। আমাদের অবশ্য আগুন জ্বালাবার দরকার হয় নি। কারণ হিমালয়ের গহন-গিরি-কন্দরে অবস্থিত হলেও সেওয়াবাতির উচ্চতা মাত্র ৫৫০০ ফুট এবং এখনো শীত পড়ে নি।

ঘরে কোনমতে বারোখানি স্লীপিং-ব্যাগ পাতা গিয়েছে। তাই একঘরে সবাই শুতে পেরেছি। শীত কম। স্লীপিং-ব্যাগ তোষক ও লেপ ত্বয়েরই কাজ করেছে। ম্যাট্রেস পাতার দরকার হয় নি।

বারান্দাটি বেশ বড়। তিনদিক খোলা। তাতে কোন ক্ষতি হয় নি। একপাশে মালপত্র রেখে আরেকপাশে রান্না-খাওয়া হয়েছে। খাবার পরে সেখানেই শেরপা ও মালবাহকরা শুয়ে পড়েছে।

স্কুল-বাড়িটির অবস্থানও ভারী সুন্দর। ওপরে পথ, নিচে নদী। পথ মানে সোন্দারের পথ আর নদী মানে চেনাব। দিনের আলো নিবে আসতেই পথ ঘুমিয়ে পড়েছে, কিন্তু চেনাব রয়েছে

জেগে। সে যে অনন্তকালের ক্লান্তিহীন গায়ক। তার কলগান শুনতে শুনতে কালরাতে ঘুমিয়ে পড়েছি। আজ সকালে সেই সামগ্যান শুনেই ঘুম ভেঙেছে আমার।

কিন্তু থাকগে, এসব ভাবনা আর নয়। ঘুম যখন ভেঙে গেল, তখন রসিদ ব্রাদার্সকে ডেকে তুলে চায়ের ব্যবস্থা করা যাক। গরম চায়ের মগ মুখের সামনে এগিয়ে না ধরলে বাবুরা স্লীপিং-ব্যাগের মায়া ছাড়বেন না। গতকাল সকালেও শ্যামা চা এনে সবার ঘুম ভাঙ্গিয়েছে।

দু-বার ডাক দিতেই দু-ভাই উঠে বসে। বলি—মুখ-হাত ধুয়ে চায়েব জল চাপিয়ে দাও। সাবলোগদের চা পিয়াও।

ওরা মাথা নেড়ে বাইরে বেরিয়ে যায়। আমিও বরং প্রাতঃকৃত্য সেরে আসি। রসিদ ব্রাদার্স স্টোভ জ্বালাতে জানে। শুধু তাই নয়, কাল সন্ধ্যায় বড়-রসিদ পেট্রোম্যাক্স জ্বালিয়েছে। তাদের বাড়িতেও নাকি 'গ্যাসবাত্তি' আছে। এরা পেট্রোম্যাক্স-কে গ্যাসবাতি বলে।

হিমালয়ে মল-মূত্র ত্যাগ কবার একটা অলিখিত নিয়ম আছে। এখানে তো জমাদার নেই। সুতরাং জনপদটি যাতে অপরিষ্কার না হয়ে যায়, নদীর জল যাতে দূষিত না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখা দরকার।

প্রথমে তাই পাথর ডিঙ্গিয়ে নেমে আসি নদীর তীরে। তারপরে আবার পাথরের পর পাথর পার হয়ে নিচের দিকে নেমে চলি। চলতে চলতে নদীকে দেখি। চলা বন্ধ হয়ে যায়, চোখ ফেরাতে পারি না।

সংসারে সচলের সঙ্গে সুন্দরেব সম্পর্ক সুমধুর নয়। সাধারণতঃ যারা অচল অচঞ্চল ও স্থির, তারাই অনন্ত সৌন্দর্যের আধার। হিমালয় অচল, তাজমহল অচঞ্চল, ফুলদল স্থির। কিন্তু নদী এই নিয়মের ব্যতিক্রম। চেনাবও সচল, শুধু সচল নয় অতিশয় বেগবতী, সে দুর্বার। তবু সে সুন্দর, অনিন্দ্যসুন্দর। আমি এই সীমাহীন সৌন্দর্যের সামনে দাঁড়িয়ে প্রাকৃতিক প্রয়োজন পর্যন্ত বিস্মৃত হয়ে গেছি।

তাও তো সবে সকাল। এখনও সোনালী রোদ এসে আছাড়

খেয়ে পড়ে নি চেনাবের বুকে, ওপারের রঙ্গীন পাথরে আর এপারের রঙ্গীন ক্ষেতে। তখন যে সে আরও রমণীয় হয়ে উঠবে।

আস্তানায় ফিরে এসে দেখি রসিদ ব্রাদার্স চা বানিয়ে ফেলেছে। শুধু তাই নয়, আমার জন্য আধমগ লিকার রেখে দিয়ে তারপরে চায়ে দুধ মিশিয়েছে। গতকাল ওরা লক্ষ্য করেছে, আমি চায়ে দুধ খাই না।

নেতার নির্দেশ ছিল সকাল আটটায় 'মার্চ' করতে হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সাড়ে আটটা বেজে গেল। নেতার সঙ্গে উঠে এলাম পথে। শেরপা ও মালবাহকরা এগিয়ে গেল। আমরা বিদায় নিলাম মাষ্টারসাব ও উপস্থিত গ্রামবাসীদের কাছ থেকে। আশ্চর্যের ব্যাপার মাষ্টারসাব চা-বিস্কুটের দাম নিলেন না। বললেন—ফেরার সময় চা খেয়ে একসঙ্গে দিয়ে যাবেন

কি বিস্ময়কর বিশ্বাস! তাই এরা এত সুখী। সংসারে সুখ-শান্তি সচ্ছলতার ওপর নির্ভরশীল নয়।

শিবু তপন জগদীশ ও গৌতম 'রওনা হতে পারল না। ওরা ঘোড়ার পিঠে মালপত্র তুলে দিয়ে তারপরে রওনা হবে। মালপত্রের তদারকি পদযাত্রায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এবং এ কাজটি সর্বদা নিজেদের করতে হয়। তাও তো এবারে আমরা মালপত্র খুবই কম এনেছি। আগামীকাল থেকে এই হাঙ্গামা আরও বাড়বে। সোন্দারের পরে আর ঘোড়া যাবার পথ নেই। তাই ঘোড়ার পরিবর্তে মালবাহক নিতে হবে। ছ'টি ঘোড়ার বদলে অন্তত পনেরজন মানুষ। তাদের সবাইকে সমান ওজনের মাল দিতে হবে। কাজটি সহজ নয়। তাছাড়া ঘোড়ার 'শির দরদ' হয় না, 'বুক ধড়ফড়' করে না, এবং সে মানুষের চেয়ে বেশি কথা শোনে।

যাক্ গে আগামীকালের কথা, এবারে আজকের কথা হোক। সামনের পথটিকে দেখা যাক্। দোকানদুটি পথের পাশে গ্রামের সীমারেখা। আর গ্রাম ছাড়িয়েই ছায়াপথ। এখন অবশ্য ছায়া না হলেও চলত। কারণ সবে রোদ উঠেছে।

পথের এই গাছে ছাওয়া অংশটি কিন্তু ভারী ভাল লাগছে। ডানদিকের পাহাড়ে ও পথের পাশে বড় বড় গাছ। গাছগুলি যেন পথের ওপর চন্দ্রাতপ বিছিয়ে দিয়েছে, প্রাকৃতিক চন্দ্রাতপ। পথের এই অংশটুকু মোটামুটি সমতল ও সোজা। আমরা প্রায় নদীর বেলা-ভূমিতে নেমে এসেছি। নদীর তীরে তীরে পথ চলেছি, আর দেখছি। দেখছি ঐ পাহাড় এই নদী আর বনপথ। মনে হচ্ছে এ বুঝি বা মাটির পৃথিবী নয়, স্বপ্নমধুর স্বর্গভূমি।

কৃষ্ণ বলে—আজ তো মাত্র ৮ কিলোমিটার হাঁটতে হবে। তাড়া-হুড়া করার কোন দরকার নেই। আসুন না একটু বসা যাক এখানে।

—কিন্তু লীডার যে টুলটুলকে নিয়ে এগিয়ে গেল! জয় আপত্তি করে।

শৈলেশ বলে—যাক্ না, লীডারের পায়ে ব্যথা। আমরা ওকে ধরে ফেলব। তাছাড়া লীডারের সঙ্গে টুলটুল রয়েছে। জায়গাটি সত্যি ভারী সুন্দর। আসুন, একটু বসা যাক।

গোরা আর রঞ্জুও সমর্থন করে তাকে। অতএব একটা গাছের গোড়ায় বসে পড়ি। ওরাও বসে।

বসে বসে দেখি আর দেখি। প্রাণময় প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে আমার হৃদয় এক অনির্বচনীয় আনন্দে বিহ্বল হয়ে ওঠে। ভাবি তাঁদের কথা, যাঁরা আমাদের এই আনন্দের অংশীদার হয়েছে।

তাঁদের কথা ভাবতে ভাবতেই এগিয়ে চলি। সেকালে সাম্রাজ্য রক্ষার প্রয়োজনে যেসব বৃটিশ অফিসার এসব অঞ্চলে আসা-যাওয়া করেছেন তাঁদের কথা থাক। কেবল পর্বতারোহণের জন্য যাঁরা এইপথে এসেছেন, তাঁদের কথাই মনে করা যাক। যতদূর জানি এ অঞ্চলে প্রথম পর্বতাভিযান পরিচালিত হয় ১৯৪৭ সালে। ঐ বছর লুডউইগ ক্রেনেক (Ludwig Crenek) ও ফ্রিট্জ কোব (Fritz Kolb) নামে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটি ছাত্র কিশ্তোয়ার হিমালয়ের দুর্গম পথে আর দুস্তর হিমবাহে প্রথম পদপরিক্রমা করলেন। তাঁরা দেখতে পেলেন পাঁচ থেকে সাড়ে ছ' হাজার মিটার উঁচু অনেকগুলি

অনিন্দ্যসুন্দর শৃঙ্গ রয়েছে হিমালয়ের এই অবহেলিত অংশে। বুঝতে পারলেন, তখনও সার্ভে অব ইণ্ডিয়া এ অঞ্চলের সঠিক মানচিত্র অঙ্কন করতে সক্ষম হন নি।

অভিযাত্রীরা ব্রহ্মলোকে অর্থাৎ ব্রহ্মা পর্বতগোষ্ঠীর হিমাঙ্গনে পৌঁছতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা পেরে ওঠেন নি। তবে তাঁরা দূর থেকে কিশ্‌তোয়ার-হিমালয়ের তুষারাবৃত শৃঙ্গমালা দর্শন করে মুগ্ধ হয়েছিলেন। কোব এই গিরিশ্রেণীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গটির নাম রাখলেন সিক্‌ল মুন (Sickle Moon)। ২১,৬৮৬ ফুট উঁচু সেই শৃঙ্গটি আজও ঐ নামে পরিচিত।

তাঁদের পরে কোন অনিবার্য কারণে বহুবছর এপথে আর কোন পর্বতাভিযাত্রী পদচারণা করেন নি। এ অঞ্চলে পরবর্তী পর্বতাভিযান পরিচালিত হয় ১৯৬৫ সালে। ডঃ চার্লস ক্লার্ক (Charles Clarke) সেই অভিযানের নেতৃত্ব করেন। ক্লার্ক কিশ্‌তোয়ার-হিমালয়ের প্রেমে পড়ে যান। তাই ১৯৬৯ ও ১৯৭১ সালেও তিনি এই অঞ্চলে দুটি পর্বতাভিযান পরিচালনা করেন। তিনিই ব্রহ্মলোকের প্রকৃত আবিষ্কারক। তিনি ব্রহ্মা শিখরে আরোহণ করতে পারেন নি কিন্তু ব্রহ্মা পর্বতের প্রতিবেশী কয়েকটি অনামী শিখরে আরোহণ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে ক্লার্ক কিশ্‌তোয়ার-হিমালয়ের প্রথম সমীক্ষক। তাঁর ফটো দেখে ও বিবরণ পাঠ করে পরবর্তীকালের পর্বতারোহীরা এ অঞ্চলে আসতে শুরু করেছেন।

ডঃ ক্লার্ক এ অঞ্চলের অনেকগুলি অনামী শিখরের নামকরণ করেছেন। তার মধ্যে আইগার (Eiger) ও ক্যাথিড্রেল (Cathedral) শৃঙ্গদুটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ দুটির উচ্চতা যথাক্রমে ১৯,৬৮৫ ও ১৮,২০৯ ফুট।

আবার তাঁর ব্রহ্মা পর্বতাভিযানের প্রসঙ্গে ফিরে আসছি। ডঃ ক্লার্ক ও তাঁর সহযাত্রীরা তিনবার ব্রহ্মা-১ শিখরে আরোহণের চেষ্টা করেছেন। কারণ ব্রহ্মা-১ এ অঞ্চলের সবচেয়ে আকর্ষণীয় পর্বতশিখর। দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁদের তিনটি প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে। তাহলেও

সে ব্যর্থতা গৌরবময়। কারণ তৃতীয়বার তাঁরা দুরারোহ ব্রহ্মা-১ শিখরের মাত্র কয়েক শ' ফুটের মধ্যে পেঁাচেছিলেন। কিন্তু শিখরশিরায় অত্যধিক তুষার সঞ্চয়ের জন্য তাঁদের সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়।

ডঃ ক্লার্ক কিশ্‌তোয়ার-হিমালয়কে পর্বতারোহণের আদর্শক্ষেত্র বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁর ব্রহ্মা অভিযানের রোমাঞ্চকর বিবরণে আকৃষ্ট হয়ে ১৯৭১ সালেই একদল জাপানী পর্বতারোহী ব্রহ্মা পর্বতাভিযানে আসেন। তাঁরা উত্তর-পূর্ব গিরিশিরা ধরে শিখরারোহণের চেষ্টা করেন। কিন্তু অভিযানকালে এক দুর্ঘটনায় দুজন অভিযাত্রীর অকালমৃত্যুর জন্য শেষ পর্যন্ত তাঁদের পর্বতাভিযান পরিত্যক্ত হয়।

বিয়োগ কিংবা ব্যর্থতা কোনদিন হিমালয়-অভিযাত্রীদের অবসন্ন করে তুলতে পারে নি। আর্ভিন ও ম্যালোরীর মহান স্মৃতি তেনজিং ও হিলারীকে উদ্বুদ্ধ করেছে। অনিমাদি, অমর, গৌরাঙ্গ, সুজয়া ও অসিত প্রতিনিয়ত আমাদের প্রেরণা যুগিয়ে চলেছে।

তাই দুবছর বাদে ১৯৭৩ সালে বিশ্ববিখ্যাত পর্বতারোহী ক্রিস বনিংটন এলেন এখানে। সহযাত্রী নিক্ এস্টকোর্ট (Nick Estcourt)-এর সঙ্গে ২৪শে অগাস্ট তিনি ব্রহ্মা-১ শিখরে আরোহণ করেন। তিনিও কিশ্‌তোয়ার-হিমালয়কে পর্বতারোহণের উপযোগী বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁর ভাষায়—'The area had the singular attraction of having a host of attractive rock and snow peaks of between 18,000 and 21,500 ft, not one of which had been climbed.'

বনিংটনের বিবরণে উৎসাহিত হয়েই আমাদের সদস্যরা ১৯৮০ ও ১৯৮৫ সালে এ অঞ্চলে এসেছে এবং এই অভিযানের আয়োজন করা হয়েছে। কিন্তু আমাদের কথা এখন থাক, পূর্বসূরীদের স্মৃতিচারণ করা যাক।

---

* লেখকের 'লীলাভূমি-লাহুল' ও 'সুন্দরের অভিসারে' দ্রষ্টব্য।

* * Himalayan Mountaineering Journal Vol, VIII, 1973

ক্রিস বনিংটনের পরে এ অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য অভিযান আয়োজিত হয় ১৯৭৫ সালে। এবং এটি সম্ভবতঃ কিশ্‌তোয়ার-হিমালয়ে প্রথম ভারতীয় পর্বতাভিযান। ভারতীয় প্রতিরক্ষা দপ্তর এই অভিযানের আয়োজন করেছেন। ছাব্বিশজন সদস্যের সেই অভিযাত্রীদলের নেতৃত্ব করেছেন লেঃ কর্ণেল ডি. এন. টংখা।

অভিযানের সদস্য শেরিং নরবু ও নিমা দোরজি ৫ই অক্টোবর কিশ্‌তোয়ার-হিমালয়ের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ ২১,৬৮৬ ফুট উঁচু সিক্‌ল মুন শিখরে ভারতের জাতীয়পতাকা প্রোথিত করেন।

পরের বছর আবার কয়েকজন বৃটিশ পর্বতারোহী এ অঞ্চলে আসেন। ডঃ ক্লার্ক ও ক্রিস বনিংটনের বিবরণ পাঠ করে তাঁরাও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, 'The area has been recognised as very suitable for small parties, and every year sees numerous light expeditions (including many Japanese) in the area.'

কেলভিন টোর‍্যান্‌স (Calvin Torrans), ক্লেয়ার শেরিড্যান (Clare Sheridan) ও সে বিলেন (Se Billane) নামে তিনজন অভিযাত্রী জুলাই-অগাস্ট মাসে 'আইগার' (১৯,৬৮৫´) এবং 'ক্যাথিড্রেল' (১৮,২০৯´) শিখরের পথসমীক্ষা সম্পূর্ণ করে যান।

দুর্ভাগ্যের কথা অভিযানের আয়োজন করার সময় এপ্রিল মাসে (১৯৭৭) এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় বিলেন মারা গেলেন। সুযোগ্য সহযাত্রীরা কিন্তু বন্ধুর আকস্মিক মৃত্যুতে মুষড়ে পড়লেন না। বরং তাঁরা তাঁর স্মৃতিকে অমর করে তুলতে দ্বিগুণ উৎসাহে অভিযানের আয়োজন সম্পূর্ণ করেছিলেন।

যাই হোক সাতাত্তর সালের জুন মাসে অভিযাত্রীরা ভারতে এলেন। কেল্‌ভিন টোর‍্যান্‌স এই অভিযানের নেতৃত্ব করেন। দলের অন্যান্য অভিযাত্রীরা হলেন এমেট্‌ গোল্ডিং (Emmett Goulding), এণ্টনী লেঠ্যাম (Anthony Latham), জস্‌ লিন্যাম (Joss Lynam) এবং শেরিড্যান। ভারত সরকার অভিযাত্রীদের খুবই

সাহায্য করেছেন। ক্যাপ্টেন আই. পি. সিং নামে প্রতিরক্ষা দপ্তরের জনৈক পর্বতারোহীকে তাঁরা সংযোগাধিকারিক (Liason Officer) রূপে তাঁদের সঙ্গে দিয়েছিলেন। তাঁরা ৫ই জুন দিল্লী থেকে রওনা হয়ে ২২ শে জুন ক্যাথিড্রেল শিখরে আরোহণ করেন।

পর্বতারোহণের প্রেক্ষাপটে কিশ্‌তোয়ার-হিমালয় সম্পর্কে তাঁদের মন্তব্যটি মনে রাখার মতো। তাঁরা বলেছেন—"The scale of the mountains is not large, by Himalayan standards, but they are technically difficult. The rock is mostly a compact gneiss, not well endowed with holds. The Valleys are mostly narrow and deeply cut. The glaciers....are quite large, and descend to about 4000 m. In their lower stretches they offer the usual Himalayan purgatory of moraine mounds."

ঐ বছর অর্থাৎ ১৯৭৭ সালে আরও একদল বিদেশী অভিযাত্রী এ অঞ্চলে এসেছেন। তাঁরা আসেন সেপ্টেম্বার মাসে। কার্লাইল মাউণ্টেনীয়ারিং ক্লাব এই অভিযানের আয়োজন করেছেন। স্টুয়ার্ট হেপ্‌হার্ণ (Stuart Hephurn)-এর নেতৃত্বে ছ'জনের এই অভিযাত্রীদল ৭ই অক্টোবর কিয়ার নালার উত্তরে ২০, ৯৭০ ফুট উঁচু একটি অনামী শিখরে আরোহণ করেন।

—নমস্তে সাব!

আমার চিন্তায় ছেদ পড়ে। তাড়াতাড়ি সামনে তাকাই। একজন পাহাড়ী মানুষ আমাদের নমস্কার করছে। তার সঙ্গে দুটি ছেলে ও দুটি মেয়ে। বড়টি ও ছোটটি মেয়ে। বড়টির বয়স বারো ও ছোটটির বছর চারেক। ছেলে দুটি মাঝখানে।

আমি এদের চিনতে পারি না, চিনতে পারে না ওরাও—জগদীশ কৃষ্ণ ও তপন। আজ ওরা আর এগিয়ে যায় নি। কি করবে এগিয়ে? আজ যে মাত্র ৮ কিলোমিটার হাঁটতে হবে। গত দু' ঘণ্টায় তার অর্ধেকটা পথ পেরিয়ে এসেছি।

পর্বতারোহীরা চিনতে না পারলেও, পাহাড়ী ছেলে-মেয়েরা ভুল করে নি। বড় মেয়েটি কৃষ্ণকে দেখিয়ে নিজেদের ভাষায় কি যেন বলে তার বাবাকে। বাবা হাতজোড় করে এগিয়ে যায় কৃষ্ণের সামনে। তারপরে সবিনয়ে হিন্দীতে বলে—সাব্, এটাই দারসী গ্রাম। আমার নাম মোক্তার আহমেদ। আমি মারোয়া তহসিল অফিসে পিওনের কাজ করি।

—মারোয়া.........

—জী। এখান থেকে ৪২ কিলোমিটার। সেখান থেকে অনন্তনাগ ও লাদাখের পথ আছে।

একবার থামে সে। তারপরে আবার বলে—সাব্, গতবছর আপনারা আমার বাড়ি গিয়েছিলেন, ফটো তুলেছিলেন। ঐ যে সামনে আমার বাড়ি।

সে হাত দিয়ে নালার ওপারে পথের বাঁদিকে বাড়িটা দেখায়।

এবারে মনে পড়ে ওদের। কৃষ্ণ বলে—হ্যাঁ, গতবছর। আমরা আপনার বাড়ি গিয়েছিলাম।

শুধু তার নয়, জগদীশ আর তপনেরও মনে পড়েছে এই পাহাড়ী পরিবারটির কথা।

তপন বলে—আমরা সেদিন খুবই ক্লান্ত। একটু জিরিয়ে নেবার জন্য আপনার ঘরের সামনে বসে পড়েছিলাম। আপনার ছেলে ও ছোট মেয়েটি আমাদের দেখতে পেয়ে আপনার স্ত্রীকে মানে আমাদের বহিনজীকে ডেকে নিয়ে আসে।......

—বহিনজী একরকম জোর করেই আমাদের ঘরে নিয়ে গেলেন। তপনের কথা কেড়ে নিয়ে জগদীশ বলতে শুরু করে দেয়—পরিচয় হল আপনার সঙ্গে, পরিচয় হল আপনার ভাইদের সঙ্গে। আপনি গাছ থেকে আরু ও আপেল পেড়ে নিয়ে এলেন। বহিনজী আমাদের চা বানিয়ে দিলেন।

জগদীশ থামতেই কৃষ্ণ আবার বলে—ভালই হল তখনও আপনি ছুটিতে ছিলেন, এখনও বাড়িতে রয়েছেন। তা বহিনজী ভাল আছেন নিশ্চয়ই?

সহসা ভেউ ভেউ করে কেঁদে ওঠে বড় মেয়েটি। ছেলে আর ছোট মেয়েটাও কাঁদতে শুরু করে দেয়। মোক্তারের চোখ দুটিও সজল হয়ে উঠেছে। সে চোখ মোছে।

আমরা অপ্রস্তুত, আমরা বিভ্রান্ত। ওরা কাঁদছে কেন? কি হয়েছে বহিনজীর?

কিন্তু কেউ সেকথা জিজ্ঞেস করতে পারি না নীরবে। ওদের দিকে তাকিয়ে থাকি।

একটু বাদে আবার চোখ মোছে মোক্তার। তারপরে কান্না মেশানো স্বরে কোনমতে বলে—সাব, আপনাদের বহিনজী আমাদের সবাইকে ছেড়ে চলে গিয়েছে।

চলে গিয়েছে! কোথায়? এতটুকু মেয়েকে ফেলে, স্বামীর সংসার ছেড়ে কোথায় গেছেন বহিনজী? তবে শুনছি পাহাড়ী সমাজে নাকি এমন হামেশাই হয়।

কিন্তু সেকথাও জিজ্ঞেস করতে পারি না কেউ। কোন কথাই বলতে পারি না আমরা। ছেলে-মেয়েদের কান্নার শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই এই পাহাড়ী পথে। আমরা চুপ করে থাকি। হিমালয়ের পাথরে পাথরে প্রতিহত হয়ে সেই অসহায় আর্তনাদ আমার আত্মাকে শুধু অস্থির করে তুলছে।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে মোক্তার আবার বলে—আটমাস হ'ল সে আমাদের ছেড়ে গেছে। আমি তখন মারোয়াতে ডিউটি করছিলাম। তার অসুখের খবর পেয়ে ছুটে এলাম। ঠাণ্ডা লেগে নিমোনিয়া হয়েছিল। কি করব সাব! এখানে তো ডাক্তার নেই! তখন ডিসেম্বর মাস, বরফ পড়ে পথ বন্ধ। তাই তাকে কিশ্‌তোয়ার নিয়ে যাওয়া সম্ভব হল না। সাব, চোখের সামনে সে বিনা চিকিৎসায় মরে গেল।......

আর কিছু বলতে পারে না মোক্তার। তার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে গেল।

আমরাই বা কি বলব? আমাদের স্নেহময়ী বহিনজী বিনা চিকিৎসায় মারা গিয়েছেন। কিন্তু এমন শত শত ঘটনা এদেশে

প্রতিদিন ঘটছে, তবু যে এর সান্ত্বনার ভাষা আজও শেখা হয়ে ওঠে নি আমাদের। অতএব চুপ করে থাকি।

একটু বাদে আমরা ওদের বাড়ির সামনে এসে পৌঁছই। এক বছর আগে তপনরা এই বাড়িতে বসে বহিনজীর বানিয়ে দেওয়া চা খেয়ে গেছে।

হাতজোড় করে মোক্তার বলে—সাব, আজ সে নেই। কে আর আপনাদের আদর-যত্ন করবে? তবু যদি দয়া করে একটিবার পায়ের ধুলো দেন, তার আত্মা শান্তি পাবে।

আমি তাকে দেখি নি, তবু সে যে আমারও বোন, হিমালয়ের বোন। আর তাই আমি চেতনাহত। ওদের সঙ্গে নীরবে সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসি বহিনজীর ঘরে।

ভাইদের যৌথ সংসার। ইতিমধ্যে মোক্তারের ভাইরা আমাদের বসার ব্যবস্থা করে ফেলেছে। এমনকি কতগুলো আপেল পর্যন্ত এনে রেখেছে।

মোক্তার বড় মেয়েকে বলে—চাচীদের চায় বানাতে বল!

আমরা তাকে বাধা দিতে পারি না। কয়েক মিনিট বাদে চা আসে। আমরা চায়ের গেলাস হাতে তুলে নিই।

মোক্তার বলে—আমাকে পড়ে থাকতে হয় সেই মারোয়াতে। ছেলে-মেয়েরা এখানেই আছে চাচা-চাচীদের কাছে।

ছোট মেয়েটা বাবার গা ঘেসে দাঁড়িয়েছিল। কি যেন সে বলে বাবাকে। বাবা মাথা নাড়ে। আমি তাকিয়ে থাকি অবুঝ মেয়েটার মুখের দিকে। মাতৃহীনা, অসহায়, তবু মুখখানি ভারী মিষ্টি। বড্ড মায়া হচ্ছে মেয়েটাকে দেখে।

মোক্তার কৃষ্ণকে জিজ্ঞেস করে—আমাদের তসবির এনেছেন সাব?

তসবির মানে ফটো। কার ফটো।

কৃষ্ণ যেন চমকে ওঠে। শুধু কৃষ্ণ নয়, তার সঙ্গে জগদীশ আর তপন। আমরা ওদের দিকে তাকাই। ওরা মাথা নিচু করে।

একটু বাদে কৃষ্ণ কোনমতে ঢোক গিলে জবাব দেয়—না, সত্যি বড্ড ভুল হয়ে গেছে।

—আপনারা তো বলে গিয়েছিলেন, তসবির পাঠিয়ে দেবেন। ঠিকানা পর্যন্ত নিয়েছিলেন। বড় মেয়েটি কথা বলে এতক্ষণে। তার কথায় স্পষ্ট অভিযোগ।

তপনরা মাথা নিচু করে নীরব থাকে। তাছাড়া কিই বা করবে? আন্তরিক আতিথেয়তায় মুগ্ধ হয়ে পর্বতারোহীরা এই পাহাড়ী পরিবারের ফটো তুলেছিল, বলেছিল কলকাতায় ফিরে সেই স্মারক পাঠিয়ে দেবে। যথারীতি তারা সেই প্রতিশ্রুতি পালন করে নি।

—ওর মধ্যে আমাদের মায়ের তসবির আছে সাব! বড় মেয়েটি আবার বলে।

কৃষ্ণ মাথা নাড়ে।

মোক্তার বলে—সাব, আমরা অনেকদিন আপনাদের চিঠির পথ চেয়েছিলাম। আমার স্ত্রীও বলত তসবিরের কথা। তারপরে সে হঠাৎ চলে গেল। তার তো কোন তসবির নেই। আমিও আপনাদের ঠিকানা জানি না যে চিঠি লিখব। আজ দূর থেকে দেখতে পেয়ে আমার এই ছোট মেয়েটিও চিনতে পেরেছে আপনাকে। তখন তার কি আনন্দ, আপনি ওর মায়ের তসবির নিয়ে এসেছেন।

জগদীশ জবাবদিহি করে—সত্যি বড্ড ভুল হয়ে গেছে। কিন্তু আর ভুল হবে না, এবারে কলকাতায় ফিরে গিয়েই বহিনজীর ছবি পাঠিয়ে দেব।

কৃষ্ণ আবার ওদের ঠিকানা নেয়, রঞ্জু কিছু ওষুধ দেয়। ওষুধগুলো হাতে নিয়ে বড় মেয়েটা আবার কেঁদে ওঠে। কাঁদতে কাঁদতে বলে—এই দাওয়াই তখন পেলে, মা আমাদের ছেড়ে চলে যেতে পারত না।

নতমস্তকে বেরিয়ে আসি পথে। ওরা দাঁড়িয়ে থাকে দাওয়ায়। আমরা এগিয়ে চলি।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওরা কি ভাবছে জানি না। কিন্তু জানি ওরা এবারেও কৃষ্ণের প্রতিশ্রুতিকে বিশ্বেস করেছে। ওরা যে হিমালয়ের সরল মানুষ।

আর আমরা? আমার কি আমাদের প্রতিশ্রুতি পালন করব?

কিংবা এবারেও হিমালয় থেকে ঘরে ফিরে এই ফুলের মতো সুন্দর মাতৃহারা সন্তানদের আকুল আকাঙ্খার কথা বিস্মৃত হয়ে যাবো ?

গ্রাম ছড়িয়ে বেশ কিছুক্ষণ চড়াই ভাঙতে হল। তারপরে আবার একফালি সমতল পাওয়া গেল। পথের প্রকৃতি কালকের মতই। কেবল তার চেয়ে কিছু কম কষ্টকর। ডানদিকে তেমনি বনময় পাহাড়। বাঁদিকে অনেকটা নিচে চেনাব। ওপারে তেমনি মসৃণ পাথরের রঙ্গীন প্রাচীর, নদীর বুক থেকে খাড়া ওপরে উঠে গিয়েছে।

পথের পাশে পাশে নানা রঙের ফুলের বাহার। তারা হাওয়ায় দুলছে। ভারী ভাল লাগছে।

আজও মাঝে মাঝে গুর্জরদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। এঁরাও ভেড়া -ছাগল গরু-ঘোড়া নিয়ে সপরিবারে নেমে যাচ্ছেন নিচে। যাবেন জম্মু পর্যন্ত। প্রায় সোয়া তিন শ' কিলোমিটার পদযাত্রা শেষ করতে মাস দুয়েক লেগে যাবে। অর্থাৎ এঁরা নভেম্বরের মাঝামাঝি জম্মু পেঁছবেন। তারপরে আবার মে মাসে শুরু হবে এঁদের হিমালয় যাত্রা।

আগেই বলেছি এঁরা চোদ্দ / পনেরো হাজার ফুট উঁচু হিমবাহ অঞ্চলে গিয়ে পশুপালন করেন। তিন-চার মাস সপরিবারে বাস করেন সেখানে। কেউ তাঁবু ফেলেন, কেউ গুহায়, কেউবা পাথরের আড়ালে আস্তানা করেন। আবার কেউ কেউ হিমবাহ কিংবা বুগিয়ালে (উচ্চ হিমালয়ের তৃণভূমি) পাথরের ঘর বানিয়ে নেন। পরের বছর ফিরে এসে আবার একই জায়গায় বাস করেন।

এঁরা ভারতের নাগরিক। কিন্তু সরকার এঁদের কোন সাহায্যই করেন না। তবে এঁরা যাতে জায়গা নিয়ে নিজেদের মধ্যে মারামারি না করেন, তাই এঁদের বসবাসের অঞ্চল নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। বলা বাহুল্য সেখানে কোন 'চেকিং' কিংবা জরিমানার ব্যবস্থা নেই। থাকবে কেমন করে ? কোন্ অফিসার সেখানে যাবেন চেক্ করতে ? তবে এঁরা সরকারী :ব্যবস্থা অনুযায়ী বসবাস করেন। ফলে হিমালয়ে রক্তপাত হয় না।

আজ আর আমরা ওয়াটার বটলে জল ভরি নি। কারণ সমীক্ষায় আসা সদস্যরা সবাই বলেছে, আজ পথে জলের অভাব হবে না। সত্যি হয় নি। মাঝে মাঝেই ঝরণা কিংবা নালার জলে তৃষ্ণা মিটিয়ে নিতে পারছি।

পথের পাশে ঝোপঝাড়ে যেমন রঙীন ফুল বেড়েছে, তেমনি বেড়েছে সবুজ ভাঙ গাছ। আমরা বলছি, 'ভাঙ' কিন্তু ইংরেজ অভিযাত্রীরা লিখেছেন 'Marijuana'। নাম যাই হোক, মাঝে মাঝে আমরা দু-একটি পাতা ছিঁড়ে হাতে কচলে নাকের কাছে নিচ্ছি। শুনেছি ঘ্রাণে অর্ধেক ভোজন হয় কিন্তু ভাঙের গন্ধে তো ভাঙের নেশা হচ্ছে না!

আজও মাঝে মাঝে পথচারীদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। কেউ গাঁয়ের নারী-পুরুষ, কেউবা কিশ্‌তোয়ার যাচ্ছে। তাদের প্রায় প্রত্যেকের প্রবল কৌতূহল আমাদের সম্পর্কে। আমরা কোথা থেকে এসেছি কোথায় চলেছি, কেন যাচ্ছি? আরও অনেক প্রশ্ন। পর্বতারোহণের কথাটা উহ্য রেখে তাদের সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে চলেছি। বলা বাহুল্য কথাবার্তা সব হিন্দীতেই হচ্ছে। কিন্তু কেউ আমরা নির্ভুল হিন্দী বলছি না। কারণ আমাদের মতো এদেরও মাতৃভাষা হিন্দী নয়। এ অঞ্চলের ভাষার নাম কিশ্‌তোয়ারী। জম্মুর ডোগরা ভাষার সঙ্গে এ ভাষার কোন মিল নেই। এরাও উর্দু অক্ষরে লেখা-পড়া করে।

লেখাপড়ার প্রসঙ্গে মনে পড়ে গেল কথাটা। ভারতের প্রত্যেক রাজ্যসরকার স্থানীয় ভাষাকে সরকারী ভাষা করে 'অংরেজী হটাও' পাগলামীকে বাস্তবায়িত করে তুলেছেন। ফলে একদিকে যেমন জাতীয় সংহতির নাভিশ্বাস উঠেছে, তেমনি আন্তঃরাজ্য পর্যটনশিল্প বিপন্ন বোধ করছে। গতকাল এখেলায় এসে তাই বড় আনন্দ হয়েছিল। সেখানে বন-বিশ্রামগৃহের সামনে ইংরেজী সাইনবোর্ড। তাতে লেখা এ অঞ্চলটি সংরক্ষিত বনভূমি। এবং এই বনে নাকি বিভিন্ন জাতের হিংস্র শ্বাপদ রয়েছে। বনবিভাগ যখন বলছেন, তখন নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু আমাদের মন্দভাগ্য, এখন পর্যন্ত তাদের

কাউকে দর্শন করতে পারি নি

না পারায় দুঃখের কিছু নেই। কারণ আমরা শিকার করতে আসি নি। তবু একবার বাঘমামা কিংবা ভালুকদাদার সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে কলকাতায় ফিরে রসিয়ে গল্প করা যেত।

বাঘ ভালুকের বদলে দেখেছি হরিণ ও বানর। শুনেছি এ অঞ্চলে প্রচুর বিষাক্ত সাপ রয়েছে। তাই পাতিমহলায় বাটসাহেব সাবধান করে বলেছেন—সোন্দার পর্যন্ত সন্ধ্যার পরে আলো ছাড়া কেউ চলাচল করবেন না। প্রতিবছর কোন না কোন গ্রামে সাপের কামড়ে মানুষ মারা যায়।

কথাটা যে সত্যি তার প্রমাণও পেয়েছি। সেদিন বিকেলেই জঙ্গলে গিয়ে জগদীশ একটা গোখরো জাতীয় সাপ দেখতে পেয়েছে।

কিন্তু আমরা আর কেউ এখন পর্যন্ত সাপের সাক্ষাৎ পাই নি। তবে মাঝে মাঝেই গিরগিটী জাতীয় ছোট-বড় সরীসৃপ দেখতে পাচ্ছি। গায়ে তাদের নানা রঙের বিচিত্র সমাবেশ। আর দেখছি বহু বর্ণের প্রজাপতি ও ছোট-বড় পাখি। পাখিদের যেমন গায়ের রং, তেমনি দেহের গড়ন। সত্যি চেয়ে থাকবার মতো। আমরা দেখতে দেখতে পথ চলেছি।

পথের বাঁদিকে বাড়ি। বেশ বড় দোতলা বাড়ি। এটা কি কোন গ্রাম? কিন্তু ওরা যে দারসীতে বলল পরের গ্রামটাই সোন্দার! তাহলে কি সোন্দার এসে গেল?

তপন বলে—এদের ঠিকানাও সোন্দার। তবে এটা ঠিক সোন্দার উপত্যকা নয়। মূল সোন্দার গাঁয়ে পৌঁছতে আরও আধঘণ্টা হাঁটতে হবে।

ঘড়ি দেখি, বারোটা বাজতে পাঁচ। সাড়ে আটটায় রওনা হয়েছি। আজ পথে সামান্যই বিশ্রাম করেছি। তাহলেও আট কিলোমিটার পথ যেতে আমার চার ঘণ্টা লাগবেই।

বাড়িটার ঠিক আগে পথের পাশে প্রকাণ্ড একটা গুহা। বাড়ির

লোকেরা সেটিকে ঢেঁকিঘরে রূপান্তরিত করেছে। প্রাকৃতিক অবদানের এমন কৃত্রিম ব্যবহার খুব কমই দেখেছি। তাই তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি—দুজন মহিলা ঢেঁকিতে ধান ভানছে। শুনছি সোন্দার উপত্যকায় প্রচুর পাহাড়ী ধান হয়।

আমাদের দেখতে পেয়েই ওরা কাজ থামিয়ে দেয়। বয়স্কাটি জিজ্ঞেস করে—আপনারা কোথা থেকে আসছেন ভাইসাব, কোথায় যাচ্ছেন ?

রঞ্জু উত্তর দেয়।

শুনে খুশি হয় ওরা। ব্রহ্মাজীর কাছে আমাদের নির্বিঘ্ন প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রার্থনা জানায়।

ওদের ধন্যবাদ দিয়ে এগিয়ে চলি। ওরা ধান ভানতে থাকে, আমরা চড়াই ভাঙতে শুরু করি। বড় বাড়িটার বারান্দায় দাঁড়িয়ে দুটি ছেলে-মেয়ে হাত নাড়ছে। আমরাও হাত নাড়ি।

সামনে উৎরাই। চমকে উঠি। উৎরাই মানে আবার চড়াই। কিন্তু করার কি ? এগিয়ে চলি।

একটু বাদেই কারণ বুঝতে পারি।

ডানদিকের পাহাড় থেকে একটা নদী নেমে এসে চেনাবে মিশেছে। নদীটা ছোট কিন্তু খুবই খরস্রোতা, পাহাড়ী নদী যেমন হয়।

নদী পার হতে হবে, তাই পথ নেমে এসেছে তীরে। এখানে দেখছি একটা ছোটঘরে পানিচাক্কি রয়েছে। দুটি মেয়ে মকাই ও রামদানা পিষছে। পানিচাক্কি মানে প্রাকৃতিক জলশক্তির সাহায্যে চালিত চাকি। সাধারণতঃ এসব কলে মালিক উপস্থিত থাকে না। থাকার দরকারও হয় না। যারা পিষতে আসে, তারা ঘরের কোণে রেখে দেওয়া একটি পাত্রে মালিকের মজুরি বাবদ খানিকটা ছাতু কিংবা আটা রেখে দিয়ে যায়। কেউ তাকে ফাঁকি দেয় না।

সাঁকোর সামনে এসে বুঝতে পারি, ওপারে যাবার কাজটি কোনমতেই সহজ নয়। কারণ পাশাপাশি দুটি পাইনগাছের টুকরো ফেলে সাঁকো তৈরি করা হয়েছিল। তার একটা টুকরো কেমন করে

যেন ওপার থেকে নদীতে খসে পড়েছে। অর্থাৎ একটা গাছের ওপর দিয়ে ওপারে যেতে হবে এবং সে গাছটি মোটেই মোটা নয়। পাশে ধরবারও কোন ব্যবস্থা নেই। নিচে বিরাট বিরাট পাথরের ওপর দিয়ে দুর্বার বেগে জল বয়ে চলেছে। সাঁকো থেকে পড়ে গেলে আর আমাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

তাহালেও যেতে হবে ওপারে। ওপারে না পৌঁছুলে সোন্দার পৌঁছন যাবে না। আর যেতে যখন হবে, তখন সবার আগে আমার যাওয়াই ভাল। কিছু একটা হয়ে গেলে সহযাত্রীরা সাক্ষী হতে পারবে।

অতএব এগিয়ে চলি। ওরা সবাই পেছন থেকে সাবধান করছে। তার কিছু কানে আসছে আর কিছু নদীর গর্জনে হারিয়ে যাচ্ছে।

আমি কিন্তু হারিয়ে গেলাম না। ব্যালান্সের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলাম। একটা সরু পাইনগাছের ওপর দিয়ে বিক্ষুব্ধ নদীর অপর পারে পৌঁছলাম। ওরা ওপারে দাঁড়িয়ে সোচ্চার স্বরে আমাকে অভিনন্দিত করে। তারপরে একে একে সবাই সাঁকো পার হয়ে আসে।

সাঁকো থেকেই শুরু হয় চড়াই। তবে গতকালের মতো এবড়োখেবড়ো ঘামঝরানো খাড়া চড়াই নয়, মোটামুটি মসৃণ পথ। আস্তে আস্তে ওপরে উঠেছে।

চড়াই শেষ করে ডানদিকে বাঁক ফিরলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমার সামনে উন্মোচিত হল সীমাহীন সৌন্দর্যের ভাণ্ডার।

কৃষ্ণ বলে—সোন্দার-সুয়েদ ভ্যালী, চেনাবের সবচেয়ে সুন্দর ও বড় উপত্যকা। এতবড় উপত্যকা হিমালয়ের অন্তরলোকে আপনি খুব কমই দেখেছেন।

ওর উক্তির সত্যতা বিচারের সময় এখন নয়। তাই আমি কোন কথা না বলে কেবল অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকি সেই সীমাহীন সৌন্দর্যলোকের দিকে।

না, আমি একা নই। আমার সঙ্গে রঞ্জুও বাক্যহারা। আমাদের

আগে যারা এসেছে তাদেরও একই অবস্থা হয়েছে, আমাদের পরে যারা আসবে তাদেরও একই অবস্থা হবে।

কিন্তু নিজেদের কথা থাক, এখন শুধু নীরবে সামনের সীমাহীন সৌন্দর্যকে উপভোগ করা যাক। আমি চেনাবের দিকে তাকাই। সে এখানে প্রায় সমতল প্রান্তরের বুক বেয়ে প্রবাহিত একটি আঁকাবাঁকা রূপোলী ধারা। তার দুতীরের বেলাভূমিও সাদা। তারপরে সবুজ সোনালী ও লাল ক্ষেত। বাঁদিকের ক্ষেত ধাপে ধাপে ওপরে উঠে বনময় পাহাড়ে মিশেছে। আর ডানদিকে অর্থাৎ আমরা যে তীরে দাঁড়িয়ে আছি, এখানে রঙীন ক্ষেতগুলি প্রায় সমতল প্রান্তর। সেই প্রান্তরের বুক চিরে আরও দুটি রূপোলী ধারা এসে চেনাবে মিশেছে। প্রথম পাহাড়ী নদীটির নাম কিবার নালা, দ্বিতীয়টি নাস্থ নালা।

কিবারের বাঁতীরে সোন্দার গ্রাম আর দুই নদীর মাঝখানের উপত্যকায় সুয়েদ গ্রাম। সুয়েদ ছাড়িয়ে নাস্থ নালার ওপারে আরও খানিকটা হেঁটে গেলে আরেকটি নদীর সঙ্গে দেখা হবে। নাম তার কিয়ার নালা। সেও এসে চেনাবে মিশেছে। কিন্তু তাকে এখান থেকে দেখা যাচ্ছে না।

না যাক্, যা দেখা যাচ্ছে, তাই যে আমার হৃদয়ে আনন্দের জোয়ার বইয়ে দিচ্ছে। সুয়েদ ছাড়িয়ে আরও বহুদূরে পাহাড়। না পাহাড় নয়, পাহাড়ের ঢেউ। সামনেরটি সবুজ, পরেরটি কালো, তারপরেরটি ধূসর। আর শেষেরটি সাদা—তুষারাবৃত হিমালয়। তারই আকর্ষণে আজ আমার এখানে আসা।

কিন্তু তার কথা পরে হবে, এখন আজকের গন্তব্যস্থল সোন্দারকে দেখা যাক। সোন্দার শব্দটি বুঝি বা সুন্দরের রূপান্তর। এমন ছবির মতো সুন্দর গ্রাম খুব কমই দেখেছি। সুবিস্তৃত সমতলের বুক জুড়ে ক্ষেত আর সামান্য কয়েকটি বাড়ি-ঘর। বেশির ভাগ বাড়ি-ঘর পাহাড়ের গায়ে। সেখানেও ক্ষেত আছে। ক্ষেতের ফাঁকে ফাঁকে ঘরগুলিকে ছবির মতো মনে হচ্ছে।

তাঁদের কথা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়, যাঁরা সেই সুদূর অতীতে এই দুর্গম পথ পেরিয়ে এখানে এসে বসতি স্থাপন করেছিলেন। আচ্ছা, তাঁরা কেন এসেছিলেন? শুধুই কি ক্ষুধার তাড়নায়, না অন্য কোন আকর্ষণ ছিল? কিসের আকর্ষণ? সুন্দরের না ঈশ্বরের? যে কারণেই এসে থাকুন, তাঁরা নিশ্চয়ই সুন্দরের মাঝে পরমসুন্দর কে খুঁজে পেয়েছেন। তাই প্রকৃতির শত আঘাতেও এই দেবভূমি পরিত্যাগ করেন নি। আর তা করেন নি বলেই একালে এই পথ তৈরি হয়েছে, যেপথে আমরা আজ পৌঁছতে পেরেছি এখানে, এই অপরূপ দেবলোকে।

শুধু সোন্দার নয়, এখান থেকে সুয়েদ গ্রামটিকেও দেখতে পাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছি কিবারের পুল। ঐ পুল পেরিয়ে সুয়েদ যেতে হয়। সোন্দার থেকে সুয়েদ মাত্র ১ কিলোমিটার।

সুয়েদ এ অঞ্চলের সবচেয়ে বড় গ্রাম। সেখানে পোস্টাপিস আছে। আছে একটি উষ্ণকুণ্ড। একবার স্নান করতে পারলে পথের সব ক্লান্তি দূর হয়ে যেত।

তাহলেও এখন আমরা সুয়েদ যাবার সুযোগ পাচ্ছি না। কিবার নালার পথ ধরে আমাদের ব্রহ্মলোকে পৌঁছতে হবে। সে পথ সোন্দার থেকে।

সুয়েদ হয়ে নাস্থ নালার তীরপথ ধরেও ব্রহ্মলোকে যাওয়া যায়। সেটি ব্রহ্মলোকের সুন্দরতম অংশ সত্তরচিন। তবু আমরা সেপথে যেতে পারব না। কারণ কয়েকদিন আগে এক জাপানী অভিযাত্রী দল এ অঞ্চলে এসেছেন। তারাও ব্রহ্মা-১ শিখরে আরোহণ করবেন। ইণ্ডিয়ান মাউণ্টেনীয়ারিং ফাউণ্ডেশান তাঁদের সত্তরচিন দিয়ে আরোহণের অনুমতি দিয়েছেন। আমরা ওপথে যেতে পারব না।

না পারলেও বোধ করি অভিযানের কোন লোকসান হবে না। কারণ ক্রিস্ বনিংটন ১৯৭৩ সালে কিবারের পথেই ব্রহ্মা-১ শিখরে আরোহণ করেছেন।

কিন্তু এসব কথা ভাবার জন্য তো আমাদের চলা বন্ধ হয় নি। হিমালয়ের অন্তরলোকের অসীম ও অপরূপ রূপ আমাদের গতি স্তব্ধ

করে দিয়েছে। আমরা অপলক নয়নে তাকিয়ে আছি চেনাব উপত্যকা আর কিশ্‌তোয়ার-হিমালয়ের দিকে, তাকিয়ে আছি নীলাকাশ আর তার বুকে ভাসমান সাদা মেঘদলের দিকে। মনে হচ্ছে এই অভিযানের জন্য তো আমরা যে যতটুকু কষ্ট করেছি, এক পলকে হিমালয় তা সুদে-আসলে শোধ করে দিল। আমাদের সকল শ্রম মুহূর্তে সার্থক হয়ে উঠল।

আমার মনে হচ্ছে একখানি অনন্ত ও জীবন্ত রঙীনছবির সামনে দাঁড়িয়ে আছি। সে ছবি স্থির নয় কিন্তু তাকে স্পর্শ করা যায়। সে ছবি নির্বাক নয়, কেবলি কথা বলছে ব্রহ্মলোকের কানে কানে। সেই সচল ও সবাক ছবি আমাদের অচল ও অবাক করে দিয়েছে। আমরা যেন সম্বিত হারিয়ে ফেলেছি।

সম্বিত ফিরে পাই কৃষ্ণের কথায়। সে বলে—চলুন শঙ্কুদা, সামনের ঐ বাঁকটা ফিরলেই বিশ্রামগৃহ দেখতে পাবেন।

নিঃশব্দে এগিয়ে চলি ওদের সঙ্গে। চলতে চলতে ভাবতে থাকি নিজের সৌভাগ্যের কথা। জীবনদেবতার অনেক কৃপায় এমন সীমাহীন সৌন্দর্যলোকে পদার্পণ করা যায়। ধন্য আমি, ধন্য আমার জীবন। তাই হে অসীম, হে অনন্ত, হে সুন্দর! তোমাকে প্রণাম, শত-সহস্র প্রণাম।

॥ ছয় ॥

অনিন্দ্যসুন্দর সোন্দার গ্রামের পথে এগিয়ে চলি। পথের পাশে প্রায় সমতল ক্ষেত। কোথাও ভুট্টা, কোথাও রামদানা, কোথাও বা পাহাড়ী ধান।

সমতলের শেষে পাহাড়—সবুজ পাহাড়। পাহাড়ের গায়েও ক্ষেত আছে, তবে বাড়ি-ঘরই বেশি। সমতলেও বাড়ি রয়েছে। কিন্তু সংখ্যায় খুবই কম। তারই দুটি বাড়ি দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমার। দুটিই দেয়াল ঘেরা টিনের বেশ বড় চৌচালা। কাছের বাড়িটির চালে লাল রং দেওয়া। অবস্থানটিও ভারী সুন্দর-ক্ষেতের মাঝে একটা ছোট টিলার ওপরে।

দূরের বাড়িটি দেখিয়ে শৈলেশ বলে—ওটা প্রাইমারী স্কুল।

—আর এটা? আমি কাছের বাড়িটি দেখিয়ে জিজ্ঞেস করি।

কৃষ্ণ উত্তর দেয়—ফরেস্ট রেস্ট হাউস। ওখানেই আমরা থাকব।

চমৎকার? সুন্দর সোন্দারের সবচেয়ে সুন্দর বাড়িটিতে বাস করতে পারব।

পথ থেকে নেমে আসি ক্ষেতে।

আলের ওপর দিয়ে এগিয়ে চলি। খানিকটা এগিয়ে একটা বড় আখরোট গাছ। শৈলেশ বলে—আশি সালে আমরা সত্তরচিনের পথে এখানে বসে লাঞ্চ্ সেরে নিয়েছিলাম।

—তাহলে তো আজও একবার এখানে বসা উচিত হবে।

সবাই সমর্থন করে আমার প্রস্তাব। আমরা রুকৃস্যাক্ খুলে রেখে গাছের গোড়ায় বসে পড়ি। ঘড়ি দেখি, দুপুর সাড়ে বারোটা। ৮ কিলোমিটার পথ আসতে চার ঘণ্টা লেগেছে। আজ অবশ্য আমরা দেখতে দেখতে পথ চলেছি। এখনও তাই করছি। বসে বসে সোন্দারকে দেখছি। এ দেখার যে শেষ নেই।

হঠাৎ নজর পড়ে আমার। সবিস্ময়ে বলে উঠি—এটা কি কবরখানা নাকি!

—ঠিক কবরখানা নয়, গাঁয়ের কয়েকজন গরীব মানুষকে কবর দেওয়া হয়েছে এখানে।

তাঁদের সৌভাগ্যের কথা ভেবে ঈর্ষা বোধ করছি। এমন শান্ত সুন্দর স্বর্গীয় পরিবেশে যাঁদের শেষশয্যা রচিত হয়েছে, তাঁরা দরিদ্র হয়েও পরম সৌভাগ্যবান।

গৌতমের কথায় আমার ভাবনা থেমে যায়। গৌতম বলে—কিশ্‌তোয়ার তহসিলের অন্যান্য গ্রামের মতই সোন্দার হিন্দু-মুসলমানের মিলিত গ্রাম। এখানে অবস্থাপন্নদের সাধারণতঃ বাড়িতেই সৎকার করা হয় কিংবা কবর দেওয়া হয়। যেসব হিন্দুর বাড়িতে জায়গা নেই, তাঁদের দাহ করা হয় চেনাবের তীরে, আর যেসব মুসলমানের বাড়িতে জায়গা নেই, তাঁদের কবর দেওয়া হয়েছে এখানে। এসব ব্যাপার নিয়ে এখানে কোন অশান্তি হয় না, কারণ এ তহসিলে যেমন ধর্মীয় গোড়ামি নেই, তেমনি নেই অস্পৃশ্যতার সংকীর্ণতা।

শিবু আর গোরা বিশ্রামভবনের সামনে দাঁড়িয়েছিল। আমাদের দেখতে পেয়েই ওরা নামতে শুরু করেছে নিচে। ওরা আমাদের কাছে আসছে। বোধহয় ভেবেছে আমরা ক্লান্ত হয়ে বসে পড়েছি এখানে।

ওরা আসে। শিবু বলে—চলুন শঙ্কুদা, চা হয়ে গেছে রান্না চড়েছে। আজ সত্যই হট্‌-লাঞ্চ্‌ খাওয়াবো।

বেচারী, গতকালের কথা আজও ভুলতে পারে নি। সে আমার রুক্‌স্যাক্‌ পিঠে নিয়ে আবার তাগিদ দেয়—চলুন, চা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

অতএব উঠে দাঁড়াই, শুধু আমি নই, আমরা সবাই। এখন একমগ গরম চা পেলে সত্যই বড় ভাল হয়।

—লীডার কত পেছনে? গোরা জিজ্ঞেস করে।

জয় উত্তর দেয়—ঠিক বুঝতে পারছি না, তবে আমরা আস্তে আস্তে পথ চলেছি। মনে হচ্ছে একটু বাদেই এসে যাবে।

—লীডারের সঙ্গে টুলটুল রয়েছে। রঞ্জু যোগ করে।

—তাহলেও আমি একটু এগিয়ে দেখি, তোমরা বিশ্রামভবনে চলে যাও। নিজের রুক্‌স্যাক্‌ ও আইস এ্যাক্‌স গোরাকে দিয়ে গৌতম বলে। সে সহনেতা। সুতরাং নেতার প্রতি তার একটা অতিরিক্ত দায়িত্ব রয়েছে।

আমরা ওকে বাধা দিই না। কিন্তু জয় গৌতমের বড় ভাই। সুতরাং তারও একটা কর্তব্য রয়েছে। তাই সে নিজের আইস এ্যাক্‌স-টা বাড়িয়ে ধরে বলে—পাহাড়ী পথ খালি হাতে যাস নে।

আইস এ্যাক্‌স নিয়ে গৌতম চলে যায়, আমরাও এগিয়ে চলি।

এটি সংক্ষিপ্ত পথ। পতিত জমি আর ক্ষেতের ওপর দিয়ে। মিনিট পাঁচেক হেঁটে বিশ্রামভবনের আঙ্গিনায় উঠে আসি।

অপূর্ব অবস্থান। চারিপাশে ক্ষেত, মাঝখানে বেশ খানিকটা উঁচু সমতলে এই বিশ্রামভবন। ওপারের পাহাড় থেকে এপারের পাহাড় পর্যন্ত বিস্তৃত উপত্যকার সবটাই পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

বিশ্রামভবনের সামনে একফালি সমতল অঙ্গন। তারপরে দু-ধাপ সিঁড়ি পেরিয়ে ছোট একটুকরো বারান্দা। বারান্দা পার হয়ে ভেতরে ঢুকে পাশাপাশি দুখানি ঘর এবং রান্নাঘর। প্রথম ঘরখানি ছোট, দ্বিতীয়টি বেশ বড়। তারই সঙ্গে রান্নাঘর ও বেসিন। আমরা এঘরেই থাকব। প্রথম ঘরখানিতে শেরপা ও মালবাহকরা থাকবে।

রান্নাঘর ও বেসিনে জলের পাইপ আছে কিন্তু জল নেই। জলের কল বাড়ির পেছনে। পলিথিনের পাইপ দিয়ে ওপরের কোন ঝরণা থেকে জল নিয়ে আসা হয়েছে।

এটি বনবিভাগের বিশ্রাম ভবন। কিন্তু এখানে কোন আসবাবপত্র নেই। আর নেই শৌচাগার। তার মানে মাঠে যেতে হবে।

ঘোড়াওয়ালা মাল নিয়ে আগেই পৌঁছে গিয়েছে। আপাতত তার কাজ শেষ হয়ে গেল। এখান থেকে, কুলি নিতে হবে। কারণ এর পরে পথ সংকীর্ণতর। সেপথে ঘোড়া চলবেনা।

দুদিনের এই পথে মাল পরিবহনের জন্য ঘোড়াপ্রতি আমাদের

একশ' টাকা করে দিতে হবে। বর্তমান বাজারে বেশ সস্তা। কারণ একটা ঘোড়া আড়াইজন মানুষের মাল বয়।

ঘরে এসে দেখি গ্রাউণ্ড-শীট পাতা হয়ে গেছে। জুতো খুলে ভেতরে এসে বসি। বড়-রসিদ চা নিয়ে আসে। গত কয়েকদিন প্রধানতঃ গোরা ও জগদীশ রান্না করেছে। কিন্তু আজ শিবু রান্নাঘরের দায়িত্ব নিয়েছে। খাওয়া বোধকরি মন্দ হবে না। কারণ আগেই বলেছি, শিবু ক্যাটারিং-য়ের ব্যবসা করে।

চা-বিস্কুট শেষ হবার আগেই নেতা ও টুলটুলকে নিয়ে গৌতম ঘরে ঢোকে। আমরা সোচ্চার স্বরে তাদের স্বাগত জানাই। নেতা জুতো খুলে ভেতরে এসে বসে পড়ে। তার মুখে যন্ত্রণার অভিব্যক্তি। কিন্তু মুখে সে কিছুই বলে না। নিঃশব্দে শিবুর হাত থেকে চায়ের মগ নিয়ে একটা চুমুক দেয়।

সহসা রঞ্জু বলে—লীডার তোমার পা-টা দেখছি বড্ড ফুলে গেছে।

—হ্যাঁ। মৃদু স্বরে অমূল্য বলে—তাই জুতো খুলে আরাম লাগছে।

রঞ্জু তাড়াতাড়ি নেতার দিকে এগিয়ে গিয়ে বলে—মোজাটা খুলে ফেলো তো, পা-টা একটু দেখি।

অমূল্য দ্বিধা করছে দেখে রঞ্জুও ওর মোজার দিকে হাত বাড়ায়। বাধ্য হয়ে অমূল্য মোজা খোলে। সত্যি ওর পা খুবই ফুলে গেছে। রঞ্জু আঙ্গুল দিয়ে একটু টিপতেই অমূল্য তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বলে —শুধু ফুলে যায় নি, সেই সঙ্গে ব্যথাও বেড়েছে।

—তবু তুমি আমাদের কথা শুনলে না, একটা ঘোড়া নিলে না। সহনেতা অভিযোগ করে।

নেতা চুপ করে থাকে। ভুল করলে কথা না বলাই বুদ্ধিমানের কাজ।

নেতার পা পরীক্ষা করে রঞ্জু শিবুকে বলে—রান্না হয়ে গেলে এক স্যসপ্যান জল গরম করে দিস, লীডার পা সেঁকবে।

তারপরে রঞ্জু তার রুকস্যাক্ খুলে একটা ট্যাবলেট বের করে

নেতার হাতে দিয়ে বলে—এটা খেয়ে একটা ম্যাট্রেসের ওপর পা টান করে কিছুক্ষণ শুয়ে থাকো, দেখবে অনেক ভাল লাগছে।

নেতা ডাক্তারের পরামর্শ মেনে নেয়।

কিন্তু সে বেশিক্ষণ শুয়ে থাকতে পারে না। একটু বাদেই তপন দুজন মানুষকে নিয়ে ঘরে ঢোকে। একজন সুবেশ ও সুশ্রী আধুনিক যুবক, আরেকজন প্রৌঢ় পাহাড়ী।

যুবককে দেখিয়ে তপন বলে—লীডার, ইনিই মহেশ ঠাকুর।

অমূল্য তাড়াতাড়ি উঠে বসে ডানহাত প্রসারিত করে। যুবক তার সঙ্গে করমর্দন করেন। অমূল্য বলে—বসুন।

নেতার পাশে বসে মহেশবাবু তার সঙ্গীকে বসতে বলেন। লোকটি জোড়হাত করে আমাদের সবাইকে নমস্কার করে। মহেশবাবু তাকে দেখিয়ে বলেন—এর নাম গোলাম রসুল পাদিয়ার, আপনাদের মালবাহকদের মেট।

আমরা সবাই ওদের দুজনের সঙ্গে করমর্দন করি। অমূল্য মহেশবাবুকে বলেন—আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ায় ভারী খুশি হলাম, গতবছর আপনি আমার মেম্বারদের খুবই সাহায্য করেছিলেন।

সহনেতা সহাস্যে বলে—এবারেও করছেন। আমরা ওকে মালবাহক সংগ্রহ করে দিতে অনুরোধ করেছিলাম। উনি একেবারে মেটসাবকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

—এ তো আমার কর্তব্য। মহেশবাবু বলেন—আপনারা আমার অবহেলিত দেশে এসেছেন, আপনাদের তো সাহায্য করতেই হবে। তাছাড়া চিঠিতে লিখেছেন, আপনারা কাল সকালেই দোবাতি রওনা হবেন, তাই রসুলসাবকে সঙ্গে নিয়ে এলাম।

—ভালই করেছেন। নেতা বলে—একটু চা খেয়ে নিন, তারপরে কথাবার্তা হবে। আরেকটা কথা, আপনারা কিন্তু আমাদের সঙ্গে লাঞ্চ্ করবেন।

ওরা সম্মত হন। অমূল্য মহেশবাবুকে বলে—আপনাকে একটা অনুরোধ করব।

—বেশ বলুন।

—আপনি তো এখান থেকে বাড়ি ফিরবেন ?

মহেশবাবু মাথা নাড়েন। বল্লেন—কি দরকার বলুন ?

—আমাদের কয়েকখানি চিঠি আপনাকে সুয়েদ ডাকঘরের ডাকবাক্সে ফেলে দিতে হবে।

—বেশ তো, এ আর কি এমন কাজ ? আমাকে দিয়ে দেবেন, আমি বাড়ি ফেরার পথে মাষ্টারজীর হাতে দিয়ে যাবো।

নেতা আমার দিকে তাকায়। বলে—হাওড়াতে গাড়ি ছাড়ার পর থেকে এখানে পৌছন পর্যন্ত একটা সংবাদ লিখে ফেলো। দিল্লীর ইণ্ডিয়ান মাউন্টেনীয়ারিং ফাউণ্ডেশান, কলকাতার পি. টি. আই. এবং আজকাল পত্রিকায় সংবাদটা পাঠিয়ে দাও। পি. টি. আই-এর দীপক বসাক ও আজকাল-এর অসীম মিত্রকে পাঠিও। একবার থামে অমূল্য। তারপরে আবার বলে—সংবাদের একটা কপি মাননীয় ক্রীড়ামন্ত্রী শ্রীসুভাষ চক্রবর্তীকে পাঠিয়ে দিও। তিনি আমাদের জন্য অনেক করেছেন।

শৈলেশকে নিয়ে বসে পড়ি। ওর হাতের লেখাটি সুন্দর।

সংবাদ লিখতে সময় বেশি লাগে না। অমূল্যকে একবার দেখিয়ে নিয়ে শৈলেশকে কপি করতে বলি।

নেতা ও সহনেতা মেটের সঙ্গে দর-দস্তুর করছে। মেট বলছে—জনপ্রতি দৈনিক পঁয়ত্রিশ টাকা করে দিতে হবে। এখান থেকে মালসহ মূল-শিবিরে পৌছতে দু-দিন লাগবে, আর সেখান থেকে খালি হাতে এখানে ফিরে আসতে লাগবে একদিন।

—তার মানে প্রতি মালবাহককে আমাদের একশ'পাঁচ টাকা করে দিতে হবে। গৌতম বলে।

মেট মাথা নেড়ে বলে—জী।

আগেই বলেছি, মানুষটি মধ্যবয়স্ক। ভদ্র এবং বিনয়ীও বটে। সর্বদা হাসিমুখ এবং আস্তে কথা বলে। দেখে মনে হচ্ছে খুবই ধীর-স্থির।

রেট শুনে ট্রেজারার তপন যেন একটু চঞ্চল হয়ে পড়ে। সে বলে ফেলে—কিন্তু এত টাকা……

—না, না, সাব্ আমি বেশি টাকা চাই নি। এখানে পথে কিংবা বনে কাজ করলেও দৈনিক পঁয়ত্রিশ টাকা পাওয়া যায়। আর সে কাজ অনেক আরামের।

—আমি একটা কথা বলব? নেতা জিজ্ঞেস করে।

মেট উত্তর দেয়—নিশ্চয়ই, বলুন।

—তিনদিনের জন্য তোমরা এক শ' টাকা করে পাবে।

মেট কি যেন একটু ভাবে, তারপরে বলে—বেশ ঠিক আছে, তাই দেবেন। কিন্তু আপনারা যদি কোন মালবাহককে মূল-শিবিরে রেখে দেন। তাহলে তাকে দৈনিক পঁয়ত্রিশ টাকা ও খাবার দিতে হবে।

গৌতম সম্মত হয়। আমি ওর কানে কানে বলি—একটা চুক্তিপত্র করে নিবি নাকি?

—কি দরকার?

—আমাদের সিনিয়লচু অভিযানের বড়ই ঝামেলা হয়েছিল।*

—আমি পড়েছি সেকথা, কিন্তু সেখানে তো আপনি একটা চুক্তিপত্র সই করে নিয়েছিলেন। গৌতম বলে।

আমি মাথা নাড়ি।

সে যোগ করে—তাহলে চুক্তিপত্র সই করে লাভ কি? ঝামেলা বাঁধাবার হলে তো চুক্তিপত্র থাকলেও বাঁধাতে পারে।

অতএব কোন লিখিত চুক্তি হল না। সবটাই মৌখিক রয়ে গেল। ঠিক হল সকালে চা ছাড়া আমরা ওদের আর কোন খাবার দেবো না। ওরা বিছানা নিয়ে যাবে। কেবল মূল-শিবিরে যাদের রাখা হবে, তাদের জামা-কাপড় জুতো ম্যাট্রেস শ্লীপিং ব্যাগ ও খাবার দিতে হবে।

---

* লেখকের 'সুন্দরের অভিসারে' দ্রষ্টব্য

কথাবার্তা শেষ হতেই শিবু সুসংবাদ দেয়—রান্না হয়ে গেছে, হট্-লাঞ্চ্ রেডি। সবাই রুকস্যাক্ থেকে থালা ও মগ বের করে বড়-রসিদকে দিয়ে দিন।

একটু বাদেই লাঞ্চ্ আসে, সত্যই 'হট্'—ডাল ভাত, আলু-কুমড়ার তরকারী ও ডিমের কারী। বলাবাহুল্য গতকালের কুমড়োদুটো আজ রান্না করা হয়েছে। আর ডিম আমরা নিয়ে এসেছি। কাচা নয়, রান্না করা ডিম, কৌটোজাত করে। এখানে শুধু গরম করা হয়েছে। তাই উপাদেয়, পরম উপাদেয়।

মেট এবং মহেশবাবু আমাদের অনুরোধ রক্ষা করলেন। তাঁরাও দুখানি থালা হাতে তুলে নিলেন। আমরা খেতে শুরু করি।

হঠাৎ নেতা চিৎকার করে উঠল—ম্যানেজার, ম্যানেজার কোথায় গেল?

—কেন লীডার, এই তো আমি এখানে বসেছি। ঘরের এককোণ থেকে জয় উত্তর দেয়।

লীডার গলার স্বর কিছুমাত্র না নামিয়ে অভিযোগ করে—তুমি আজকাল একেবারেই 'ডিউটি' করছ না।

—কোন্ ডিউটি লীডার?

—মেম্বারদের খাওয়া-দাওয়ার দিকে নজর রাখা কি টীম-ম্যানেজারের ডিউটি নয়?

—নিশ্চয়ই! কিন্তু আমি তো সে 'ডিউটি ডিউলী ডিস্চার্জ' করছি লীডার!

—নো, নো নেভার। তুমি তো জানো আমরা সঙ্গে যথেষ্ট আচার নিয়ে এসেছি।

জয় মাথা নাড়ে।

অমূল্য আবার চেঁচিয়ে ওঠে—তাহলে আমাদের আচার দেওয়া হয় নি কেন?

একটু হেসে জয় উত্তর দেয়—আচার বের করে দিয়েছি। রাম সিং এখুনি নিয়ে আসছে।

একবার থামে সে। তাবপরে আবার বলে—শুধু আচার নয়, সেই সঙ্গে পেয়ার সিং আরও একটা জিনিস নিয়ে আসবে।

এবারে নেতার স্বর বদলে যায়। সে কোমল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে —কি?

—রসগোল্লা।

—নেতা আবার চেঁচিয়ে ওঠে—থ্রি চীয়ার্স ফর আওয়ার ডিউটিফুল ম্যানেজার।

—হিপ্ হিপ্ হুররে……

হৈ হৈ করে খাওয়ার পাট চুকল। খাবার পরই গৌতম মেটকে নিয়ে পাশের ঘরে চলে যায়। শিবু কৃষ্ণ জগদীশ তপন গোরা ও জয় ওদের সঙ্গী হয়। ওরা মালপত্র 'রিপ্যাক্' করবে। ঘোড়া যে বোঝাগুলো বয়ে এনেছে, সেগুলো এখন মানুষের উপযোগী করে তুলতে হবে। ছটা বোঝাকে পনেরো ভাগে ভাগ করতে হবে। আর মেট সেগুলো অনুমোদন করার পরেই আমরা আগামীকালের যাত্রা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হতে পারব।

ঘরে বসে একাজ করা সম্ভব নয় বলে ওরা বোঝাগুলো বাইরে নামাতে শুরু করে দিল। দিনের আলো থাকতে থাকতে কাজ সেরে ফেলতে হবে। এখানে বৈদ্যুতিক আলো নেই।

মেট ঘরে আসে। নেতাকে বলে—সাব্, বাইরে কয়েকজন রোগী এসে বসে আছে, ডাক্তারসাব যদি একটু মেহেরবানী করেন।

অতএব ওষুধপত্র নিয়ে রঞ্জু বাইরে চলে গেল, টুলটুল ওর সঙ্গী হল।

অমূল্য আমি আর শৈলেশ মহেশবাবুর সঙ্গে গল্প করতে থাকি। কথায় কথায় মহেশবাবু বলেন—আমরা ক্ষত্রিয়। কিন্তু আমাদের আদিপুরুষ কেন রাজস্থান থেকে এখানে চলে এসেছিলেন, আমার জানা নেই। কোন্ পথে এসেছেন, তাও জানি না। তবে আমাদের বংশের কেউ ধর্মত্যাগ করে নি। এই উপত্যকার প্রত্যেক গ্রামেই হিন্দু মুসলমানের সংখ্যা প্রায় সমান সমান। তবে আমাদের গ্রামে হিন্দুর সংখ্যাই বেশি।

—কত ? শৈলেশ প্রশ্ন করে।

—তা শ' ছয়েক তো হবেই। আমাদের গ্রামে হিন্দু ছাড়া কেবল কয়েকটি মুসলমান বাড়ি আছে। তাঁরা অধিকাংশই 'শা'।

—আপনি কি করেন ? আমি জিজ্ঞেস করি।

মহেশ বাবু বলেন—এখন ব্যবসা করি। এর আগে বাইরেছিলাম।

—কোথায় ?

—আরব উপদ্বীপের দক্ষিণ-পূর্ব তীরে, ওমান দেশে। আমি রয়েল ওমান পুলিশে চাকরি করতাম। ওখানে চাকরি করার সময় সরকারী সফরে ইতালী, ইউ. কে. এবং ইউ. এস. এ. ভ্রমণ করেছি। আমি ক্যাপ্টেন ছিলাম, বছর পাঁচেক আগে 'ভল্যাণ্টারী রিটায়ারমেণ্ট' নিয়ে দেশে ফিরে আসছি।

অমূল্য আমার কানে কানে বাংলায় বলে—শঙ্কুদা, তুমি এই সোন্দার গ্রামে এসেও একজন বিলেত-ফেরৎ পেয়ে গেলে।

আমি মাথা নাড়ি। মহেশবাবু একটু কৌতূহলী হয়ে ওঠেন। পাছে ভদ্রলোক ভুল বোঝেন, তাই অমূল্য তাড়াতাড়ি আমাকে দেখিয়ে হিন্দীতে বলে—আমাদের এই দাদাও দুবার য়ুরোপ গিয়েছেন

—তাই নাকি ! মহেশবাবু আমার দিকে তাকান। বলেন—কোন্ কোন্ দেশে গিয়েছেন ?

—সুইজারল্যাণ্ড, ফ্রান্স, ইউ. কে., বেলজিয়াম, লুক্সেমবার্গ, ডেনমার্ক, সুইডেন, পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানী, ইতালী ও গ্রীস।

—তার মানে পশ্চিম-য়ুরোপের অধিকাংশ দেশ দেখেছেন ?

আমি মাথা নাড়ি। কিন্তু প্রসঙ্গ পরিবর্তন করতে চাই। হিমালয়ের এই অন্তরলোকে বসে য়ুরোপের কথা ভাল লাগছে না আমার। তাই তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করি—শুনেছি সুয়েদ গ্রামে ভাল স্কুল আছে ?

—হ্যাঁ। হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল। আমার বড় মেয়ে সেই স্কুলে পড়ে।

—তাই নাকি! বয়স কত?

—ছ' বছর। ক্লাশ ওয়ানে পড়ে।

—আপনার কটি ছেলে-মেয়ে?

—দুটি মেয়ে ও একটি ছেলে। ছেলে ছোট, মাত্র এক বছর।···

আরও কিছু কথা বলেন মহেশবাবু। বলেন—সেখানে ভালই ছিলাম, টাকা পয়সা প্রচুর পেতাম, সম্মানও যথেষ্ট ছিল। কিন্তু পারিবারিক কারণে দেশে চলে আসতে হল।

সন্ধ্যে হয়ে আসছে বলে প্যাকিং শেষ হবার আগেই মহেশবাবু ও মেট বিদায় নিল। যাবার সময় মেট বলল—মালবাহকদের নিয়ে আমি সকাল আটটা নাগাদ এসে যাবো, আপনারা তৈরি হয়ে থাকবেন।

—আটটা! নেতা আপত্তি করে। বলে—তোমরা আটটায় এলে যে রওনা দিতে অনেক দেরি হয়ে যাবে মেট!

—না জনাব, দেরি হবে না। ন'টায় রওনা হলে আপনারা বিকেল পাঁচটার মধ্যে আরামসে দোবাতি পৌঁছে যাবেন। কতটুকুই বা পথ, ১৫/ ১৬ কিলোমিটার হবে, তার ওপরে কোন খাস চড়াই নেই।

—খাস-চড়াই নয়! অমূল্য বলে—বলছ কি মেটসাব? সোন্দারের উচ্চতা সাড়ে পাচ হাজার ফুট আর দোবাতির সাড়ে দশ হাজার। দশ মাইলে পাঁচ হাজার ফুট ওপরে উঠতে হবে। এর মধ্যে না জানি কতবার নদীর কাছে নেমে যেতে হবে।

—তাহলেও জনাব কোন খাস চড়াই নয়, মামুলি চড়াই। আপনারা আরামসে আট ঘণ্টায় চলে যাবেন।

খাস-চড়াই ও মামুলি-চড়াই কি বস্তু এবং দু-য়ের পার্থক্যই বা কি, জানা নেই আমাদের। তবু নেতা আর কিছু বলে না। কিন্তু মেট আবার বলে—জনাব, কুলি-লোগ তিনদিনের জন্য যাচ্ছে, তারা খানা খাবে, পথের খানা সঙ্গে নেবে। ওরা আটটার আগে আসতে পারবে না।

একথা শুনে আর কোন তাগিদ দেওয়া চলে না। তাই নেতা বল্লে—বেশ, তাই এসো। আমরাও ব্রেক-ফাস্ট সেরে তৈরি হয়ে থাকব।

ওরা বিদায় নিয়ে চলে যাবার পরে প্যাকিং শেষ হল। আমরা মালপত্র গুছিয়ে ঘরে নিয়ে এলাম। জগদীশ আর গোরাও দোকান করে ফিরে এলো। তারপরেই বৃষ্টি নামল।

অমূল্য বলে উঠল—দেখলে তো প্রকৃতি আমাদের কি রকম সহায়। তোমরা বাইরে কাজ করছিলে বলে এতক্ষণ বৃষ্টি নামছিল না।

আমরা ওর মুখের দিকে তাকাই। কিন্তু মুখে কিছুই বলি না। নেতা হঠাৎ জিজ্ঞেস করে—আর এই বৃষ্টির মানে কি জানো ?

—আমি জানি লীডার। গোরা সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়।

—কি বলো দেখি ?

—চা বানাতে হবে।

—না, না, শুধু চা নয় সেই সঙ্গে চানাচুর।

—থ্রি চীয়ার্স ফর আওয়ার গ্রেট গ্র্যাণ্ড লীডার !

—হিপ্ হিপ্ হুররে······

অতএব পেট্রোম্যাক্স জ্বালানো হল। স্টোভ ধরানো হল। বর্ষামুখর সন্ধ্যায় চানাচুর সহযোগে চা-পান পর্ব বেশ রসিয়ে উপভোগ করা গেল। যাবার পথে আজই আমাদের ঘরে শেষ রাত্রিবাস। আগামীকাল থেকে তাঁবু-জীবন শুরু হয়ে যাবে।

চায়ের পরে রান্না চড়ল। ম্যানেজার মিষ্টান্ন মঞ্জুর করেছে। মিষ্টান্ন মানে রেডক্রশ থেকে পাওয়া গুড়োদুধের পায়েস। তার সঙ্গে থাকবে রুটি রাজমার ডাল ও শাকের তরকারী। রুটি বানাবার জন্য রসিদ ব্রাদার্স জ্বালানীকাঠ নিয়ে এসেছে।

আগেই বলেছি পাশে রান্নাঘর। দরজা খোলাই রয়েছে। সবই দেখা যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, গোরা ও জগদীশ রান্না করতে করতে আমাদের গল্প শুনতে পাচ্ছে।

গল্প, হ্যাঁ আমরা গল্প করছি। বাড়ির গল্প নয়, নিজেদের গল্প নয়, হিমালয়ের গল্প। কথায় কথায় শৈলেশ বলছে, ব্রহ্মলোকে ওদের

প্রথম পদযাত্রার কথা। সেই পদপরিক্রমার পরিণত পদক্ষেপই এবারের এই পর্বতাভিযান।

শৈলেশ বলে চলেছে—আমরা প্রথম ব্রহ্মা হিমবাহে এসেছি ১৯৮০ সালে। সেবারেও এসেছিলাম সেপ্টেম্বারে। ১৪ই কলকাতা থেকে রওনা হয়ে ১৭ই কিশ্‌তোয়ার পৌঁচেছিলাম। তখন পালমার পর্যন্ত বাস আসত। ১৯শে সকালে পালমার থেকে শুরু হল পদযাত্রা। সেদিন কিন্তু এখেলায় আমরা সত্যই হট্‌-লাঞ্চ্‌ পেয়েছিলাম। রাত্রিবাস করেছিলাম পিঞ্জরারী গ্রামে।

—পিঞ্জরারী ?

আমার প্রশ্নে থামতে হয় শৈলেশকে।

শিবু বলে—যে গ্রামের দোকানটা বন্ধ থাকার জন্য আমি আপনাদের কাল হট্‌-লাঞ্চ্‌ খাওয়াতে পারলাম না।

—তার মানে সেওয়াবাতির আগে ? আমি প্রশ্ন করি।

শৈলেশ মাথা নাড়ে। সে বলতে থাকে—দ্বিতীয়দিন সকালে সেখান থেকেই আমাদের পদযাত্রা শুরু হয়। সেওয়াবাতি এসে আমরা ব্রেকফাস্ট করি, দুপুরে পেঁছিই এখানে এই সোন্দার গ্রামে। এখানে আমরা লাঞ্চ্‌ খেলাম কিন্তু যাত্রাবিরতি করলাম না। সোন্দার থেকে সুয়েদের দূরত্ব সামান্য। পথটি দেখতেও ভারীসুন্দর ঢেউ খেলানো। কিন্তু বড়ই চড়াই-উৎরাই। মাঝখানে কিবারনদী। নদী পার হবার পরেই ছবির মতো সুন্দর সুয়েদ গ্রামটি দূর থেকে দেখতে পেলাম। শুধু গ্রাম নয়, গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া নাস্থ নালাকেও মনে হল যেন শিল্পীর তুলিতে আঁকা একটি রূপোলী রেখা।

গ্রামে প্রবেশ করতেই গ্রামবাসীরা হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানালেন। বেশ উন্নত ও সম্পদশালী গ্রাম। সবারই খাওয়া-পরার সংস্থান রয়েছে।

তহসিল কাছারীতে আশ্রয় পেলাম। নায়েবমশাই মানুষটি বড়ই ভাল। তাঁকে আমরা ডিনারে নেমন্তন্ন করলাম। তারপরে দল বেঁধে ছুটলাম উষ্ণকুণ্ডে। তিনদিন পরে অনেকক্ষণ ধরে ভারী আরামে

স্নান করা গেল। ব্যথা-বেদনা দূর হয়ে শরীরটা ঝরঝরে হল। আশ্রয়ে ফিরে এসে দেখি গাঁয়ের কয়েকজন মানুষ ও মোড়ল আমাদের সঙ্গে গল্প করতে এসেছেন। গল্প শেষে খাওয়া-দাওয়া সারতে সেদিন বেশ রাত হয়ে গেল।

পরদিন ২১শে সেপ্টেম্বার। সকালেই শুরু হল পথচলা। গাঁয়ের মানুষদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা নাম্থ নালা পার হয়ে এলাম। শুরু হল বনপথ—ঘনজঙ্গল। দিনের বেলাতেই যেন রাতের আঁধার নেমে এসেছে পথে। স্যাঁতস্যাঁতে পথ, নরম মাটি জুতো বসে যায়।

কিছুক্ষণ চলার পরে হোঞ্জার নামে একটি গ্রাম পাওয়া গেল। সেখান থেকে তুষারাবৃত শৃঙ্গমালা দেখতে পেলাম। দেখতে দেখতে ব্রেক-ফাস্ট সেরে নিলাম। তারপরে নতুন উদ্যমে আবার এগিয়ে চললাম।

দুপুর নাগাদ ঘুজ্ঘট নামে একটা জায়গায় পৌছলাম। জায়গাটি দেখে ভারী পছন্দ হল। আমরা সেখানে বসে লাঞ্চ খেয়ে নিলাম। তারপরে ঘাসের ওপরে শরীরটা এলিয়ে দিলাম। হঠাৎ দেখি ক্ষুদে ক্ষুদে অসংখ্য জেঁাক চারিদিক থেকে সারা শরীর ছেঁকে ধরেছে। কোন রকমে তাদের গা থেকে ঝেড়ে ফেলে সেখান থেকে পালিয়ে চললাম।

পাথরের ওপরে পা ফেলে ফেলে খুব সাবধানে সেদিন কয়েকটি পাহাড়ী নদী পার হতে হল। তারপরে সন্ধ্যার কিছু আগে পৌছলাম একফালি সমতলে, নাম 'হাওয়াল'। জায়গাটায় তাঁবু ফেলা যাবে দেখে সেখানেই যাত্রা বিরতি করলাম।

তাঁবু টাঙ্গিয়ে চা খেয়ে কিছু কাঠ যোগাড় করা গেল। আগুন জ্বালানো হল, কিন্তু বাইরের আগুনে তাবুর ভেতরের ঠাণ্ডা সামান্যই কমল। তাই তাড়াতাড়ি রান্না সেরে খেয়ে নেওয়া গেল। তারপরে সবাই সঙ্গে আনা সব গরম পোশাক গায়ে দিয়ে শুয়ে পড়ি। শীত তেমন কমল না, তবে একসময় ঘুমিয়ে পড়লাম।

ঘুম ভাঙল গৌতমের ডাকে। ধরমর করে উঠে বসলাম। তাবুর বাইরে প্রচুর আলো, ভেতরেও আলো এসে গেছে। বাইরে এসে বুঝতে পারলাম ভুল হয়েছে। দিন নয় রাত, সূর্য নয় চন্দ্র। চাঁদের আলোয় আকাশ ও মাটি ভেসে যাচ্ছে।

মাটিতে স্বপ্নের ছোঁয়া আর আকাশে সারি সারি রূপোলী পাহাড়। চাঁদের আলোয় বরফের চূড়াগুলি রূপোর মালা। ভাগ্যিস গৌতম রাতকে দিন বলে ভুল করেছিল, তাই ব্রহ্মলোকের এই অপরূপ রূপোলী রূপ দেখতে পেলাম।

পরদিন ২২শে সেপ্টেম্বার। সকালেই বেরিয়ে পড়া গেল। দুর্গম পথ, কখনো ঘন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে, কখনও বা বড় বড় পাথর ডিঙ্গিয়ে। কখনও নিচে নামছি, কখনো বা ওপরে উঠছি। তাহলেও থামতে পারি নি, কারণ ক্রমেই বরফের পাহাড়গুলি আমাদের কাছে এগিয়ে আসছিল।

বেলা দুটো নাগাদ একটা সাঁকোর ওপর দিয়ে আমরা নান্থ্ নালা পার হলাম, পৌঁছলাম কিশ্‌তোয়ার-হিমালয়ের অনাবিল অন্তরলোক সত্তরচিনে। প্রায় চারিদিক তুষারাবৃত শৃঙ্গমালায় পরিবেষ্টিত আশ্চর্য-সুন্দর সবুজ উপত্যকা এই সত্তরচিন। প্রথম দর্শনেই মুগ্ধ হলাম।

আমাদের ডাইনে ব্রহ্মা হিমবাহ, পাথর আর মাটিতে ঢাকা গ্রাবরেখা। এখানে ওখানে ছোট ছোট গাছ গজিয়েছে, ফুল ফুটে আছে। গ্রাবরেখার শেষে হিমবাহের তুষারাবৃত অংশ। ব্রহ্মা-১ পর্বতের গা বেয়ে নেমে এসেছে। ব্রহ্মার পাশে ব্রহ্মাণী।

আমাদের বাঁদিকে আরেকসারি শৃঙ্গমালা। প্রথমেই আইগার। তার গায়ে ও মাথায় সামান্যই বরফ। মনে হচ্ছে বেচারী ব্রহ্মার সামনে নত মস্তকে দাঁড়িয়ে আছে।

আইগারের পরে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে রয়েছে ব্রহ্মা-২, ক্রুকেড-ফিঙ্গার ও ফ্ল্যাট-টপ।

এই বরফের রাজ্যে, এই মৃত্যুশীতল প্রান্তরে, এক বিস্ময়কর সবুজ-

সুন্দর প্রাণের প্রতীক সত্তরচিন। প্রায় সিকি মাইল চওড়া ও মাইল খানেক লম্বা সবুজ ও সমতল ময়দান। একপাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে নাস্থু নালা আরেকপাশে পাহাড়ের সারি। তাদের গা বেয়ে নেমে এসেছে অনেকগুলি ঝরণা। তারা সত্তরচিনকে সিক্ত করে নাস্থে গিয়ে মিশেছে। নাস্থ্ এসেছে ব্রহ্মা হিমবাহ থেকে।

ভেড়াওয়ালাদের রেখে যাওয়া দুটি কুড়ে রয়েছে এখানে। পাথর আর কাঠ দিয়ে তৈরি কুড়ে দুটির একটিতে ফরাসী অভিযাত্রীরা রান্নাঘর বানিয়েছেন, আরেকটি আমরা দখল করলাম। তারপরে তাঁবু টাঙ্গালাম।

কয়েকদিন আগে এই ফরাসী অভিযাত্রীদল সত্তরচিনে মূল-শিবির স্থাপন করেছেন।

তাঁরা আমাদের স্বাগত জানালেন। তাঁরা ব্রহ্মা-১ শিখরে আরোহণের চেষ্টা করছেন। আমরাও একই কারণে সমীক্ষায় এসেছি শুনে তাঁরা খুশি হলেন। *

আনন্দও উত্তেজনার মধ্যে রাতটা কেটে গেল। পরদিন সকাল হতেই বেরিয়ে পড়লাম কাজে। তিনঘণ্টা ধরে প্রচণ্ড চড়াই আর অসংখ্য বড় বড় পাথর পেরিয়ে উপস্থিত হলাম ব্রহ্মা হিমবাহে। প্রায় পনেরো কিলোমিটার দীর্ঘ এই হিমবাহটি বিশ্বের বৃহত্তম হিমবাহগুলির অন্যতম। আমরা তারই ওপর দিয়ে এগিয়ে চললাম। কাজটি কোনমতেই সহজ নয়। কারণ কোথাও বালি কোথাও মাটি, কোথাও পাথর কোথাও বরফ আবার কোথাও লুকিয়ে থাকা ফাটল। সেখানে জীবনের ঝুঁকি। তবে সর্বদাই শরীরে শিহরণ আর হৃদয়ে অপার আনন্দ লাভ করছিলাম। হিমালয়ের এমন ভয়ঙ্কর-সুন্দর রূপ আমি যে এর আগে আর কোথাও দেখি নি।

অবশেষে উপস্থিত হলাম ব্রহ্মালোকে—ব্রহ্মা-১ পর্বতশৃঙ্গের প্রায় পাদদেশে। সেখান থেকে দেখতে পেলাম ব্রহ্মাণীকে—আরেকটি

* এঁরা ব্রহ্মা-১ শিখরে আরোহণ করেছেন।

পর্বতশিখর। একটা সুবিশাল গিরিশিরা ব্রহ্মা ও ব্রহ্মাণীকে যুক্ত করেছে। তার গায়ে কম করেও গুটিপাঁচেক প্রকাণ্ড 'আইসফল' বা তুষারপ্রপাত। কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। তবু আমরা তারই মধ্যে ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা করতে করতে এগিয়ে চলি।

বিকেল নাগাদ একফালি নিরাপদ সমতল পাওয়া গেল। সেখানেই এক নম্বর শিবির স্থাপন করা গেল। তাঁবু টাঙ্গানো হয়ে যাবার পরেও কিন্তু আমরা ভেতরে ঢুকলাম না। হিমেল হাওয়ার দাপাদাপিকে উপেক্ষা করে বাইরে দাঁড়িয়ে রইলাম। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ব্রহ্মা ও ব্রহ্মাণীকে দেখতে থাকলাম। দেখলাম ব্রহ্মা শিখরে হিমানী সম্প্রপাত (Avalanche) আর চারিদিকের বিচিত্র বিশাল ও বিস্ময়কর রূপ। দেখতে দেখতে একসময় ব্রহ্মলোকে আঁধার নেমে এলো। আমরা তাঁবুর ভেতরে চলে এলাম।

পরদিন অর্থাৎ ২৪শে সেপ্টেম্বার সকালেই শিবির গুটিয়ে আবার হিমবাহপথে এগিয়ে চললাম। দুপুর নাগাদ পৌঁছলাম বালি ও পাথর বিছানো একটা ঢালু জায়গায়। দেখতে পেলাম ১৯৭৯ সালের সফলকাম জাপানী ব্রহ্মা-১ অভিযানের কিছু জিনিসপত্র। আবহাওয়া খারাপ হয়ে আসছে দেখে আমরা সেখানেই দু-নম্বর শিবির প্রতিষ্ঠা করলাম।

তারপরে প্রবল ঝড় ও তুষারপাতের জন্য দুটি দিন সেই শিবিরে বন্দী হয়ে থাকতে হল। ২৭শে সেপ্টেম্বার আবহাওয়ার একটু উন্নতি হলে আমরা শিবির গুটিয়ে এগিয়ে চলি। বেশ কিছুক্ষণ কষ্টকর পদযাত্রার পরে পৌঁছলাম 'আইগার' শিখরের পাদদেশে। সেখানে একটু বিশ্রাম নিয়ে আবার চললাম এগিয়ে। উপস্থিত হলাম ব্রহ্মা-২ (৬০০২ মিঃ) পর্বতের পাশে।

পিতামহকে প্রণাম করে আবার চলি এগিয়ে। পৌঁছই 'প্লেটু' ও ক্রুকেড ফিঙ্গার (৫৬৩০ মিঃ) শৃঙ্গদ্বয়ের কাছে। উচ্চতা কম হলেও প্লেটু পর্বতশিখরটি বড় ভাল লাগে আমাদের। এখানেও জাপানী অভিযাত্রীদের কিছু পরিত্যক্ত জিনিসপত্র পড়ে রয়েছে।

আমরা আবার এগিয়ে চলি। এবং অবশেষে পেঁাছই ব্রহ্মলোকের উচ্চতম পর্বতশিখর 'সিক্‌ল মুন' শৃঙ্গের কাছে। গঠনবৈচিত্র্যে এই অঞ্চলটি অভিনব। দু-দিকের প্রতিটি পর্বতের গা বেয়ে হিমবাহ নেমে এসেছে। তারা এসে মিলিত হয়েছে এখানে। আর এখান থেকে বাঁদিকে তাকালে অর্ধবৃত্তাকারে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রয়েছে 'আইগার', 'প্লেটু', 'ক্রুকেড-ফিঙ্গার', 'সিক্‌ল-মুন' 'ফ্ল্যাট-টপ্‌' ও ব্রহ্মা-২। আর ডানদিকে ব্রহ্মা-১ ও ব্রহ্মাণী। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আর কোথাও একসঙ্গে এতগুলি তুষারাবৃত শিখর দেখা যায় বলে শুনি নি। আমরা তাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখি। দেখি আর দেখি। দেখতে দেখতে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। আমরাও ফিরে আসি তাঁবুতে।

পরদিন ২৮শে সেপ্টেম্বার শুরু হয় ফেরার পালা। কিন্তু সেকথা বলবার মতো সময় নেই এখন। রাত এগারোটা বাজে, আসুন এবারে আলো নিবিয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করা যাক।

শৈলেশ চুপ করে। আমি স্লীপিং ব্যাগের জীপ টেনে দিই।

॥ সাত ॥

মেট তার কথা রেখেছে। কিন্তু আমরা কথা রাখতে পারলাম না। মেট মালবাহকদের নিয়ে ঠিক সকাল আটটায় হাজির হয়েছে। কিন্তু আমরা এখনও তৈরি হতে পারি নি।

মেট পনেরোজন মালবাহক নিয়ে এসেছে। কেউ তরুণ, কেউ যুবক, কেউবা প্রৌঢ়। তবে সবাই স্বাস্থ্যবান। একজন হিন্দু, বাকি সবাই মুসলমান। পোশাক ও চেহারা দেখে বোঝার উপায় নেই। নাম শুনে জানা গেল, প্রৌঢ় লোকটি হিন্দু, নাম নাথুরাম ঠাকুর। অর্থাৎ মহেশবাবুর মতো নাথুরামও রাজপুত।

গৌতম শিবু ও তপন মালবাহকদের নাম লিখে নিয়ে তাদের বোঝা বুঝিয়ে দিল। ওরা পিঠে মাল তুলে রওনা হয়ে গেল। আমাদের রওনা হতে ন'টা বেজে গেল।

খুবই দেরি হয়ে গেল। কারণ শুনেছি আজকের পথ যেমন দীর্ঘ, তেমনি দুর্গম। দশ মাইলে পাঁচ হাজার ফুট ওপরে উঠতে হবে এবং পথে প্রচুর উৎরাই পড়বে। তাছাড়া কিশ্‌তোয়ার পৌঁছবার পর থেকেই দেখছি, বিকেলের দিকে আবহাওয়া খারাপ হয়ে যায়।

কিন্তু দেরি যখন হয়েই গেছে, তখন আর আপসোস করে কি হবে? তার চাইতে চলতে চলতে আরেকবার সোন্দারকে দেখে নেওয়া যাক।

বিশ্রামভবন থেকে নেমে এলাম নিচে। বাঁদিকে একটা বাড়ি, তারপরেই ভুট্টা ক্ষেত। ক্ষেতে চাষীরা কাজ করছিল। তারা কাজ ফেলে আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকে। রঞ্জু বলে ওঠে—জয়, ব্রহ্মাজীকি জয়।

ওরাও জয়ধ্বনিতে সাড়া দেয়। আমরা হাত নেড়ে এগিয়ে চলি।

ভুট্টাক্ষেত পেরিয়ে ধানক্ষেত। এখানেও দেখছি ধানক্ষেতে আল

রয়েছে। তারই ওপর দিয়ে চলেছি। হিমালয় অভিযানে এসে ধানক্ষেতের ভেতর দিয়ে পথচলা বিচিত্র ব্যাপার তবে তমসা উপত্যকা অভিযানে গিয়ে এ সুযোগ পেয়েছিলাম। তারপরে চোদ্দ বছর পরে আবার এমন সুযোগ পাওয়া গেল। *

ধানক্ষেতের পরে একফালি সবুজ ও সমতল ময়দান। তার একপাশে পাথর বাঁধানো বেদি। বেদির মাঝখানে পতাকাদণ্ড। বোধকরি বিশেষ বিশেষ দিনে গাঁয়ের মানুষ এখানে সমবেত হন। তখন পতাকা উত্তোলন করা হয়।

ময়দানের সামনেই স্কুল—প্রাইমারী স্কুল। সোন্দারে কোন হাইস্কুল নেই। হাইস্কুল রয়েছে সুয়েদ গ্রামে।

গতকাল আমরা পথ থেকে এই স্কুল বাড়িটি দেখেছি। কিন্তু সেটা পেছনের দিক। এখন সামনে এসেছি। তবে ছাত্র-ছাত্রী দেখতে পাচ্ছি না। মেট জানায়—বেলা এগারোটায় স্কুল বসবে। ছেলে-মেয়েরা একসঙ্গে পড়ে এখানে। ক্লাশ ফোর পর্যন্ত পড়তে পারে। তারপরে সুয়েদ হাইস্কুলে যায়।

চেনাবের তীর থেকে যে সুবিস্তীর্ণ সমতল আস্তে আস্তে উঁচু হয়ে পাহাড়ে মিশেছে, তারই বুকে বিশ্রামভবন ক্ষেত ও স্কুল। স্কুলের পরে আরও খানিকটা ধানক্ষেত, তারপরে পাহাড়। আমরা তার পাদদেশে পৌঁছলাম।

পাহাড়টা মোটেই খাড়া নয়, আস্তে আস্তে উঁচু হয়েছে। আর তাই তার গায়ে বাড়িঘর আর ক্ষেত-খামার।

সামান্য চড়াই পথ বেয়ে আমরা সারি বেঁধে ওপরে উঠতে আরম্ভ করি। খানিকটা উঠে মন্দির। তারপরে এক গুচ্ছ ঘর। পথটা এখান থেকে ডানদিকে চলে গেছে। মেট বলে-এটাই বাজারের পথ।

গতকালই আমাদের বাজার করা হয়ে গেছে। তাই বাজারের পথে না গিয়ে বাড়ি-ঘরের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলি। পারি না।

---

* লেখকের 'তমসার তীরে তীরে' বইখানি দ্রষ্টব্য

গায়ের মানুষ এসে ঘিরে ধরেন আমাদের। বাপ কাকা ও দাদাদের সঙ্গে ছোট-ছোট ছেলে-মেয়েরাও আছে। মহিলারা ঘরের ভেতর থেকে উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছেন। ঘরগুলি সবই দোতলা, কাঠ আর পাথর দিয়ে তৈরি। নিচের তলায় গরু-ভেড়া আর ওপরতলায় মানুষ থাকে।

ছোটরা মিঠা চায়, বড়রা দাওয়াই। রঞ্জু রুক্‌স্যাক্ নামায়। জনগণের প্রয়োজনে গতকাল তুটো জিনিসই তার রুক্‌স্যাকে ভরে দেওয়া হয়েছে।

কাজটা কিন্তু মেটসাবের পছন্দ হয় না। সে রঞ্জুকে বলে—ভুল করে ফেললেন সাব্! এক্ষুনি দলে দলে লোক ছুটে আসবে। এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে, আরও দেরি হয়ে যাবে।

—কিন্তু ডাক্তারসাব যখন রুক্‌স্যাক্ নামিয়ে ফেলেছে, তখন এদের মিঠা ও দাওয়াই দিতেই হবে মেট! নেতা বলে—তুমি বরং দেখো, যাতে আর বেশি মানুষ ভিড় না করে।

মেট সেই চেষ্টাই করতে থাকে। বার বার বলে—এখন সময় নেই, ফেরার পথে সবাই দাওয়াই পাবে।

অসহায় ও রুগ্ন মানুষগুলি কিন্তু তবু অনুরোধ করতে থাকে। রঞ্জু বলে—মেট, তুমি লীডারসাবকে নিয়ে এগিয়ে যাও। আমরা এদের দাওয়াই দিয়েই তোমাদের অনুসরণ করছি। বেশি দেরি হবে না।

শুধু নেতা নয়, সেই সঙ্গে আমরাও নেতার সঙ্গী হই। কেবল শিবু আর সহনেতা ডাক্তারের সঙ্গে থেকে যায়।

যাবার সময় নেতা বলে—বেলা একটা নাগাদ কোন জলের জায়গায় আমরা লাঞ্চের জন্য থামব।

সহনেতা সহাস্যে বলে—তার অনেক আগে আমরা তোমাদের ধরে ফেলব লীডার!

আমরা কথা না বাড়িয়ে এগিয়ে চলি। গ্রামবাসীরাই পথ দেখিয়ে দেন।

পথ বলে কিছু নেই অবশ্য এখানে। একটা নালার ওপর দিয়ে

ওপরে উঠছি। নালায় শুধু জল নামছে না, সেই সঙ্গে নোংরা। অর্থাৎ এটি গ্রামের নর্দমাও বটে। কি করব, পথটা যে বাজার হয়ে অনেক ঘুরে ওপরের পথে মিশেছে। আর এটা প্রায় সোজাসুজি ওপরে উঠেছে।

তাছাড়া সে পথ এর চেয়ে পরিষ্কার, তাইবা কে বলতে পারে? এ পথে যেমন নর্দমার নোংরা, সে পথে তেমনি থাকবে অশ্ববিষ্ঠা। হিমালয়ের গ্রামে যেমন নোংরা নিষ্কাশনের ব্যবস্থা নেই, তেমনি নেই পথ পরিষ্কারের বন্দোবস্ত। ফলে স্বাস্থ্যকর স্থানে বাস করেও এঁরা নিত্য নানা রোগের শিকার। স্বাস্থ্য খাতে সরকার শত শত কোটি টাকা খরচ করছেন কিন্তু হিমালয়ের ভাগ্যে তার ছিটেফোঁটাও জুটছে না।

কিন্তু কার কাছে কৈফিয়ৎ চাইব? সেদিন বাটসাহেব তো বললেন নেতাদের কথা। যে দেশে মানুষের চেয়ে ভোটের দাম বেশি, সে দেশের এমন হাল তো হবেই। অতএব নিঃশব্দে নর্দমাপথে এগিয়ে চলি।

গ্রামের ঘরগুলি কয়েকটি স্তরে অবস্থিত। পাহাড়টির গঠনের জন্যই এমন হয়েছে। একটি স্তর ছাড়িয়ে আমরা আরেকটি স্তরে এসে উপস্থিত হয়েছি। তবে এখানে ঘরের সংখ্যা আগের চেয়ে কম। গ্রামবাসীরা কেউ পথে কেউ বা দাওয়ায় দাঁড়িয়ে নমস্কার করেন, ব্রহ্মাজীর কাছে আমাদের কুশল কামনা করেন।

তাঁদের ধন্যবাদ দিয়ে এগিয়ে চলি। জনৈক যুবক বাধা দেন! একজন বৃদ্ধকে দেখিয়ে বলেন—এঁর নাম অমরচাঁদ। ইনি বনিংটনসাবের সঙ্গে ব্রহ্মাজীতে গিয়েছিলেন। তাঁদের পাচকের কাজ করেছেন।

—তাহলে তো ইনি শিখরের পথ জানেন। জয় বলে।

নেতা মাথা নাড়ে, সেই কথাই জিজ্ঞেস করে বৃদ্ধকে।

বৃদ্ধ মাথা নাড়েন। বলেন—না। আমি শিখরের পথ জানব কেমন করে? আমি যে মূল-শিবিরে ছিলাম। তাছাড়া বনিংটনসাব তো শিখরে আরোহণ করেন নি!

—সে কি! আমরা সবিস্ময়ে বলে উঠি।

বৃদ্ধ আবার মাথা নেড়ে বলেন—না। ওঁরা শিখরে চড়েন নি।

—কিন্তু আমরা তো রিপোর্টে পড়েছি ওঁরা আরোহণ করেছেন।

—গলতী রিপোর্ট, ঝুটা রিপোর্ট…। বৃদ্ধ রীতিমত উত্তেজিত হয়ে পড়েন। উত্তেজিত স্বরেই বলেন—শুধু বনিংটনসাব নন, কেউ ব্রহ্মাজীতে চড়েন নি, কেউ চড়তে পারবেন না। ব্রহ্মাজীর শিখরে কি মানুষ উঠতে পারে?

প্রতিবাদ না করাই ভাল। তাই নেতা শান্তস্বরে বলে—তাহলে আপনি আমাদের সঙ্গে যাচ্ছেন না?

—না। বৃদ্ধ বলেন—গিয়ে কি হবে? আমি যে পথ জানি না। তাছাড়া আমার বয়স হয়েছে। এখন আমার পক্ষে অত উঁচুতে গিয়ে থাকা সম্ভব নয়।

—তাহলে আমরা আসি। নেতা হাতজোড় করেন।

বৃদ্ধ এবং তাঁর প্রতিবেশীরাও নমস্কার করেন। আমরা ওঁদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এগিয়ে চলি। মনে মনে ভাবি—বিশ্বাস মানুষকে কোথায় নিয়ে যায়। এঁরা বিশ্বাস করেন ব্রহ্মা দেবশিখর। সে মনুষ্য-পদলাঞ্ছিত হতে পারে না। অতএব ক্রিস্ বনিংটন শিখরে আরোহণ করেন নি।

কয়েক মিনিট চড়াই ভেঙে মূল-পথে উঠে আসি। এই পথের পাশে গ্রামের তৃতীয় স্তর। তবে বাড়ি কম, ক্ষেতই বেশি। পাহাড়ের গা দিয়ে প্রায় সমান্তরাল সংকীর্ণ পথ। নিচে আর ওপরে পাহাড়ের ঢালে ক্ষেত। তারই মাঝে একটি বাংলো এবং কয়েকখানি বাড়ি। বেশ ভাল ভাল দোতলা বাড়ি।

বাড়ির লোকেরা হাত নেড়ে আমাদের অভিনন্দন জানাচ্ছে, আমরাও চলতে চলতে হাত নাড়ছি।

এখান থেকে সমস্ত সোন্দার উপত্যকা ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে। এমন কি গতকালের চেয়েও সুন্দর। কারণ আজ ওপর থেকে দেখছি। নিচের ক্ষেতগুলিকে রঙীন গালিচা বলে মনে হচ্ছে। তবু যেন

গতকালের মতো ভালো লাগছে না।

লাগবে কেমন করে? গতকাল যে সুন্দর সোন্দারের সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয়েছিল। প্রথম ভালোবাসার স্মৃতি মনের মুকুরে অক্ষয় হয়ে থাকে।

তাহলেও তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি। দেখি এপারের গ্রাম আর ওপারের পাহাড়, দুয়ের মাঝে চেনাব আর দূরের সুয়েদ। দেখি কিবার আর নান্থ নালাকে। আজও মনে হচ্ছে, একখানি প্রাণময় রঙ্গীন ছবি, যে ছবি কথা বলে চলেছে অনন্তলোকের কানে কানে।

কেবল দেখতে পাচ্ছি না কিয়ার নালাকে। না পাই, যা দেখতে পাচ্ছি, তা-ই যে আমাকে পুলকে আপ্লুত করে তুলছে। আমার হৃদয় এক অনির্বচনীয় আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

কিন্তু নেতা তাগিদ দেয়। সে ঠিকই বলেছে, এখানে দাঁড়িয়ে বেশিক্ষণ দেখার সময় নেই আমাদের হাতে। আজ দীর্ঘ ও দুর্গম পথ পারি দিতে হবে। এমনিতেই রওনা হতে দেরি হয়ে গেছে। অতএব এগিয়ে চলি।

পারি না। পাশের বাড়ির দোতলায় দাঁড়িয়ে জনৈকা মহিলা মধুর কণ্ঠে প্রশ্ন করেন—মহারাজ, কোথায় চলেছেন?

'মহারাজ' শব্দটা শুনে সঙ্গীরা চমকে ওঠে। শৈলেশ জিজ্ঞেস করে—ভদ্রমহিলা আপনার নাম জানলেন কেমন করে?

হেসে বলি—উনি জেনে বলেন নি। বোধকরি গাড়োয়ালীদের মতো এঁরাও অপরিচিতকে 'মহারাজ' বলে সম্বোধন করে থাকেন।

আমাদের উত্তর না পেয়ে ভদ্রমহিলা আবার প্রশ্ন করেন—আপনারা কোথায় চলেছেন মহারাজ!

—ব্রহ্মাজী। জয় উত্তর দেয়।

সঙ্গে সঙ্গে কপালে হাত ঠেকান তিনি ও তাঁর ছেলে-মেয়েরা। তারপরে বলেন—কিন্তু এত দেরি করে এলেন কেন? শীত এসে গেল যে! বথরিওয়ালারা পর্যন্ত নিচে নামতে শুরু করে দিয়েছে!

সেই এক কথা, এক ভাবনা আর এক দুশ্চিন্তা। অথচ এঁরা

আমাদের শুধু অপরিচিতা নন, আমাদের সম্পর্কে কিছুই জানা নেই এঁদের।

তাড়াতাড়ি তাঁর ঘরের কাছে এগিয়ে আসি। তাঁকে আশ্বস্ত করে তুলতে জবাবদিহি করি—খাস শীত আসতে এখনও মাসখানেক দেরি আছে। তারই মধ্যে আমরা ব্রহ্মাজীর পুজো দিয়ে, বরফ পড়া শুরু হবার আগেই, ফিরে আসব আপনাদের কাছে।

—তাই আসবেন বাবা! ব্রহ্মাজী আপনাদের মঙ্গল করবেন। তিনি কপালে হাত ঠেকিয়ে পিতামহের উদ্দেশে প্রণাম জানান। ছেলে-মেয়েরাও তাই করে।

আমরা তাঁকে নমস্কার জানিয়ে এগিয়ে চলি আর ভাবি—সত্যি কি বিচিত্র এই দেশ। যে দেশের পথে-প্রান্তরে এমন অনাবিল ভালোবাসা, সেই দেশে কেন এত হিংসা, এত অশান্তি?

রাস্তাটা ডাইনে বাঁক ফিরেছে। কৃষ্ণ বলে—এখান থেকে সোন্দার-সুয়েদ উপত্যকাকে শেষবারের মতো দেখে নিন।

—তাছাড়া···। গৌতম যোগ করে—এখান থেকেই নিচে উপত্যকা আর নদীকে সবচেয়ে সুন্দর দেখায়।

হয়তো তাই। কিন্তু আমি ঠিক বুঝতে পারি না। আমার মনে হচ্ছে, একই রকম। আগেও সুন্দর, এখনও সুন্দর—সোন্দার সর্বদা সুন্দর।

অবশেষে সুন্দর সোন্দারের কাছে নিতে হল বিদায়। এ বিদায় সাময়িক, আমরা আবার আসব ফিরে, আসবো পিতামহ ব্রহ্মার বরমাল্য নিয়ে।

আমরা ডাইনে বাঁক নিলাম, সঙ্গে সঙ্গে সোন্দার অদৃশ্য হল। সামনে সংকীর্ণ এবড়োখেবড়ো পথ। ডানদিকে বনময় পাহাড় আর বাঁদিকে কিবার নালা। আমাদের এই ওঠা-নামা আর ঘোরাঘুরির ফাঁকে কখন কিবার যে পাশটিতে এসে হাজির হয়েছে, তা টের পাই নি।

না পাই গে। এখন থেকে কিবার থাকবে আমার পাশে পাশে,

রইবে আমার পথপ্রদর্শক হয়ে। তারই তীরে তীরে পথ চলে পৌঁছব ব্রহ্মলোকে।

বাটোট থেকে চন্দ্রভাগার তীরপথে এসেছি বাণ্ডারকোট, সেখান থেকে চেনাবের পাশে পাশে সোন্দার। এবারে কিবারের তীরে তীরে শুরু হল পথচলা। এই উচ্ছ্বসিত জলধারার উৎসমুখের অনতিদূরে প্রতিষ্ঠিত হবে আমাদের ব্রহ্মা পর্বতাভিযানের মূল-শিবির।

কিশ্‌তোয়ার-হিমালয় অবহেলিত হলেও ব্রহ্মাপর্বত পর্বতারোহীদের পরমপ্রিয় পর্বতশিখর। ১৯৭৩ সালে ক্রিস্ বনিংটনের সফলকাম অভিযানের পরেও বিভিন্ন দেশ থেকে দলে দলে পর্বতারোহী ব্রহ্মা পর্বতাভিযানে এসেছেন। ১৯৭৮ সালে আরেকদল বৃটিশ অভিযাত্রী আসেন। চারজনের এই অভিযাত্রীদলের নেতৃত্ব করেন এ্যাণ্টনী হুইটেন। অপর সদস্যরা হলেন—ডানকান নিকল্‌সন্, জন স্কট এবং পল বেল্‌চার। তাঁরা গিয়েছিলেন সত্তরচিনের পথে।

অভিযাত্রীরা ২৮শে জুলাই মূল-শিবির ও ৩১শে জুলাই ব্রহ্মা হিমবাহে অগ্রবর্তী মূল-শিবির প্রতিষ্ঠা করেন। তারপরে তাঁরা দক্ষিণ গিরিশিরার সংকীর্ণ টোল (South Col) ধরে ১৯০০০ ফুট (৫৭৯১ মিঃ) পর্যন্ত আরোহণ করেন। সেখান থেকে পাথুরে পর্বতগাত্র বেয়ে ২০,০০০ ফুটে (৬০৯৬ মিঃ) পৌঁছন।

তাঁরা দুটি দড়িতে বিভক্ত হয়ে চূড়ান্ত সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। নেতা এবং পল প্রথম দড়িতে, জন এবং ডানকান দ্বিতীয় দড়িতে অগ্রসর হন। নেতা এবং পল তুষারক্ষেত্রের ওপর দিয়ে শিখরের দিকে এগিয়ে চলেন।

অবশেষে তাঁরা শিখরে উপস্থিত হন। সেদিনটি ছিল ১৫ই আগস্ট।

কিছুক্ষণ শিখরে অবস্থান করার পরে নেতা ও পল অবরোহণ শুরু করেন। নেমে আসার পথে তাঁদের সঙ্গে জন ও ডানকানের দেখা হয়। নেতা সুসংবাদ দিয়ে তাঁদেরও শিখরে আরোহণ করতে বলেন। উৎসাহিত হয়ে তাঁরা চলার বেগ বাড়িয়ে দেন।

কিছুদূর নেমে আসার পরে নেতা দেখতে পেলেন জন এবং ডানকান শিখরে পৌঁছে গেছেন। পুলকিত অন্তরে তিনি পল্‌কে নিয়ে শিবিরে ফিরে আসেন। গরম পানীয় তৈরি করে নিজেরা খান, সহযাত্রীদের জন্য রেখে দেন। ওঁদের পথ চেয়ে তাঁবুতে বসে থাকেন।

ওঁরা আসেন না। দিনের আলো মিলিয়ে যায়, নেমে আসে রাত। রাতের পরে ভোর হয়। কেটে যায় দিন। তারপরে আরও একদিন। কিন্তু তাঁদের প্রতীক্ষার অবসান হয় না, প্রিয় সহযাত্রীরা ফিরে আসেন না।

প্রকৃতি আর শান্ত থাকতে পারেন না। আবহাওয়া খারাপ হয়ে যায়। শুরু হয় তুষারপাত। তারই মধ্যে ২০শে আগস্ট নেতা ও পল 'সাউথ কল্‌' পর্যন্ত খোঁজাখুঁজি করেন। কিন্তু নিখোঁজ সতীর্থদের কোন চিহ্ন দেখতে পান না।

সেখানেই অন্বেষণ শেষ হয় না। রাজ্যসরকারও পরে পুলিশ দপ্তরের কয়েকজন পর্বতারোহীকে অনুসন্ধানে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু বহু খোঁজাখুঁজি করেও তাঁরা অভিশপ্ত পর্বতারোহীদের খুঁজে পান নি। তাঁদের অনুমান জন ও ডানকান শিখর থেকে নেমে আসার পথে পড়ে গিয়েছেন, ব্রহ্মলোকের যাত্রীরা পিতামহ ব্রহ্মার পদতলে স্থায়ী আসন নিয়েছেন।

—শঙ্কুদা, সামনে তাকিয়ে দেখুন, কি অপরূপ দৃশ্য !

জয়ের কথায় ব্রহ্মাজীর কথা থামাতে হয়। আমি ওদের কাছে ১৯৭৮ সালের বৃটিশ ব্রহ্মা অভিযানের কথা বলছিলাম। এবারে সামনে তাকাতে হয়।

জয় ঠিকই বলেছে। কিবার সত্যই অপরূপ। আমরা ইতিমধ্যে তার অনেকটা কাছে নেমে এসেছি। দু-দিকে পাহাড়, মাঝখান দিয়ে কিবার নাচতে নাচতে নিচে নামছে। নদী নয় যেন কতগুলো স্ফটিকের সিঁড়ি, তাই বেয়ে ব্রহ্মবারি নেমে আসছে মর্ত্যলোকে। মুক্তাধারার ওপরে একটি কাঠের পুল। সেই পুল পেরিয়ে পথ। সত্যই অপরূপ।

কয়েক মিনিট হেঁটে পুলের ওপরে উঠে আসি। এখান থেকে কিবারকে আর সুন্দর দেখাচ্ছে। তবে সেই সঙ্গে ভয়ঙ্করও মনে হচ্ছে। দুর্বার বেগে ফেনিল জলরাশি পুলের তলা দিয়ে বয়ে চলেছে। পুলের ওপরে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ বেশ একটা রোমাঞ্চ অনুভব করা গেল। জগদীশ তপন ও রঞ্জু প্রাণভরে ছবি নিল। আর তারপরেই গৌতম ও শিবু রঞ্জুকে নিয়ে আমাদের ধরে ফেলল। আবার সবাই একসঙ্গে সারি বেঁধে এগিয়ে চলি।

আস্তে আস্তে চলতে হয়। কারণ সংকীর্ণ এবড়োখেবড়ো চড়াই পথ। এতক্ষণ নদী আমাদের বাঁয়ে ছিল, এখন ডাইনে। এতক্ষণ বনের ভেতর দিয়ে এসেছি, এখন পথের পাশে খাড়া পাহাড়। গাছপালা খুবই কম। তবে আজও মেঘলা আকাশ, রোদের তেমন তেজ নেই। চলতে আরাম লাগছে। কিন্তু সেই সঙ্গে দুশ্চিন্তা না করে পারছি না। বৃষ্টি নামলে বিপদে পড়ব।

কিন্তু বৃষ্টি নয়, ব্রহ্মা পর্বতাভিযানের প্রসঙ্গই আবার ফিরে আসে। শৈলেশ বলে—১৯৭৯ সালেও তো একদল জাপানী অভিযাত্রী ব্রহ্মা পর্বতাভিযানে এসেছেন ?

—হ্যাঁ। আমি উত্তর দিই। বলি—তাঁরা সিক্ল মুন ও ব্রহ্মা পর্বতে আরোহণ করেছেন।

—তাহলে তাঁদের কথা বলুন। গোরা অনুরোধ করে।

আমি শুরু করি—আটাত্তর সালের দুর্ঘটনাও কিন্তু ব্রহ্মা পর্বতের প্রতি পর্বতারোহীদের আকর্ষণ কিছুমাত্র কমাতে পারে নি। তাই পরের বছর আবার জাপানীরা ব্রহ্মালোকে আসেন।

কিশ্‌তোয়ার হিমালয়ের প্রতি জাপানীদের আকর্ষণ বহুদিনের। ১৯৭১, ১৯৭৩ ও ১৯৭৫ সালে তাঁরা ব্রহ্মালোকে তিনটি অভিযান পরিচালনা করেন। কিন্তু সব কয়টি অভিযান বিফল হয়। তার ওপরে পঁচাত্তর সালের অভিযানে সহনেতা সাতোরু তাকাচি এবং শেরপা আঙ ছাতার শহীদ হন। আর তাই বোধকরি ঊনআশি সালে জাপানের এ্যাল্‌পাইন ক্লাব আবার অভিযানের আয়োজন করেন।

কিশ্‌তোয়ার হিমালয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় শৃঙ্গ সিক্‌ল মুন (৬,৬০৯ মিঃ/২১, ৬৮৬ ফুট) এবং ব্রহ্মা-১ (৬,৪১৬ মিঃ/২১,০৪৯ ফুট) আরোহণের উদ্দেশে দশজনের অভিযাত্রীদল এদেশে আসেন। কাটসুহিকো ডেণ্ডা (Katsuhiko Denda) নামে জনৈক প্রখ্যাত পর্বতারোহী অভিযানের নেতৃত্ব করেন। তাঁরাও সত্তরচিনের পথে গিয়েছেন। ওঁরা এমন জায়গায় মূল-শিবির স্থাপন করেছিলেন, যেখান থেকে দুটি শৃঙ্গে অভিযান চালানো যায়।

অভিযাত্রীরা ১লা সেপ্টেম্বার ৩,৫০০ মিটার (১১,৪৮৩ ফুট) উঁচু সত্তরচিনে মূল-শিবির প্রতিষ্ঠা করেন। অগ্রবর্তী মূল-শিবির ও এক নম্বর শিবির স্থাপিত হয় ব্রহ্মা হিমবাহে যথাক্রমে ৪,০০০ মিটার (১৩, ১২৩ ফুট) ও ৪,২০০ মিটার (১৩, ৭৮০ ফুট) উচ্চতায়। সেখান থেকে তাঁরা অনায়াসে ৪৫০০ মিটার (১৪,৭৬৪ ফুট) পর্যন্ত আরোহণ করেন। কিন্তু তারপরেই একটা তুষার সম্প্রপাতের জন্য তাঁদের অগ্রগতি রুদ্ধ হয়ে যায়। বাধ্য হয়ে তাঁরা বাঁদিকে সরে এসে ২৪০ মিটার (৭৮৭ ফুট) 'ফিক্‌সড রোপ' করে একটা তুষারঢাল অতিক্রম করেন। উপস্থিত হন একখণ্ড তুষারক্ষেত্রে। সেখানে ৪,৮০০ মিটার (১৫,৭৮০ ফুট) উচ্চতায় তাঁরা দু-নম্বর শিবির প্রতিষ্ঠা করেন। তারপরে একটা বরফ পড়ে থাকা পাথুরে গিরি-শিরার ওপরে আরও ১০০০ মিটার (৩২৮১ ফুট) ফিক্‌সড রোপ করে অভিযাত্রীরা ৫,২০০ মিটার (১৭,০৬০ ফুট) উঁচুতে তিন নম্বর শিবির প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হন।

ইতিমধ্যে মূল-শিবির প্রতিষ্ঠার পরে পনেরো দিন কেটে গিয়েছে। অর্থাৎ তিন নম্বর শিবির স্থাপিত হয় ১৫ই সেপ্টেম্বার। তারপরে অভিযাত্রীরা দক্ষিণ-পূর্ব গিরিশিরা ধরে অগ্রসর হয়ে সেই গিরিশিরার ওপরেই ৫,৬০০ মিটার (১৮,৩৭৩ ফুট) উঁচুতে চার নম্বর শিবির প্রতিষ্ঠা করেন। সেখান থকে তাঁরা ব্রহ্মা-১ ও ব্রহ্মা-২ শিখর দুটিকে দেখতে পাচ্ছিলেন কিন্তু তাঁদের লক্ষ্য সিক্‌ল মুন শিখর দেখা যাচ্ছিল না। কারণ ৬৪১৫ মিটার (২১, ০৪৭ ফুট) উঁচু একটি

অনামী শিখর তাকে আড়াল করে রেখেছিল। বাধ্য হয়ে তাঁদের ছ'দিন ধরে আরও ১২০০ মিটার (৩৯৩৭ ফুট) ফিক্সড রোপ লাগিয়ে সেই অনামী শৃঙ্গটিকে অতিক্রম করতে হল।

আর তারপরেই তাঁরা উপস্থিত হলেন একটি প্রকাণ্ড প্রশস্ত তুষার অধিত্যকায়। তারই ওপরে সিক্‌ল মুন শিখরটি যেন সাদা থালায় আইসক্রিম-পিরামিডের মতো বসে রয়েছে। অভিযাত্রীরা সেই অধিত্যকার ওপরে ৬২০০ মিটারে (১০, ৩৪১ ফুট) পাঁচ নম্বর শিবির স্থাপন করলেন। জায়গাটা এত প্রশস্ত ও সমতল যে সেখানে অনায়াসে হেলিকপ্টার অবতরণ করতে পারে। এবং সেখান থেকে শিখর মাত্র ১৩৪৫ ফুট উঁচু।

তাহলেও ২৯শে সেপ্টেম্বার তাঁদের প্রথম প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। অবশ্য পরদিন সাতজন অভিযাত্রী শিখরে আরোহণ করেন। বাকি তিনজন শিখরে আরোহণ করেন তার পরদিন অর্থাৎ ১লা অক্টোবর। ৫ই অক্টোবর তাঁরা সবাই নিরাপদে মূল-শিবিরে ফিরে আসেন। অর্থাৎ শুধু সিক্‌ল মুন শিখরে আরোহণ করতেই জাপানী অভিযাত্রী-দের পাঁচ সপ্তাহ সময় লেগেছে।

—আর সেজন্য তাঁদের ২৪৪০ মিটার অর্থাৎ ৮০০৫ ফুট ফিক্সড রোপ করতে হয়েছে। কৃষ্ণ মন্তব্য করে।

—আমরা মাত্র হাজারখানেক ফুট রোপ নিয়ে এসেছি। শিবুর কণ্ঠে হতাশা।

গৌতম তাকে ভরসা দেয়—কিন্তু ওঁরা তো সিক্‌ল মুন ক্লাইম্ব করেছেন। আমাদের ব্রহ্মা-১ শিখরে অত ফিক্সড রোপ লাগবে না। তাছাড়া ক্রিস্ বনিংটন ফিক্সড রোপ না করেই ব্রহ্মা শিখরে আরোহণ করেছেন এবং আমরা তাঁরই পথে যাচ্ছি।

—না লাগলেই ভাল। শৈলেশ বলে—কিন্তু থাকগে সেকথা। শঙ্কুদা এবারে আপনি জাপানীদের ব্রহ্মা-১ অভিযানের কথা বলুন।

গোরা প্রতিবাদ করে—শঙ্কুদাকে একটু জিরিয়ে নিতে দে! দেখছিস না পথ কিরকম চড়াই।

কথাটা ঠিকই বলেছে গোরা। আজকের পথ পরশুর চেয়ে খারাপ। তবে আজ পা দু-খানি সেদিনের চেয়ে পটু হয়ে উঠেছে, আর দমও কিছু বেড়েছে বোধকরি। তাই আজ অত কষ্ট হচ্ছে না। তাছাড়া আজ আমরা গল্প করতে করতে পথ চলেছি। চলতে চলতে আমি ওদের ১৯৭৯ সালের জাপানী অভিযানের কথা বলছিলাম।

একটু হেসে গোরাকে বলি—হিমালয়ের পথে হিমালয়ের গল্প করলে শ্রান্তি বাড়ে না, বরং কমে যায়।

—তাহলে বলুন জাপানীদের ব্রহ্মা-১ শিখরে আরোহণের কাহিনী। রঞ্জু আমাকে বলে। সে-ও শৈলেশের দলে। আর জয় টুলটুল এবং নেতা মাথা নেড়ে সমর্থন জানায় তাকে।

তবু শুরু করতে পারি না। তার আগেই কৃষ্ণ বলে ওঠে—মনে হচ্ছে কিবার গাঁও এসে গেল। সামনের ঐ বাঁকটা পার হলেই বাড়ি-ঘর দেখা যাবে।

জগদীশ তপন ও সহনেতা সমর্থন করে তাকে। আমরা তাড়াতাড়ি পা চালাই।

ওদের অনুমান বোধ করি মিথ্যে নয়। কারণ ইতিমধ্যে উপত্যকাটি প্রশস্ত হয়েছে। বাঁদিকের পাহাড়গুলি অনেকটা দূরে সরে গিয়েছে। ডানদিকে পথের পাশে নদীর ধারে ছোট ছোট ক্ষেত, রামদানা আর ভুট্টার ক্ষেত। পথের ধারে বড় বড় গাছ। তাদের ডালে ডালে অন্যান্য গাছের ডাল-পালাকে মালার মতো ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। শীত আসছে, তাই জ্বালানী সঞ্চয় করে রাখা হচ্ছে। অর্থাৎ মনুষ্য বসতির লক্ষণ সুস্পষ্ট।

চড়াই পথের শেষে বাঁক ফিরতেই গ্রাম দেখতে পেলাম। কিবার নালার তীরে কিবার গাঁও—এ পথের শেষ গ্রাম। উচ্চতা ৭০০০ ফুট অর্থাৎ ২১৩৪ মিটার। সোন্দার থেকে দূরত্ব ৮ কিলোমিটারের মতো। আট কিলোমিটারে দেড় হাজার ফুট ওপরে উঠে এসেছি। তিনঘণ্টার মতো সময় লেগেছে। পরশুদিনের তুলনায় খুবই তাড়াতাড়ি এসেছি। তবে গতকাল সোন্দারে একটি ছেলে বলেছে, ওদের নাকি

আসার সময় দু ঘণ্টা ও যাবার সময় এক ঘণ্টা সময় লাগে।

তা হোক্ গে। ওরা হিমালয়ের সন্তান। ওদের কথা আলাদা। কিন্তু আমরাও একটানা হেঁটে দুপুর নাগাদ এখানে পৌঁছে গেলাম, এ কিছু কম কৃতিত্বের নয়। তাই নেতা বলে—এখানে একটু বিশ্রাম করে নেওয়া যাক।

---করতেই হবে। শিবু যোগ করে—ঐ দেখুন, গাঁয়ের মানুষ আমাদের স্বাগত জানাতে আসছেন।

তাকিয়ে দেখি সত্যই তাই। কয়েকজন মানুষ সারি বেঁধে নেমে এলেন পথে। সামনের প্রৌঢ় মানুষটি হাতজোড় করে নমস্কার জানায়। তাঁর দেখাদেখি সবাই হাতজোড় করেন। আমরাও প্রতিনমস্কার করি।

প্রৌঢ় বলেন---আমার নাম নারায়ণদাস। পাশের এই বাড়িটাই আমার। গতকালই আমরা শুনেছি আপনাদের কথা। চলুন, আমার বাড়িতে বসে একটু বিশ্রাম করে নেবেন।

এমন আন্তরিক আমন্ত্রণ উপেক্ষা করা যায় না। তাই নেতা ওঁদের আতিথ্য গ্রহণ করে। ক্ষেতের ঢাল বেয়ে আমরা পথ থেকে উঠে আসি নারায়ণদাসের ঘরে। ঘরে বলা ঠিক হল না, আমরা দাওয়ায় বসি। ওঁরা আগেই কম্বল বিছিয়ে রেখেছিলেন। শুধু তাই নয়, একটা ঝুড়িতে আপেল পর্যন্ত রেখে দিয়েছেন।

তারই একটা আপেল তুলে খেতে খেতে গ্রামটিকে দেখি। সম্পূর্ণ সমতল নয়। পাহাড়ের ঢালে গ্রাম। তবে খুবই আস্তে আস্তে নিচে নেমেছে। পাহাড়ের পাদদেশ থেকে কিবারের তীর পর্যন্ত প্রসারিত। নদীর ওপারে কিন্তু পাইন গাছে ছাওয়া খাড়া পাহাড়। নদীটাও গ্রাম থেকে খুব নিচে নয়। ফলে নদীর বিরামহীন গর্জন গ্রামখানি সর্বদা মুখরিত।

গ্রামবাসীরা জানান তেইশটি পরিবার বাস করেন এই গ্রামে, সব মিলিয়ে শ' দেড়েক মানুষ। সবাই রাজপুত। গ্রামের মাত্র দুজন যুবক সেনাবাহিনীতে কাজ নিয়ে বাইরে থাকেন। বাকি সবারই জীবিকা চাষাবাদ। কিবার নালার তীরে একমাত্র গ্রাম কিবার গাঁও।

ফলে এই নদীর তীরে যেখানেই চাষের জমি আছে, তা এঁরাই চাষ করেন।

শুনতে ভাল লাগছিল ওঁদের কথা। কিন্তু কথা থামাতে হল। একটা বেশ বড় এ্যালুমিনিয়ামের ঘটি নিয়ে জনৈক কিশোর আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালো। ছেলেটা আবার দিশী মদ-টদ নিয়ে এলো না তো!

তাকে দেখিয়ে নারায়ণদাস বলেন—পূরণচাঁদ। আমাদের গাঁয়ের ছেলে। স্যুয়েদ হাইস্কুলে পড়ে।

—কোন ক্লাশ? নেতা জিজ্ঞেস করে।

সপ্রতিভ পূরণচাঁদ উত্তর দেয়—ক্লাশ নাইন।

—আমাদের গাঁয়ে কেউ আর এত উঁচু ক্লাশ পর্যন্ত পড়ে নি জনৈক গ্রামবাসী যোগ করেন।

পূরণচাঁদ মাথা নিচু করে। অহঙ্কারে কি লজ্জায়, বুঝতে পারছি না।

—সাবাস। নেতা তার পিঠ চাপড়ে দেয়।

পূরণচাঁদ ঘটিটা নেতার দিকে বাড়িয়ে ধরে বলে—আমাদের গাইয়ের দুধ। মা গরম করে পাঠিয়ে দিলেন। আপনাদের তেষ্টা পেয়েছে।

নেতা দুহাতে ঘটিটি গ্রহণ করে। বলে—এযে এখনও গরম রয়েছে দেখছি! তারপরে একটু থেমে গৌতমকে বলে—রুক্‌স্যাক্‌ থেকে মগ বের করে ভাগ করে খেয়ে নাও। নিজেরা না খেয়ে ছেলেটা আমাদের জন্য দুধ নিয়ে এসেছে।

সহনেতা দুধের ঘটিটি হাতে নিয়ে নেতার নির্দেশ পালন করতে উদ্যোগী হয়।

তপন নেতাকে জিজ্ঞেস করে—ওকে তো কিছু দেওয়া উচিত?

—নিশ্চয়ই! দশটা টাকা দিয়ে দাও।

—কিন্তু টাকা বের করে পূরণচাঁদের দিকে এগিয়ে ধরতেই বিপত্তি বাঁধে। শান্ত মুখচোরা ছেলেটা অশান্ত হয়ে ওঠে। চড়া গলায়

বলে—ভাইসাব আমরা গুর্জর নই, আমরা দুধ বেচি না। আমি আপনাদের কাছে দুধ বেচতে আসি নি। আপনারা আমাদের মেহমান বলে আমার মা খাবার জন্য আপনাদের দুধ পাঠিয়েছেন।

সমবেত গ্রামবাসীরা সকলেই মাথা নেড়ে তাকে সমর্থন করেন। মনে হচ্ছে আমাদের আচরণে তাঁরাও মনে আঘাত পেয়েছেন।

সেই ক্ষত নিরাময় করতে চায় নেতা। সে শান্তস্বরে পূরণচাঁদকে বলে—তুমি ভুল ভেবেছো ভাই! আমরা তোমাকে দুধের দাম দিচ্ছি না। টাকা দিয়ে কি তোমাদের এই ভালোবাসার প্রতিদান দেওয়া যায়, না তা দেওয়া উচিত?

—তাহলে! পূরণচাঁদ প্রশ্ন করে। এখনও তার কণ্ঠস্বরে উষ্মা।

নেতা সবিনয়ে উত্তর দেয়—তুমি তো জানো, আমরা পাহাড়ে এসে ছোট-ছোট ছেলে-মেয়েদের লজেন্স অর্থাৎ মিঠা দিয়ে থাকি।

পূরণচাঁদ মাথা নেড়ে জানায় ব্যাপারটা তার জানা আছে।

এই ফাঁকে অমূল্য গ্রামবাসীদের প্রতিক্রিয়াটি একবার দেখে নেয়। তাঁরাও কেউ কেউ মাথা নাড়ছেন। নিশ্চিন্ত হয়ে নেতা আবার বলতে শুরু করে—কিন্তু এবারে আমাদের মিঠা কম পড়ে গেছে। তাই তোমাকে এই দশটা টাকা দিচ্ছি।

—কিন্তু আমি টাকা দিয়ে কি করব? পূরণচাঁদ পুনরায় প্রশ্ন করে। এবারে তার গলার স্বর শান্ত হয়েছে।

—এখন রেখে দেবে। সুয়েদ যাবার সময় টাকাটা সঙ্গে নিয়ে যাবে। তারপরে যখন বাড়ি ফিরে আসবে, তখন তোমার গাঁয়ের ছেলে-মেয়েদের জন্য দশটাকার মিঠা কিনে আনবে।

পূরণচাঁদের অভিমান দূর হয়। সে হাত বাড়িয়ে টাকাটা নেয়। তপন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।

দুধ খেয়ে সত্যি শরীরে বল ফিরে এলো। ইতিমধ্যে রঞ্জু কিন্তু ডাক্তারী শুরু করে দিয়েছে। খুবই স্বাভাবিক, এখানে রোগ আছে ডাক্তার নেই।

রঞ্জু তার কাজ করুক, আমরা ততক্ষণ গ্রামের কথা শুনে নিই।

ওঁরা বলছেন—আমাদের সমাজে বাল্যবিবাহ নেই। আঠারো-বিশ বছর বয়সে সাধারণতঃ মেয়েদের বিয়ে হয়। অভিভাবকরাই বিয়ে ঠিক করেন তবে ভালোবাসার বিয়েও হয়। কনে কেনার নিয়ম নেই আমাদের সমাজে। বরং মেয়ের বাবাকেই পণ দিতে হয়। ছেলেরা একাধিক বিবাহ করতে পারে কিন্তু বিধবা কিংবা স্বামী-পরিত্যক্তাদের দ্বিতীয়বার বিয়ে হওয়া প্রায় অসম্ভব।

অর্থাৎ হিমালয়ের এই অন্তরলোকেও পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্থা প্রচলিত। আর এখানে বসেও তার প্রমাণ পাচ্ছি। এঁদের পর্দানসীন সমাজব্যবস্থা নয়। তবু পূরণচাঁদের মা নিজে দুধ নিয়ে আসেন নি, ছেলের হাতে পাঠিয়ে দিয়েছেন। শুধু তিনি নন, কোন বউ কিংবা বড় মেয়ে এখানে আসেন নি, তাঁরা দূর থেকে উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছেন।

প্রসঙ্গ পরিবর্তিত হয়। সামাজিক সমস্যার পরিবর্তে অর্থনৈতিক সমস্যার প্রসঙ্গ ওঠে। জনৈক প্রৌঢ় মন্তব্য করেন—শুনতে পাই কাশ্মীরে লক্ষ লক্ষ মানুষ বেড়াতে আসেন। তাঁরা কোটি টাকা খরচ করে যান। সরকারও কাশ্মীরের উন্নতির জন্য কি না করছেন! আর আমাদের অবস্থা তো নিজের চোখে দেখে গেলেন। অথচ আমাদের দেশ কাশ্মীরের চেয়ে কোনমতেই কম সুন্দর নয়। তাহলে কেন আমাদের দেশে মানুষ বেড়াতে আসে না?

কে তার এ প্রশ্নের উত্তর দেবে? চুপ করে থাকি। কিন্তু মানুষটি যদি উত্তর দাবী করেন, তাহলে বিপদে পড়ব।

না, রক্ষা পেয়ে যাই। প্রৌঢ় আর কিছু বলতে পারার আগেই আরেকজন যুবক এসে আমাদের নমস্কার করে। তার হাতে একটা বোঝাই থলি।

নেতার সামনে থলিটি রেখে লোকটি বলে—সাব, আমার নাম মঙ্গতরাম। ঐ দূরে আমার ঘর। আপনারা আমাদের মেহমান। আমি আপনাদের খাবার জন্য সামান্য কিছু ক্ষেতের সবজি নিয়ে এসেছি।

মঙ্গতরাম থলিটা খুলে তার উপহার বের করে—আলু কুমড়ো আর শাক।

নেতা তাকে ধন্যবাদ দেয়। তারপরে জয়কে বলে—ম্যানেজার, ভাগা-ভাগি করে জিনিসগুলো কয়েকজনের রুকৃস্যাকে ভরে নাও। আজও রাতে তরকারী খাওয়া যাবে। পাহাড়ে এসে সবুজ সবজি খেতে পারলে, শরীর ভাল থাকে।

আমি ভাবি অন্যকথা। ভাবি—এতো শুধু সবুজ সবজি নয়, সেই সঙ্গে হিমালয়ের সহজ সরল ও উদার মনের মানুষগুলির মধুর উপহার। হিমালয়ের মানুষ হিমালয়ের মতই মহৎ ও সুন্দর। আমি তাই হিমালয়ে এসে এই প্রাণময় মানুষগুলির প্রাণের পরশে আপন প্রাণকে প্রাণবন্ত করে তুলি। তারপরে এঁদের সুমধুর স্মৃতি দিয়ে হৃদয়ের পাত্র পূর্ণ করে নিয়ে ঘরে ফিরে যাই। শান্ত চিত্তে আবার হিমালয়-ভ্রমণের প্রতীক্ষায় থাকি।

জানি আমার এ প্রতীক্ষা অনন্ত নয়, অনন্ত নয় মানুষের জীবন। অন্তহীন কেবল মানুষের ভালোবাসা। আমি সেই ভালোবাসার উষ্ণ স্পর্শে নিয়ত অভিষিক্ত। এ আমার পরম গৌরব। এ গৌরব যেন আমাকে আমৃত্যু গৌরবান্বিত করে রাখে।

॥ আট ॥

মূল-শিবিরে পাঁচদিন বিশ্রামের পরে ১০ই অক্টোবর (১৯৭৯) জাপানী অভিযাত্রীরা আবার যাত্রা শুরু করলেন। ব্রহ্মা হিমবাহের ওপরে ৩৮০০ মিটারে (১২,৪৬৭´) অগ্রবর্তী মূল-শিবির স্থাপিত হল। সেখান থেকে তাঁরা ব্রহ্মা-১ পর্বতের উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব গিরিশিরা দুটিকে খুব ভাল করে লক্ষ্য করলেন। ক্রিস্ বনিংটন দক্ষিণ-পূর্ব গিরিশিরা দিয়ে শিখরে আরোহণ করেছেন। তাঁদেরও মনে হ'ল সেটাই সহজ হবে। তাঁরা তাই বনিংটনের পথেই শিখরে আরোহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন।...

—কিন্তু শঙ্কুদা, ক্রিস্ বনিংটন তো সত্তরচিন দিয়ে ব্রহ্মা হিমবাহে যান নি?

রঞ্জুর প্রশ্নে থামতে হয় আমাকে। কিছুক্ষণ আগে গ্রামবাসীদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা কিবার গাঁও থেকে রওনা হয়েছি। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আমাকে জাপানীদের ব্রহ্মা পর্বতাভিযানের কথা আরম্ভ করতে হয়েছে।

কিন্তু রঞ্জুর প্রশ্নের জবাব দিতে হয় না আমাকে। আমি কিছু বলতে পারার আগেই কৃষ্ণ বলে---কিবার নালা ও নাস্থ নালা দুটি নদীই এসেছে ব্রহ্মা হিমবাহ থেকে। বনিংটন কিবার নালা ধরে সোনামার্গী হয়ে ব্রহ্মা হিমবাহে পৌঁছোলেন আর জাপানী অভিযাত্রীরা নাস্থ নালা ধরে সত্তরচিন হয়ে ব্রহ্মা হিমবাহে অগ্রবর্তী মূল-শিবির স্থাপন করেছিলেন।...

আর বেশি কিছু বলতে হয় না কৃষ্ণকে। রঞ্জু তার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছে। তাই সে কৃষ্ণকে থামিয়ে দিয়ে আমাকে বলে—আই এ্যাম্ সরি শঙ্কুদা! আমি আপনাকে ডিস্টার্ব করলাম। আপনি বলুন, তারপরে কি হ'ল?

আমি আবার বলতে শুরু করি—জাপানী অভিযাত্রীদের সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণের আরও একটি কারণ ছিল।

—কি? জয় জিজ্ঞেস করে।

উত্তর দিই—সিক্‌ল মুন আরোহণ করতে গিয়ে তাঁদের অধিকাংশ ফিক্‌সড রোপ ফুরিয়ে গিয়েছিল। কারণ নামার সময় তাঁরা সব দড়ি খুলে আনতে পারেন নি। তা ছাড়া সিক্‌ল মুন অভিযানে তাঁদের অন্যান্য সাজ-সরঞ্জামও প্রচুর নষ্ট হয়ে যায়। তাই তাঁরা বনিংটনের পথেই আরোহণ করতে চান। তাঁদের মনে হয় সেই পথে সাজ-সরঞ্জাম কম লাগবে।

একবার একটু থেমে আমি আবার বলতে থাকি—জাপানী অভিযাত্রীরা ব্রহ্মা হিমবাহের দক্ষিণদিকে কিছুদূর অগ্রসর হয়ে ৪২০০ মিটার (১৩,৭৮০´) উঁচুতে এক নম্বর শিবির প্রতিষ্ঠা করলেন। তারপরে হিমবাহের বাঁদিক দিয়ে তাঁরা একসারি তুষার-গহ্বর অতিক্রম করে একটি তুষারাবৃত মালভূমিতে উপস্থিত হন। এখানেই ৪৯০০ মিটারে (১৬,০৭৬´) অভিযানের দু-নম্বর শিবির স্থাপিত হল।

অভিযাত্রীরা দেখতে পেলেন সেখান থেকে সোজাসুজি দক্ষিণ-পূর্ব গিরিশিরায় আরোহণ করা খুবই কষ্টকর। তাই তারা কতগুলো চূড়ার মতো সরু শিখরযুক্ত একফালি তুষারক্ষেত্রের ভেতর দিয়ে (through a group of Pinnacles) অগ্রসর হয়ে একটা স্পার-এর (Spur) ওপর উঠে এলেন। সেটি তাঁদের দক্ষিণ-পূর্ব গিরিশিরায় পৌঁছে দিল। সেখানেই তাঁরা ৫৮০০ মিটার (১৯,০২৯´) উঁচু একটা তুষারশৃঙ্গের ওপর তিন নম্বর শিবির প্রতিষ্ঠা করলেন।

২২শে অক্টোবর একই গিরিশিরার ওপরে ৬১০০ মিটারে (২০, ০১৩´) অভিযানের চার নম্বর শিবির স্থাপিত হল। সেখান থেকে ব্রহ্মা-১ শিখরের উচ্চতা মাত্র ৩১৬ মিটার অর্থাৎ ১০৩৬ ফুট।

পরদিন অর্থাৎ ২৩শে অক্টোবর দুটি দলে বিভক্ত হয়ে আটজন অভিযাত্রী ব্রহ্মা-১ শিখরে জাপানের জাতীয় পতাকা প্রোথিত করলেন।

চার বছর আগে নিহত শহীদদের আত্মা তৃপ্ত হ'ল।

আমার কথা শেষ হয়। কয়েকটা নীরব মুহূর্ত কেটে যায়। তারপরে সহনেতা বলে—তাহলে জাপানী অভিযাত্রীদের ব্রহ্মা-১ শিখরে আরোহণ করতে কতদিন সময় লেগেছে?

একটু ভেবে নিয়ে উত্তর দিই---মূল-শিবির থেকে রওনা হয়ে শিখরে আরোহণ করতে ঠিক চোদ্দ দিন লেগেছে। সেখান থেকে মূল-শিবিরে ফিরে আসতে আরও দু-তিন দিন লেগে থাকবে।

---তার মানে ষোলো-সতেরো দিন। টুলটুল বলে---আমাদেরও তো তাই লাগবে? সে নেতার দিকে তাকায়।

---না। নেতা বলে---আমি মূল-শিবিরে দু-সপ্তাহ থাকব। তোমরা বারোদিন সময় পাচ্ছ।

---তার মানে দশদিনের মধ্যে আমাদের শিখরে আরোহণ করতে হবে, এই তো? সহনেতা নেতার দিকে তাকায়।

---Exactly. নেতা উত্তর দেয়।

---O. K. Leader. সহনেতা সম্মতি জানায়।

---Thank you.

নেতা ও সহনেতার এই বাক্য বিনিময় অকারণে নয়। নেতা এবারে ভাঙা পা নিয়ে অভিযানে এসেছে। সে মূল-শিবিরের ওপরে যেতে পারবে না। তাই পর্বতারোহণ পরিচালনা করবে সহনেতা। সে নেতার আদেশ পালন করার প্রতিশ্রুতি দিল।

শিবু কিন্তু অন্যকথা বলে। সে জিজ্ঞেস করে—আচ্ছা শঙ্কুদা, কিশ্‌তোয়ার-হিমালয়ের পর্বতারোহণ প্রসঙ্গে জাপানী অভিযাত্রীরা কোন মন্তব্য করেছেন?

একটু ভেবে নিয়ে বলি—হ্যাঁ। তাঁদের মতে কিশ্‌তোয়ার-হিমালয়ে পর্বতারোহীদের আদর্শ-আরোহণ, ওঁদের ভাষায় 'best alpine objectives' হচ্ছে, ব্রহ্মা-১ শৃঙ্গের উত্তর-পূর্ব গিরিশিরা, ব্রহ্মা-২ শৃঙ্গের উত্তরগাত্র এবং ব্রহ্মা-২ পর্বত থেকে ফ্ল্যাট টপ শৃঙ্গের ওপর দিয়ে ব্রহ্মা-১ পর্বতকে আড়াআড়ি ভাবে অতিক্রম বা Traverse করা।

আলোচনা শেষ হয়ে গেছে বেশ কিছুক্ষণ। কেউ আর কোন কথা বলছে না। সবাই নিঃশব্দে এগিয়ে চলেছে। কিই বা বলবে? নেতা বলেছিল, বেলা একটা নাগাদ কোথাও থেমে লাঞ্চ করা হবে। একটা বেজে গেছে অনেকক্ষণ, কিন্তু থামার নামটি নেই। সদস্যরা যখন কেউ কথাটা বলছে না, তখন আমাকেই বলতে হয়।

নেতা কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয়---না, না, ভুলে যাবো কেন? একি ভুলে যাবার মতো কথা? তবে তোমরা কিবার গাঁয়ে আপেল আর দুধ খেলে কিনা, তাই 'লাঞ্চ্ টাইম্' একঘণ্টা পেছিয়ে দিয়েছি।

---এক পো দুধ আর দুটি আপেল খাবার জন্য লাঞ্চ্ টাইম একঘণ্টা পেছিয়ে গেল? তপন কথাটা না বলে পারে না।

কিন্তু নেতা কিছু বলতে পারার আগেই গোরা তাকে মনে করে দেয়---তাহলেও কিন্তু সময় হয়ে গেছে লীডার! দুটো বাজে।

---জানি। আর তাই তো জায়গাটাও ঠিক করে ফেলেছি। নেতা গম্ভীর স্বরে উত্তর দেয়।

---কোথায়? বেচারা তপন আবার কথা বলে। ওর খুবই খিদে পেয়ে গেছে। পাবারই কথা।

---ঐ যে, ওপরের ঐ গুহাটায়। দেখছ না, রসিদ ব্রাদার্স বসে আছে।

এই না হলে নেতা। জায়গাটা সত্যিই অপূর্ব। এতদূর থেকে একবার দেখে নিয়েই মনে মনে নির্বাচিত করে ফেলেছে। কিন্তু রসিদ ব্রাদার্স ওখানে বসে আছে কেন? বোধকরি বিশ্রাম নিচ্ছে। ওদের কাছে আজ সবার খাবার দিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাই ওরা এগিয়ে যেতে পারছে না।

আগেই বলেছি, জায়গাটি অপূর্ব। চড়াই পথটা ওখানে পৌঁছে খানিকটা সমতল হয়ে বাঁদিকে বেঁকে গিয়েছে। সেই বাঁকের মুখে নদীর ধারে সুন্দর একটি গুহা। পাহাড়ী পথে আহার ও বিশ্রামের আদর্শ স্থান। ইচ্ছে করলে গুহাটিতে চার-পাঁচজন অনায়াসে রাত্রিবাস করতে পারে।

ক্লান্ত চরণদুখানির কল্যাণে কোনমতে ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর দেহখানি নিয়ে পৌছন গেল। সেই গুহার সামনে একখানি পাথরের ওপরে ধপ্ করে বসে পড়ি।

আমরা আসতেই রসিদ ব্রাদার্স উঠে দাঁড়ায়। খাবার বের করতে লেগে যায়। খাবার মানে চিঁড়ে-ছাতু ও চিনি। তারপরেই ছোট-রসিদ একটা সসপ্যান বের করে জল আনতে নিচে চলে যায় আর বড়-রসিদ আমাদের রুক্‌স্যাক খুলে খুলে মগ বের করতে থাকে।

ছেলেদুটো সত্যই খুব কাজের। কখনও কোন কাজে ক্লান্তি নেই। আর মুখে সর্বদা লেগে আছে হাসি। তাছাড়া শুধু আমাদের নয়, ওরা শেরপা আর 'হ্যাপ্-দের ফরমাস পর্যন্ত খেটে চলেছে।

তুষারশীতল জল দিয়ে চিঁড়ে ও ছাতু মাখা হয়েছে। তবু তা খেয়েই প্রাণে যেন বল ফিরে এলো। কিন্তু খাবার পরে বিশ্রামের অবকাশ পাওয়া গেল না। মেট তাগিদ লাগায়---চলিয়ে সাব।

নেতা নির্দেশ দেয়---গৌতম, তুমি শিবু জগদীশ ও কৃষ্ণকে নিয়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাও। শেরপা ও হ্যাপ্‌দের দেখা পেলে তাদেরও সঙ্গে নিয়ে যেও। আর ঠিক কথা···। একবার থামে অমূল্য। তারপরে আবার বলে---যে দুজন কুলি মেস-টেণ্ট্ বইছে, তারাও যেন তোমাদের সঙ্গে থাকে। দোবাতি পৌঁছেই তাঁবু টাঙ্গিয়ে ফেলবে।

ওরা জোর কদমে এগিয়ে যায়। আমরাও হাঁটা শুরু করি। নেতা আবার বলে---আমার পায়ে বড্ড ব্যথা হচ্ছে, আমি মেট সাবের সঙ্গে আস্তে আস্তে আসছি, তোমরা এগিয়ে যাও।

সেই আঁকাবাঁকা পথ। আজ চড়াই বেশি, উৎরাই কম। তবে কোথাও সোজা নয়। সোজা পথের কথা ভুলতে বসেছি।

সংকীর্ণ পথ। পাশাপাশি দুটি মানুষ চলতে পারে। কোথাও কোথাও তাও নয়। একেবারে পায়ে-চলা পাকদাণ্ডি।

পথের বাঁদিকে বনময় পাহাড়, ডানদিকে কিবার—কোথাও কাছে, কোথাও অনেক নিচে। কিবারের কলরব শুনতে শুনতে আমরা নীরবে পথ চলেছি।

এখন আর পথের পাশে কেবল বনময় পাহাড় নয়, বনের ভেতর দিয়ে পথ চলেছি। বড় বড় গাছের বন। দিনের আলোতেও অন্ধকার। স্যাঁতস্যাঁতে পথ। কেমন একটা অচেনা গন্ধ। বোধকরি ভিজে মাটি আর পচা পাতার।

মুখে যাই বলে থাকুক, এখন পর্যন্ত অমূল্য কিন্তু মেটকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের সঙ্গে সমানে পথ চলেছে। কেমন করে, তা সে-ই বলতে পারে। আমরা সুস্থ পা নিয়ে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছি। আর সে ভাঙা পা নিয়ে এই প্রাণান্তকর পথ পেরিয়ে চলেছে।

তাই মেট মনে হচ্ছে, নেতাকে নিয়ে মোটেই চিন্তিত নয়। সে কেবল আমাদের উৎসাহ দিচ্ছে। মাঝে মাঝেই বলছে—সাব্, আউর কুছ করনা নেই, স্রেফ খালি কদম উঠাইয়ে।

—তা তো বুঝতে পারছি ভাই! কিন্তু কদম ওঠাতেই যে প্রাণপাখি খাঁচা ছাড়া হতে চাইছে।

—আউর থোরাসা সাব্! খালি একঠো চড়াই। উসকি বাদ একদম সিধা রাস্তা।

কথাটা বিশ্বাসযোগ্য নয়, তবু শুনতে ভাল লাগে। মানুষটি সর্বদা আমাদের সাহস দিচ্ছে, উৎসাহিত করছে। অথচ এসব ওর কাজ নয়। ওর কাজ মালপত্র আর মালবাহক সামলানো। আগেই বলেছি এ অঞ্চলের মানুষ ভাল। কিন্তু মেট যেন একটু বেশি ভাল। আমাদেরও অদৃষ্ট ভাল। এমন মানুষকে সর্দার রূপে পেয়েছি। এখন শেষটুকু ভাল হলেই সব ভাল হয়।

বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ একটা পাহাড়ের মাথায় উঠে এলাম। এটাও বনময় পাহাড়। পাইনগাছই বেশি। তবে ভুজগাছও শুরু হয়ে গেছে। তার মানে আমরা অন্তত ন' হাজার ফুটে এসেছি। ন' হাজার ফুটের নিচে ভুজগাছ বড় একটা জন্মায় না।

পাহাড়ের ওপরে বনপথ হলেও সমতল পথ নয়। পাথর বোঝাই চড়াই-উৎরাই। তবে আগের চেয়ে ওঠা-নামা কিছু কম করতে হচ্ছে। আর তাই বোধকরি মেট তখন বলেছে—একদম সিধা রাস্তা।

আজও ওয়াটার বটলে জল নিয়ে সোন্দার থেকে রওনা হই নি। তবু পথে জলের অভাব হয় নি। মাঝে মাঝেই ঝরণা পাচ্ছি। তেষ্টা পেলেই জল খেয়ে নিচ্ছি।

বনময় পাহাড়টার ওপর থেকে একটা প্রস্তরময় প্রান্তরে উঠে এলাম। বিরাট বিরাট পাথর ডিঙিয়ে পথ চলতে হচ্ছে। এপারে যতদূর দৃষ্টি চলে, কোথাও তাঁবু ফেলবার মতো জায়গা দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু ওপারে পাহাড়ের পাদদেশে চমৎকার একফালি সমতল ময়দান। নদীর ওপরে একটা সাঁকো রয়েছে। এখানে গ্রাম নেই। বোধকরি বনবিভাগের কর্মীদের যাওয়া-আসার জন্যই এই সাঁকো। অনায়াসে ওপারে গিয়ে তাঁবু ফেলা যায়।

কিন্তু কোথায় তাঁবু? মালবাহকরা এগিয়ে গেছে। অতএব ঐ রমণীয় সমতলে রাত্রিবাসের সুযোগ পাওয়া গেল না। আমরা এগিয়ে চলি।

চলা অবশ্য কোনমতেই সহজ নয়। পাথর ডিঙ্গিয়ে চলা। কখনও লাফিয়ে, কখনও পাশ কাটিয়ে আবার কখনও বা নিচে নেমে দুই পাথরের ফাঁক দিয়ে গলে যাওয়া। এই উচ্চতায় এ বয়সে এমন করে চলতে গিয়ে কেবলি দম ফুরিয়ে আসছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিয়ে জিরিয়ে নিতে হচ্ছে।

কিন্তু আর কতকক্ষণ? সাড়ে পাঁচটা বেজে গেছে। পা দুখানি যে আর দেহের ভার বইতে পারছে না। ক্লান্ত দেহ বিশ্রাম চাইছে।

চাইলেই যদি পাওয়া যেত তাহলে তো এ সংসারে চাওয়া-পাওয়ার দ্বন্দ্ব থাকত না। সুতরাং আশ্রয় ও আহারের কথা থাক, তার চাইতে আস্তে আস্তে আমার এই দেহখানি বয়ে নিয়ে যাওয়া যাক।

এখানে বড় গাছ নেই তবে পাথরের ফাঁকে ফাঁকে মাথা উঁচু করে আছে নানা জাতের ছোট-ছোট গাছ আর নানা রঙের ফুল। কীট পতঙ্গও রয়েছে। উড়ছে প্রজাপতি।

এই পাথুরে উপত্যকায় বড় গাছ না থাকলেও বন ফুরিয়ে যায় নি। সামনে বনভূমি দেখতে পাচ্ছি। ভারী সুন্দর দেখাচ্চে। মনে হচ্ছে

যেন পাহাড়ের পাদদেশে আর কিবারের তীরে সবুজ দ্বীপ।

হঠাৎ দেখতে পেলাম ওদের, আমাদের মালবাহকদের। পাথুরে প্রান্তর পেরিয়ে একফালি সমতল পেয়ে ওরা মাল নামিয়ে বসে পড়েছে। জায়গাটা সমতল হলেও শিবির স্থাপনের উপযোগী নয়। জল অনেক নিচে আর চারিদিক খোলা, প্রবল হাওয়া বইছে।

ওরা কেন বসে পড়েছে জানি না। তবু বসার সুযোগ যখন পাওয়া গেছে, একটু বসে নেওয়া যাক। আমরাও বসে পড়ি।

একটু বাদে টুলটুল বলে—এরা কি আর যাবে না, নাকি?

—তাই তো মনে হচ্ছে। শৈলেশ উত্তর দেয়।

—কিন্তু আমরা তো আজ দোবাতি যাবো! সেখানে যেতে আরও ঘণ্টাখানেক লাগবে। তপন বলে ওঠে। সে গতবছর সমীক্ষায় এসেছিল।

জয় সেই কথাই বলে মালবাহকদের।

তারা ক্লান্তকণ্ঠে বলে—সাব্ আউর নহী সক্‌তে।

কথাটা মিথ্যে নয়। পিঠে বোঝা নিয়ে এই দুর্গম পথ পাড়ি দেওয়া সত্যই কষ্টকর। তাছাড়া ওরাও তো মানুষ।

তবু অমানুষ হতে হয় আমাদের। রঞ্জু বলে—কিন্তু ওরা যে তাঁবু নিয়ে এগিয়ে গেছে! এখানে থাকব কোথায়? তাছাড়া খাবার ও শোবার জিনিসপত্র সব এখানে পড়ে থাকলে ওরাই বা রাত কাটাবে কেমন করে?

—আমরা যে আর পারছি না সাব! মালবাহকরা সমস্বরে বলে ওঠে। বলে—বহুত মেহনত কিয়া, আউর নহী সক্‌তে।

বলে—ছ'টা বাজে। একটু বাদেই সন্ধ্যা হবে। অন্ধকার হয়ে গেলে পথ চলব কেমন করে?

অমূল্য পেছনে, গৌতম সামনে চলে গেছে। আমাকেই কথা বলতে হয়। ওদের কাছে এসে বলি—আমাদের সবার সঙ্গে টর্চ রয়েছে, তোমাদের কোন অসুবিধে হবে না। তাছাড়া সন্ধ্যা হবার

আগেই আমরা দোবাতি পৌঁছে যাবো। তোমরা তো জানো, সেখানে শীত কম। তোমাদের থাকবার গুহা আছে, কাঠ আছে, আগুন জ্বালাতে পারবে। এখানে এই খোলা মাঠে থাকবে কোথায় ?

কিছু কাজ হয়। নাথুরাম ঠাকুর মাথা নাড়ে। নিজেদের ভাষায় কি যেন বলে ওদের। কিন্তু ওরা তার সঙ্গে একমত হয় না।

আমি আবার বলি—জানি তোমাদের খুবই কষ্ট হয়েছে সারাদিন। কিন্তু এখানে থাকলে যে সারারাতও কষ্ট করতে হবে। শোবে কোথায়, আগুন জ্বালাবে কেমন করে ? তোমরা সবাই এপথে এসেছো, তোমরা তো সবাই জানো দোবাতি কেমন সুন্দর জায়গা। আর জায়গাটাও এখান থেকে সামান্যই দূরে। তাই বলছিলাম, আরেকটু কষ্ট করে চলো। আমি কথা দিচ্ছি, ওখানে পৌঁছলেই গরম গরম চা খাওয়াবো।

ঠাকুর আবার আমাদের পক্ষ নেয়। এবং এবারে হিন্দীতেই সঙ্গীদের বলে—সাব্ ঠিকই বলেছেন, দোবাতি এখান থেকে সামান্যই দূর, সামনের ঐ জঙ্গলটাতেই দোবাতি। ওখানে গুহা আছে, জ্বালানী আছে। এখানে থাকবি কোথায় ?

—ঠিক হ্যায়, মেটসাব্‌কো আনে দেও। মধ্যবয়সী মালবাহক বসের বলে। ওর বক্তব্য, যদি যেতে হয়, মেটকে জিজ্ঞেস করে তবে রওনা হবে।

আমি অনুরোধ করি—তোমরা তো জানো, লীডারসাবের পায়ে চোট। সে জোরে হাঁটতে পারে না। তাই মেটসাব তাকে নিয়ে আসছে। ওদের দেরি হবে। তখন তোমাদের আরও অসুবিধে হবে। তাই বলছিলাম, এখনও দিনের আলো রয়েছে। এক্ষুনি এগিয়ে যাওয়া ভাল। দোবাতি পৌঁছে আরাম করতে পারবে।

এবারেও ঠাকুর ছাড়া সবাই নীরব থাকে। কেবল ঠাকুর নিজেদের ভাষায় কি যেন বোঝাচ্ছে। বোধকরি আমাদের জন্য ওকালতি করছে।

আমি আবার বলতে থাকি—তোমরা সবাই আমার চেয়ে বয়সে

ছোট, তোমরা পাহাড়ী মানুষ আর আমি কলকাতার লোক। অবশ্য তোমরা বলতে পারো, তোমাদের পিঠে বোঝা। কিন্তু আমিও তো এই বয়সে রুক্‌স্যাক্‌ বইছি। আমি বুড়োমানুষ হয়ে যেতে চাইছি, আর তোমরা পাহাড়ী নওজোয়ান হয়ে ভয় পেয়ে গেলে! তোমাদের সরম লাগা উচিত।

কথাটা প্রৌঢ় মালবাহক নাথুরাম ঠাকুরকে উত্তেজিত করে তোলে। সে উঠে দাঁড়ায়। মাল পিঠে তুলে বলে—চলিয়ে সাব্‌! হাম জায়েগা আপকো সাথ।

যাদুমন্ত্রের মতো কাজ করে তার সিদ্ধান্ত। আকবর আবদুল ও আনোয়ার উঠে দাঁড়ায়। তারা নিজেদের ভাষায় অন্যদের কি যেন বলে।

একে অপরের দিকে তাকায়। এবং একটু বাদে সবাই পিঠে মাল নেয়। বিজয়ী বীরের মতো নাথুরাম ঠাকুর বলে—চলিয়ে সাব!

আমরা তাঁকে অনুসরণ করি।

আবার শুরু হল পাথর। এবং সেগুলো এক সমতলে নয়। ক্রমেই ওপরে উঠেছে। আমরা সেই পাথর বেয়ে ওপরে উঠছি। উঠছি তো উঠছিই। সামনের বনভূমি ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে কাছে। ওখানেই কি দোবাতি? তাহলে তো ওরা এতক্ষণে তাঁবু টাঙ্গিয়ে ফেলেছে। ভাবতেও ভাল লাগছে।

কিন্তু তাঁবু দেখতে পাবার আগে ভরসা নেই। কে জানে দোবাতি আর কতদূর। সেই সকাল ন'টায় সোন্দার থেকে হাঁটা শুরু করেছি। এখন ছ'টা বেজে গেছে। পথে সব মিলিয়ে বড়জোর ঘণ্টাখানেক ঠিকমত বিশ্রাম করেছি। তার মানে আটঘণ্টার মতো এই দুর্গম পথে পদচারণা করছি। এ পথের শেষ কোথায়?

পাথুরে প্রান্তর শেষ হেয়ে গেল। উঠে এলাম বনভূমিতে। ঘন বন। দুপুরেই বোধকরি সামান্য সূর্যের আলো ভেতরে ঢুকতে পারে। এখন প্রায় অন্ধকার। কেনই বা হবে না। সাড়ে ছ'টা বাজে। সন্ধ্যা সমাগত।

আমরা কিবারের তীরভূমি থেকে অনেকটা বাঁয়ে সরে এসেছি। কিবার আমাদের ডাইনে। এখানে অবশ্য তার সামান্য গর্জন ভেসে আসছে।

এ বনটাও একটা পাহাড়ের মাথায়। তবে এখানে পাথর কম, মাটি বেশি। নরম ও সংকীর্ণ স্যাঁতস্যাঁতে পথ। সারি বেঁধে এগিয়ে চলেছি। প্রাগৈতিহাসিক যুগের জনহীন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে আমরা কয়েকজন ছন্নছাড়া ভবঘুরে মানুষ পথ চলেছি। শব্দহীনা নীরব প্রকৃতি। কেবল আমাদের জুতো আর আইস এ্যাক্স-য়ের শব্দ এই অসাড় ও অসীম নীরবতার নিদ্রাভঙ্গ করছে।

সহসা শৈলেশ কথা বলে---এবারে আমাদের ভাগ্য ভাল বলতে হবে।

---কেন বল্ তো? জয় জিজ্ঞেস করে।

শৈলেশ উত্তর দেয়---আজ এখন পর্যন্ত বৃষ্টি পাইনি, কিন্তু এখানে আজও বৃষ্টি হয়েছে। দেখছিস না পথে কেমন জল জমে আছে। জুতোর ছাপও দেখতে পাচ্ছি।

---গৌতমদের পায়ের ছাপ। টুলটুল যোগ করে।

পিচ্ছিল পথ, আলো আরও কমে এসেছে, দেখে চলতে হচ্ছে। তাই কেউ আর কথা বলছে না। সবাই নীরবে পথ চলেছে।

সেকি! অবেলায় আবার রোদ উঠল নাকি? আলো বেড়ে গেল কেন? তাড়াতাড়ি ওপরে তাকাই। ওখানে দেখছি বনের মাঝে খানিকটা জায়গায় বড়গাছ নেই।

সহসা শৈলেশ চেচিয়ে ওঠে—ব্রহ্মাজী!

—কোথায়? আমরা সমস্বরে প্রশ্ন করি।

—ঐ তো, আমাদের সামনে, আকাশে!

সত্যই তাই। যাঁকে দেখার জন্য এই বয়সে পর্বতাভিযানে এসেছি, তিনদির ধরে এই দুর্গম পাহাড়ী পথ ভাঙ্গছি, তিনি আমার সামনে, প্রায় মাথার ওপরে। তাড়াতাড়ি দুহাত কপালে ঠেকিয়ে পিতামহ প্রজাপতিকে প্রণাম করি। বলি---হে স্বয়ম্ভু, আমরা

তোমাকে দর্শন করতে এসেছি, তোমার পূজা দিতে এসেছি। তুমি দয়া করে গ্রহণ করো, আমাদের জীবন ধন্য করো।

রঞ্জু আর চুপ করে থাকতে পারে না, সে চিৎকার করে ওঠে---বলো ব্রহ্মাজীকি···

---জয় !

---জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মাজীকি···

---জয় !

---চতুরানন ব্রহ্মাজীকি···

---জয় !

আমাদের জয়ধ্বনি শেষ হয়, কিন্তু মিলিয়ে যায় না। ওপর থেকে মানুষের কণ্ঠস্বর ভেসে আসে। তারাও জয়ধ্বনি করছে। নিজেদের নয়, ব্রহ্মাজীর।

এখানে এখন আমরা ছাড়া আর কারা ব্রহ্মাজীর জয়গান গাইবে ? গৌতমরাই ব্রহ্মাজীর জয়ধ্বনি করে আমাদের কাছে ডাকছে। এতক্ষণে ওরা বোধহয় তাঁবু টাঙ্গিয়ে চায়ের জল গরম করে ফেলেছে।

দেহের দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে মরীয়া হয়ে ছুটতে শুরু করি। জানি না কতদূর ছুটতে হবে ?

বেশিদূর ছুটতে হয় না। মিনিট পাঁচেক পরেই তাঁবু দেখতে পাই। গৌতম কৃষ্ণ জগদীশ ও শিবু তাঁবুর সামনে দাঁড়িয়ে স্বাগত জানাচ্ছে। ঘড়িতে এখন সন্ধ্যা সাতটা। তার মানে সোন্দার থেকে এই দশ মাইল পথ আসতে ঠিক দশঘণ্টা সময় লেগেছে। কমই লেগেছে বলতে হবে, কারণ আমরা আজ পাঁচ হাজার ফুট ওপরে উঠে এসেছি। দোবাতির উচ্চতা ১০,৫০০ ফুট অর্থাৎ ৩২০০ মিটার। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা আজকের পদযাত্রার যতি পড়ল। এবং এবারে সত্যি সত্যি আমার ক্লান্ত চরণযুগল বিশ্রাম লাভ করতে পারবে।

॥ নয় ॥

ঘুম ভেঙে যায়। ভোর হয়েছে। তাঁবুর ভেতরে প্রচুর আলো। বোধহয় অনেক বেলা হয়ে গিয়েছে। গতকাল সারাদিন শরীরের ওপর খুবই ধকল গেছে। দীর্ঘ ও দুর্গম পথ পেরিয়ে সোন্দার থেকে দোবাতি এসেছি। তাই সকালে ঘুম ভাঙ্গে নি আমাদের। সবাই এখনও গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন।

স্লীপিং-ব্যাগের জীপ খুলে হাত বের করি। টর্চ জ্বালিয়ে ঘড়ি দেখি।

সেকি, সাড়ে তিনটে! ঘড়িটা বন্ধ হয়ে আছে। তাড়াতাড়ি কানের কাছে হাত আনি।

না। ঘড়ি চলছে। তাহলে রাত সাড়ে তিনটেয় ঘুম ভেঙেছে আমার।

কিন্তু বাইরে এতো আলো কেন? মালবাহকরা আগুন জ্বালিয়েছে নিশ্চয়। কি করবে, বেচারীদের গরম জামা-কাপড় নেই। তাই বনের কাঠ জ্বালিয়ে শরীর গরম রাখছে।

আচ্ছা, একটা কথা বুঝতে পারছি না, ঘুম ভাঙল কেন? আমার যে চিরকাল একঘুমে রাত ফুরিয়ে যায়। তাহলে কি 'অল্‌টিচ্যুড সিকনেস'? উচ্চতাজনিত রোগের মধ্যে অনিদ্রার স্থান প্রথম সারিতে।

তাই বলে মাত্র সাড়ে দশ হাজার ফুটে অলটিচ্যুড সিকনেস! কি জানি হতেও বা পারে। বয়স হচ্ছে, চার বছর পরে এত উঁচুতে এলাম। তাছাড়া গতকাল আমরা দশ মাইলের মধ্যে পাঁচ হাজার ফুট উঁচুতে উঠে এসেছি। সোন্দার ৫, ৫০০ ফুট উঁচু আর দোবাতি ১০, ৫০০ ফুট।

রাতে ঘুম ভাঙ্গলেই আমাকে একবার বাইরে যেতে হয়। এই

সাড়ে দশ হাজার ফুট উঁচুতে রাত সাড়ে তিনটের সময় স্লীপিং ব্যাগ থেকে বেরিয়ে তাঁবুর বাইরে যাওয়া খুবই কষ্টকর। উপায় কি? ঘুম যখন ভেঙে গেছে, তখন আমাকে একবার বাইরে যেতেই হবে।

উঠে বসি। স্লীপিং ব্যাগের বাইরে আসি। প্রচণ্ড শীত। তাড়াতাড়ি বালিশের পাশ থেকে সোয়েটার নিয়ে গায়ে চাপাই, বালাক্লাবা টুপি দিয়ে মাথা ও কান ঢাকি। তারপরে সন্তর্পণে টর্চ জ্বালিয়ে পা টিপে টিপে দরজার দিকে এগিয়ে চলি।

চলা কি যায়? একটা মেস টেণ্টে আমরা বারোজন। তাঁবু আরও আছে, তবে ছোট। কে এই আড্ডা ফেলে অন্য তাঁবুতে গিয়ে শোবে?

তার ওপরে দুদিন বাদেই তো ছাড়াছাড়ি হবে, পর্বতারোহী সদস্যরা মূল-শিবির ছেড়ে ওপরে চলে যাবে। তাই যে ক'দিন পারা যায় আমরা একসঙ্গে থাকব ঠিক করেছি।

কারও ম্যাট্রেসের পাশ দিয়ে, কাউকে ডিঙ্গিয়ে কোনমতে এসে পৌঁছই তাঁবুর দরজায়। জুতো খুঁজে পেতে সময় লাগল না। জুতো পরে তাঁবুর 'চেন' খুলে বাইরে আসি।

আর এসেই ভুল বুঝতে পারি। সূর্য নয়, আগুন নয়, চাঁদ। চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে। সেই স্নিগ্ধ ও মধুর হাসিতে দোবাতির বনে আর ঘাসে, পাহাড়ে আর নদীতে আলোর বান ডেকেছে। মনে হচ্ছে অতর্কিতে আমি যেন এক আশ্চর্য-সুন্দর মায়াময় স্বপ্নলোকের মাঝখানে এসে উপস্থিত হয়েছি। আমার দেহ ও মন এক বিচিত্র-সুন্দর আনন্দের শিহরণে পুলকিত হয়ে উঠল। সেই 'সিনিয়লচু' অভিযান থেকে ফিরে আসার পরে গত ছ'বছরে হিমালয়ের এমন শান্ত সুন্দর সমাহিত রূপ আমার আর দেখা হয় নি। *

আকাশের দিকে তাকাই। নির্মল নীলাকাশে চতুর্দশীর শারদীয়া

---

* বিশ্বের সুন্দরতম শৃঙ্গ সিকিমের 'সিনিয়লচু (২২,৬২০´)। লেখকের 'সুন্দরের অভিসারে' দ্রষ্টব্য।

চাঁদ। সেই চাঁদের আলোয় দোবাতি এমন মায়াময় স্বপ্নলোক। কিন্তু আমার দোবাতির চেয়ে ভাল লাগছে দূরের ঐ ব্রহ্মা পর্বতকে। সে যেন এই সবুজ আর কালোর জগতে আলোর দিশারী। নীলাকাশে হেলান দিয়ে আমাকে কাছে ডাকছে।

আমি আসছি। ওগো হিরণ্যগর্ভ লোকপিতামহ, আমি যে আজ বিকেলেই তোমার পায়ের তলায় আশ্রয় নেব। আমি ভাগ্যবান, আজ সকালে তোমারই মুখ দেখে ঘুম ভাঙল আমার। তুমি আশীর্বাদ ক'রো, দিনটি যেন ভাল কাটে আমাদের। আমরা যেন নিরাপদে তোমার পদতলে পৌঁছতে পারি।

সেই প্রচণ্ড ঠাণ্ডাকে উপেক্ষা করে কতক্ষণ চাঁদের আলোয় হিমালয়কে দেখেছি, তার হিসেব করি নি। তবে বেশ কিছুক্ষণ পরে পরিতৃপ্ত অন্তরে ফিরে এসেছিলাম শিবিরে। শুয়ে পড়েছিলাম। তারপরে সেই মায়াময় স্বপ্নলোকের কথা ভাবতে ভাবতে একসময় আবার আমার দু-চোখে ঘুম নেমে এসেছিল।

ঘুম ভাঙল বড়-রসিদের ডাকে—সাব্ চায়!

তাড়াতাড়ি স্লীপিং ব্যাগের জীপ খুলে হাত বের করি। ঘড়ি দেখি। সেকি! এযে দেখছি সাড়ে ছ'টা বাজে। ছি ছি! রোজ সকালে আমি ওদের ডেকে তুলি। আজ নিজেই এত বেলা অবধি ঘুমিয়ে রয়েছি।

উঠে বসি। রসিদের হাত থেকে মগটা হাতে নিই।

অমূল্য রঞ্জু আর জয় ছাড়া সবাই উঠে বসে চা খাচ্ছে। সবাই সমস্বরে সুপ্রভাত জানায়। আমিও তাই করি।

চা খেয়ে বাইরে আসি। রোদ ওঠে নি। এখানে রোদ আসতে দেরি আছে। তবে রোদ পড়েছে ব্রহ্মা ও ব্রহ্মাণীর মাথায়। রোদ, না রোদ নয়। বিশ্বকর্মা বুঝি-বা সোনা গলিয়ে ঢেলে দিয়েছে ওঁদের গায়ে। কাল রাতে চাঁদের আলোয় আমি ওঁদের স্নিগ্ধ রূপ দেখেছি, আজ

সকালে সোনালী রোদে দেখছি সম্ভ্রান্ত রূপ। দুটিই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবার মতো। কাল দেখেছি, আজও দেখি। শুধু আজ নয়, আগামী কাল নয়, তারপরে আরও অনেকদিন ধরে আমি সকালে দুপুরে বিকেলে, সন্ধ্যায় ও রাতে—সদা সর্বদা ওঁদের দেখতে পারব। আরও কাছের থেকে, একেবারে পায়ের তলায় দাঁড়িয়ে।

ব্রহ্মা ও ব্রহ্মাণীকে ভাল লাগলেও, দোবাতিকে কিন্তু কাল রাতের মতো অমন মায়াময় আর স্বপ্নমধুর মনে হচ্ছে না এখন।

তাহলেও বলব এই পাথর আর অবিন্যস্ত বনের জগতে দোবাতি সত্যি সুন্দর। বিচিত্রও বটে। গভীর জঙ্গলের মধ্যে একফালি প্রায় সমতল সবুজ মাঠ। নরম মাটি। ঘাসে ছাওয়া, বুনো ফুল দিয়ে সাজানো। চারিদিকে গাছ, পাহাড়ের দিকে আর সামনে ও পেছনে তো বটেই, এমনকি কিবারের দিকেও। কিন্তু এই জায়গাটুকুতে কোন বড়গাছ নেই।

শুধু সমতল নয়, পাশের পাথুরে পাহাড়টাও অদ্ভুত। তার গা থেকে প্রকাণ্ড একটা পাথর 'ব্যাল্‌কনী'-র মতো ঝুলে আছে। তার তলায় অনেকখানি জায়গা। যাতায়াতের পথে ভেড়াওয়ালারা আশ্রয় নেয়। কাল রাতে মালবাহকরা ঠাঁই নিয়েছে।

এখন তাঁরা রান্না করছে। এখানে কাঠের অভাব নেই। আমরা অবশ্য এখনও কাঠের উনুন জ্বালাই নি, স্টোভেই রান্না করছি। মূল-শিবিরে কাঠের দরকার হবে। সে তখন দেখা যাবে। এখন শুধু সুজি ও চা করা হচ্ছে। হালুয়া আর বিস্কুট দিয়ে ব্রেক্‌ফাস্ট সেরে আজ আমরা পদযাত্রা শুরু করছি। ঘুম থেকে উঠতে দেরি হয়ে গেছে। বেশি রান্নার সময় কোথায়? তাছাড়া মেট বলেছে, সোনামার্গী অর্থাৎ মূল-শিবিরে পৌঁছতে আমাদের নাকি বড় জোর ঘণ্টা চারেক হাঁটতে হবে।

ওর চারঘণ্টা যে আমাদের চারঘণ্টা নয়, তা জানি। তবু ধরে নিয়েছি ঘণ্টা ছয়েকের মধ্যে আমরা ব্রহ্মালোকে পৌঁছতে পারব। এবং তাহলে সেখানে গিয়েই লাঞ্চ করা যাবে, একেবারে হট্‌-লাঞ্চ।

নেতা অবশ্য বলেছে, পথে নাকি যথারীতি ছাতু ও চিড়ে পাওয়া যাবে।

বিস্কুট ও হালুয়া দিয়ে দ্বিতীয়বার চা খেয়ে নিতে সাড়ে সাতটা বেজে গেল। তারপরেই ম্যাট্রেস আর স্লীপিং ব্যাগ গুটিয়ে রুকৃস্যাক্ নিয়ে তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে এলাম। শেরপা ও হ্যাপ্‌রা তাঁবু খুলে ফেলল। মেস-টেণ্ট ছাড়া আরও দুটি তাঁবু খাটানো হয়েছিল গতকাল। একটায় 'হ্যাপ্‌' ও শেরপারা শুয়েছে, আরেকটায় মেট ও রসিদ ব্রাদার্স। তাছাড়া পাথর আর গাছের ডালের সাহায্যে ত্রিপল টাঙ্গিয়ে ছোট একটি রান্নাঘরও বানানো হয়েছিল। সবই খুলে ফেলা হল। পর্বতাভিযান মানেই শিবির গড়া আর ভাঙা। গতকাল যা গড়া হয়েছিল, আজ তা ভেঙে ফেলা হল। আবার গড়তে হবে। ভাঙা আর গড়া নিয়েই জীবন। পর্বতাভিযান জীবনের প্রতিচ্ছবি।

ব্রেকৃফাস্ট শেষ হবার পরে অমূল্য বলে—গৌতম আর শিবু 'মার্কিং ফ্ল্যাগ' নিয়ে এগিয়ে যাও। তোমরা 'ক্যাম্প সাইট সিলেক্ট' করে অপেক্ষা করবে। জগদীশ তপন গোরা ও টুলটুল এখানে থেকে যাও। মেটও তোমাদের সঙ্গে থাকুক। তোমরা মালপত্র গুছিয়ে 'পোর্টার'-দের রওনা করে দিয়ে মেটকে নিয়ে তাড়াতাড়ি পা চালাবে। আটটা বাজে, শঙ্কুদা শৈলেশ রঞ্জু জয় ও কৃষ্ণকে নিয়ে আমি আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছি।

পিঠে রুকৃস্যাক্ তুলে নিই। যাবার পথে আজই আমার শেষ পদযাত্রা। আজ বিকেলেই আমরা ব্রহ্মালোকের বাসিন্দা হতে পারব।

জগদীশ গোরা তপন ও টুলটুলের সঙ্গে করমর্দন করি। তারপরে নেতা ও সহনেতার সঙ্গে চলা শুরু করি। নেমে আসি পথে, কিবারের কাছে। শিবু শৈলেশ রঞ্জু জয় ও কৃষ্ণ আমাদের অনুসরণ করে।

আগেই বলেছি, দোবাতি জায়গাটি কেবল বনমুক্ত সবুজ আর সমতল নয়। চারিপাশের চেয়ে বেশ খানিকটা উঁচু, যেন একটা প্রশস্ত মাটির ঢিবি।

মাটি বলছি কাল থেকেই। কিন্তু মাটি হলেও শুধু মাটি নয়।

পাথরও রয়েছে। পাথর আছে মাটিতে মিশে আর পড়ে আছে এখানে-ওখানে। কয়েকটা পাথরের সঙ্গে আমরা তাঁবুর দড়ি বেঁধেছিলাম। তখন মনে হয়েছিল, ভাগ্যিস পাথরগুলো ছিল।

যাক্ গে, দোবাত্তির কথা। তার চেয়ে পথের কথা বলা যাক, ব্রহ্মলোকের পথ।

কিবারের তীরে তীরে পথ। জলের ধারা অবশ্য অনেক নিচে। তাহলেও তার শব্দ শোনা যাচ্ছে। সেই শব্দ শুনতে শুনতে কিবারের ডানতীর ধরে আমরা সারি বেঁধে এগিয়ে চলেছি।

চলতে চলতে কেবলি ব্রহ্মা আর ব্রহ্মাণীকে দেখছি। এখনও তাদের মাথায় সোনার মুকুট। ভাবতে ভাল লাগছে আজ থেকে বহুদিন ধরে আমি ব্রহ্মলোকে বসে ব্রহ্মাজীকে দর্শন করতে পারব।

কিন্তু আকাশের দিকে আর নয়, এবারে পায়ের দিকে তাকাতে হচ্ছে। না তাকিয়ে যে উপায় নেই! মাঝে মাঝেই ঝরণা। বাঁদিকের পাহাড় থেকে নেমে এসে পথের ওপর দিয়ে বয়ে গিয়ে ডানদিকের কিবারে মিশেছে। কোথাও পাথরের ওপরে পা দিয়ে দিয়ে ঝরণা পেরোতে হচ্ছে, কোথাও বা লাফ দিয়ে পার হতে হচ্ছে।

তবে পথচলার ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে ব্রহ্মা আর কিবারকে দেখে নিচ্ছি। কিবার তো নদী নয়, যেন স্বর্গধারা। সুপ্রশস্ত নদী-খাতের ভেতরে সামান্য কিছুটা জায়গা জুড়ে তার প্রবাহ। কিন্তু সে প্রবল। প্রচণ্ড গর্জনে চারিদিক সচকিত করে ব্রহ্মলোক থেকে মর্ত্যলোকে ধেয়ে চলেছে।

কিবারের ওপারেও পাহাড়, বনময় খাড়া পাহাড়। সে বনে পাইন গাছই বেশি। আর এপারের বনে ভুজগাছের ছড়াছড়ি। বিচিত্র প্রকৃতি।

নেতা বলে দিয়েছিল, পথে রোদ পাবার আগে কেউ বসতে পারব না। এতক্ষণে সেই রোদ পাওয়া গেল। এখন সকাল সাড়ে ন'টা। তার মানে একটানা দেড়ঘণ্টা হাঁটার পরে একটু বসার, সুযোগ পেলাম।

জায়গাটাও বসবার মতই বটে। ঘাস আর কাঁটাগাছে ছাওয়া এক-ফালি সমতল। পাশেই একটি ঝরণা যাচ্ছে বয়ে। রুকৃস্যাক্ নামিয়ে জল খেয়ে নিই। বড্ড পিপাসা পেয়েছিল। তারপরে বসে পড়ি। সোয়েটার ও মাফলার খুলে রুকৃস্যাকে ভরে নিই। রীতিমত গরম লাগছিল।

মিনিট কয়েক বিশ্রামের পরেই আবার চলা শুরু করতে হল। কিছুক্ষণ হেঁটে একটা বনময় পাহাড়। ছায়াশীতল পথ। চলতে আরাম লাগছে। তাই বলে পথ কিন্তু সমতল নয়। চড়াই ভেঙে এগোতে হচ্ছে।

চড়াই শেষে আবার বনহীন পাথুরে প্রান্তর। পাশেই একটা ঝরণা। তারই তীরে বসে আছে নেতা ও মেট। বহুক্ষণ আগেই মেট ধরে ফেলেছিল আমাদের। তারপরে সে নেতাকে নিয়ে এগিয়ে এসেছে।

আমাদের বসতে বলে অমূল্য। একটু বাদে আবার বলে—জগদীশ তপন গোরা আর টুলটুল পথের খাবার নিয়ে এগিয়ে যাও। মাল-বাহকরা এগিয়ে গেছে। তোমরা তাঁবু টাঙ্গিয়েই রান্না চড়িয়ে দেবে, আজ কিন্তু হট্ লাঞ্চ্ চাই।

—ও. কে. লীডার! ওরা উঠে দাঁড়ায়। রুকৃস্যাক্ পিঠে তুলে হাঁটতে শুরু করে।

—আজ কি লাঞ্চের আগেই আমরা মূল-শিবিরে পৌছে যাচ্ছি? অমূল্যকে জিজ্ঞেস করি।

সে উত্তর দেয়—নিশ্চয়ই। তবে দুটোর আগে লাঞ্চ্ পাবে না। কারণ তার আগে আমরা পৌছতেই পারব না।

—আমিও কি ওদের সঙ্গে চলে যাবো লীডার? কৃষ্ণ জিজ্ঞেস করে।

নেতা রাজী হয় না। বলে—না। আমরা কেউ পথ জানি না। হিমবাহে পথ হারালে ভারী দুর্দশা হয়। তাই পথ জানে, এমন একজন সদস্য সঙ্গে থাকা ভাল। তাছাড়া একটা জিনিস কখনই

ভুলে যেও না, তোমরা এবারে একজন Lame Leader নিয়ে পর্বতাভিযানে এসেছো।

আবার একটা বনময় পাহাড় পার হয়ে এলাম। এই পাহাড়-গুলোকেই গতকাল দূর থেকে সবুজ দ্বীপের মতো দেখাচ্ছিল।

পাহাড় থেকে বেশ খানিকটা নিচে নেমে এসে একটা নালা পেরোতে হল। তারপরে উঠে আসি পাথুরে প্রান্তরে। আবার অনেকখানি জায়গা জুড়ে বিরাট বিরাট পাথর। পাথর শুধুই পাথর। পাথরের পরে পাথর পেরিয়ে সাবধানে এগিয়ে চলি।

সাড়ে দশটা বাজে। রোদের তেজ বেড়েই চলেছে। সকালে যে রোদের আশায় পথ চলছিলাম, এখন সেই রোদ পথ-চলার প্রায় অন্তরায় হয়ে উঠেছে। তাছাড়া এই উচ্চতায় এমন পাথর ডিঙ্গিয়ে পথচলা। একটুতেই হাঁফিয়ে উঠছি।

---একটু বসে নেবেন নাকি? শৈলেশ বুঝতে পেরেছে আমার অবস্থা।

তাড়াতাড়ি বড় একটা পাথরের আড়ালে বসে পড়ি। ওরাও বসে---জয় রঞ্জু আর শৈলেশ।

এতক্ষণ নিজের পায়ের দিকে নজর রাখতে গিয়ে আর কোন দিকে তাকাতে পারি নি। এবারে চেয়ে চেয়ে চারিদিক দেখি। কিবারকে দেখি। নদী তো নয়, স্বর্গধারা। এখানে সে কয়েকটি সংকীর্ণ ধারায় বিভক্ত হয়ে সাদা নদীখাতের ওপর দিয়ে নাচতে নাচতে বয়ে চলেছে। কিবারের ওপারে তেমনি একটা খাড়া পাথুরে পাহাড়। কেবল তার খানিকটা জায়গা জুড়ে কিছু গাছপালা। নানা রঙের পাথরে তৈরি সেই পাহাড়টার পেছন থেকে 'ফ্ল্যাগ টপ' এবং 'ক্রুকেড ফিঙ্গার' শৃঙ্গদুটি উকি দিচ্ছে। ধনুকের মতো বাঁকা একটা গিরিশিরা দুটি শৃঙ্গকে যুক্ত করেছে। তার তলায় একটা ঝুলন্ত তুষারপ্রপাত।

এপারে আমাদের বাঁদিকে এখনও তেমনি পাথুরে পাহাড়, তবে ওপারের মতো অমন খাড়া নয়। তারও গায়ে নানা রঙের পাথর। আর তার পেছনে ব্রহ্মাণীকে পাশে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন ব্রহ্মা।

আমরা তারই কাছে চলেছি। প্রায় পৌঁছে গিয়েছি ব্রহ্মলোকে।

নেতাকে সঙ্গে নিয়ে মেট এসে হাজির হল।

নেতা কিন্তু আর বসতে দিল না। তার তাড়ায় আবার উঠে দাঁড়াতে হয়।

পাথুরে প্রান্তরটা পেরিয়ে আবার একটা জঙ্গলে উঠে এলাম। গতকালও মাঝে মাঝে উৎরাই পেয়েছি। কিন্তু আজ কেবলি চড়াই। উঠেই চলেছি। একে অনভ্যাস তার ওপরে বয়স হয়েছে। এই উচ্চতায় এত চড়াই ভাঙ্গতে কষ্ট তো হবেই। কষ্ট হচ্ছে কিন্তু আনন্দ পাচ্ছি। ব্রহ্মলোক এসে গিয়েছে ভাবতেই শ্রান্ত শরীরে শক্তি ফিরে আসছে।

এ জঙ্গলটাও তেমনি একটা পাহাড়ের উপরিভাগ। কেবল এখানে পাইনগাছ প্রায় নেই বললেই চলে। পাইনের জায়গা দখল করেছে ভুজ। তার মানে আমরা বোধকরি বারো হাজার ফুটে উঠে এসেছি।

বনগুলির দুরবস্থা দেখে ক'দিন ধরে কষ্ট পাচ্ছিলাম। এখানে এসে সেই কষ্ট আরও বাড়ল। এমন অমূল্য ঐশ্বর্য আমরা কি ভাবে নষ্ট করে ফেলছি। বহু গাছ মাটিতে পড়ে আছে। ঝড়ে পড়েছে কিংবা মরে গেছে। এখন পচে যাচ্ছে। দেখার মানুষ নেই। থাকলেই বা কি হ'ত? নদী এখানে কয়েকটি সংকীর্ণ ধারায় বিভক্ত। সে কাঠ পরিবহনের উপযুক্ত নয়। আর পথ? সেকথা না বলাই ভাল। যে পথে মানুষ চলতে পারে না, সে পথ দিয়ে কাঠ নিয়ে যাবার প্রশ্ন ওঠে না।

ভুজবন শেষ হয়ে গেল। এখন বেলা এগারোটা। আবার পাথর। তবে তারা আকারে কিছু ছোট আর পাথরের ফাঁকে ফাঁকে প্রচুর ঝোপঝাড় রয়েছে। প্রতি ঝোপে ফুল ফুটেছে। নানা রঙের ফুল। লাল হলুদ নীল বেগুনী, আরও কত রঙ।

—সেকি! এখানে একটা ঘোড়া ঘুরে বেড়াচ্ছে!

সত্যই তাই। বেশ স্বাস্থ্যবান একটা লাল রঙের ঘোড়া ঘুরে ঘুরে গাছপালা খাচ্ছে।

জয় বলে—ঘোড়াটাকে ধরে লীডারকে চড়িয়ে দিলে হয়।

কৃষ্ণ প্রতিবাদ করে—তোর যেমন কথা! ঘোড়া পেলেই কি ঘোড়সওয়ার হওয়া যায়? লাগাম লাগবে না, জিন লাগবে না?

—এগুলো কোন সমস্যাই নয়। শৈলেশ জয়ের পক্ষ নেয়—একটা স্লীপিং ব্যাগ কিংবা একখানি কম্বল আর একটুকরো নাইলনের দড়ি হলেই জিন আর লাগামের কাজ চালিয়ে নেওয়া যাবে।

—তাহলে আয়, এখানে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে ঘোড়াটার দিকে নজর রাখা যাক। লীডার এসে পৌঁছক।

—কিন্তু লীডার কি ঘোড়ায় চড়তে চাইবে? কৃষ্ণ জিজ্ঞেস করে

—চাইবে না কেন? জয় পাল্টা প্রশ্ন করে। বলে—এ ঘোড়ার জন্য তো ভাড়া দিতে হবে না। তাছাড়া এই পাণ্ডব বর্জিত দেশে ঘোড়া পেয়ে তার পিঠে সওয়ার হবার মধ্যে একটা 'থ্রিল্' রয়েছে।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই মেট ও নেতা এসে যায়। সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণ গিয়ে ঘোড়াটার ঝুঁটি ধরে ফেলে। মৃদু আপত্তির পর নেতা সওয়ার হতে সম্মত হয়।

মেট তার হ্যাভারস্যাক্ থেকে একখানি কম্বল ও দড়ি বের করে। জিন ও লাগাম তৈরি হয়। নেতা ঘোড়ায় ওঠে। ঘোড়া চলতে শুরু করে। ঘোড়ার লেজ ধরে মেট নেতার সঙ্গে এগিয়ে চলে। রঞ্জু ছবি নেয়।

জানি না এ ব্যবস্থায় আমাদের খঞ্জ নেতার কোন সুবিধে হল কিনা? তবে তার অশ্বারোহণ নিয়ে আমরা কিছুক্ষণ মজা লোটার সুযোগ পেলাম।

ঘোড়ার পিঠে বসে অমূল্য এখন কি করছে জানি না, তবে আমাদের পাথরের পর পাথর পেরিয়ে ওপরে উঠতে হচ্ছে। সাড়ে এগারোটা বাজে, মাথা ফাটানো রোদ। এটাকে গ্রাবরেখা অঞ্চল বলা যেতে পারে। এখন পাথর। কিন্তু শীতকালে সব কিছু তুষারে তলিয়ে যায়। বর্ষাকালে বরফ গলে যাবার পরে এখন ওপরে মাটি আর পাথর। যতই উঁচু হোক, এসব জায়গায় রোদ উঠলে খুব

তাড়াতাড়ি গরম হয়ে যায়। আমাদেরও গরম লাগছে, প্রচণ্ড গরম।

তবে তেষ্টায় কষ্ট পাচ্ছি না। মাঝে মাঝেই জলের ধারা রয়েছে। বাঁদিকের পাহাড় থেকে নেমে আসা হিমবাহ বিগলিত ধারা গিয়ে ডানদিকের কিবারে মিলিত হচ্ছে।

আমরা ধারার পরে ধারা পেরিয়ে পথ চলেছি। কোনটিকে লাফ দিয়ে পার হওয়া যাচ্ছে, কোনটিকে বা জুতো ভিজিয়ে পেরোতে হচ্ছে।

গাছের সীমারেখা কিন্তু শেষ হয় নি এখনও। ছোট-ছোট ঝোপঝাড় তো রয়েছেই। এখানে দেখ্ছি আবার গুটিকয়েক বড়গাছ। আর তা শুধু ভুজ নয়, সেই সঙ্গে পাইন। বিচিত্র প্রকৃতি। এ উচ্চতায় পাইনগাছ জন্মায় না বলেই জানতাম। আমার সেই জানা আজ মিথ্যে হয়ে গেল।

রোদে গরম লাগছে, আর ছায়ায় বসলে শীত শীত করছে। তাই গাছের ছায়ায় বেশিক্ষণ বসা গেল না। কয়েক মিনিট জিরিয়ে নিয়েই আবার পথচলা শুরু করা গেল। না করেই বা উপায় কি? মেট বলেছিল সোনামার্গী পৌঁছতে চারঘণ্টা লাগবে। সেই চারঘণ্টা অতিক্রান্ত। এখন বেলা বারোটা। অথচ সোনামার্গী এখনও দূরে রয়েছে। কতদূরে, কৃষ্ণ ঠিক বলতে পারছে না।

আবার পাথর পেরিয়ে পথ। পাথর হলেও একটা পায়েচলা পথরেখা রয়েছে। ভেড়াওয়ালাদের পদচিহ্ন।

বড় গাছ না থাকলেও ঝোপঝাড় ও ফুল রয়েছে। নানা রঙের গাছ ও ফুল। দেখতে দেখতে চলেছি, কিন্তু কেউ কোনটিতে হাত দিচ্ছি না। আজ রওনা হবার সময় মেট বলে দিয়েছে, এ অঞ্চলে নাকি এমন একরকম গাছ আছে, যা থেকে সর্বদা বিষবাষ্প বের হয়। সেইসব গাছ কিংবা ফুলের গন্ধ শুকলে অথবা তাদের কাছে মাথা নিয়ে গেলে মানুষ অজ্ঞান হয়ে যায়।

শুধু গাছ আর ফুল নয়, কিছু কিছু সচল প্রাণও রয়েছে এই নিষ্প্রাণ প্রান্তরে। রয়েছে পিশুজাতীয় ছোট-ছোট পোকা আর নানা

রঙের ছোট-ছোট গিরগিটি জাতীয় সরীসৃপ। তারা আমাদের শব্দ শুনে ছুটে পালাচ্ছে। কিন্তু পোকাগুলি চোখ কান ও নাকে মুখে ঢুকে আমাদের অস্থির করে তুলছে।

আমরা এখনও কিবারের তীর দিয়ে পশ্চিম থেকে পুবে চলেছি। কিবার বইছে পুব থেকে পশ্চিমে। আর ব্রহ্মাণীকে পাশে নিয়ে ব্রহ্মা দাঁড়িয়ে রয়েছে আমাদের বায়ে অর্থাৎ উত্তরে।

—লীডার দেখছি ঘোড়াটা ছেড়ে দিয়েছে!

জয় ঠিকই বলেছে। একটা ঘোড়া দূরে দাঁড়িয়ে আমাদের দেখছে। কিন্তু এটা কি সেই ঘোড়া?

—তাই তো মনে হচ্ছে। রঞ্জু বলে।

শৈলেশও সমর্থন করে তাকে। আমি কৃষ্ণের দিকে তাকাই। এখন আমাদের দলে সে-ই একমাত্র পর্বতারোহী। পাহাড়ে ঘোড়া, অতএব সে ভাল বুঝবে।

—আমারও তো তাই মনে হচ্ছে। কৃষ্ণ রায় দেয়।

জয় বলে—এটা কোন গুর্জরদলের ঘোড়া। কোন কারণে ঘোড়াটাকে না নিয়েই তারা নিচে নেমে গিয়েছে।

—কিন্তু শীত আসছে। এখানে থাকলে তো ঘোড়াটা মরে যাবে। বরফ পড়া শুরু হয়ে গেলে ও আর পালাবার পথ পাবে না।

—তার আগেই ও নিচে নেবে যাবে।

—তাছাড়া, তারাও খুঁজতে আসবে, পাহাড়ীদের কাছে একটা ঘোড়া আর আমাদের কাছে একখানি মোটরগাড়ি প্রায় সমান। ওরা এসে নিশ্চয়ই ওকে ধরে নিয়ে যাবে।

আবার তেমনি পাথরের প্রবাহ। ক্রমেই ওপরে উঠেছে। আমরা তারই ওপর দিয়ে ধুকতে ধুকতে পথ চলেছি।

পথ? হ্যাঁ পথই বটে, ব্রহ্মলোকের পথ। মনে পড়ছে তিরিশ বছর আগের কথা। সেই ভরা যৌবনে সেদিন চিরবাসা থেকে গোমুখীর পথকে দুর্গম ও দুস্তর বলে মনে হয়েছিল। 'বিগলিত-করুণা জাহ্নবী-যমুনায়' সেই কথাই বলেছি বার বার। কিন্তু আজ প্রৌঢ়ত্বের

প্রান্তে পৌঁছে দেখতে পাচ্ছি, সেদিনের সেপথ এ পথের তুলনায় নিতান্তই সহজ ও সুগম ছিল। আজ বুঝতে পারছি অভিজ্ঞতার অভাবে সেদিন মিথ্যে সংবাদ পরিবেশন করেছি পাঠক-পাঠিকার কাছে। ভরসা করি, তাঁরা আমাকে মার্জনা করবেন।

—আচ্ছা, হিমালয়ে কত পাথর আছে ?

গোমুখীর কথা যায় হারিয়ে। শৈলেশের প্রশ্ন শুনে হাসি পায় আমার।

সে নিজেও হাসছে। কারণ সে-ও জানে এ প্রশ্নের উত্তর হয় না। পাথর পেরোতে পেরোতে বিরক্ত হয়ে হয়ে বেচারী প্রশ্নটা করে ফেলেছে।

আমরা চুপ করে থাকলেও রঞ্জু ছেড়ে দেয় না। সে গম্ভীর স্বরে বলে—প্রশান্ত মহাসাগরের বালকাবেলায় যত বালুকণা আছে, তার চাইতে সামান্য কয়েকটুকরো কম।

আবার হো হো করে হেসে উঠি সবাই। এবং শৈলেশও হাস্যরোলে গলা মেলায়। তারপরে হাসি থামিয়ে বলে—সত্যি বলছি, সেই সকাল থেকে শুধু পাথর আর পাথর। পা দুটো বিষের টুকরো হয়ে গেছে।

—ঐ দেখ্ সামনে পাথর নেই। কৃষ্ণ হঠাৎ বলে ওঠে।

তাকিয়ে দেখি শুধু সমতল নয়, সেই সঙ্গে 'প্রি-লাঞ্চ'। টিলার মতো পাথুরে স্তূপগুলোর মাঝে একফালি প্রায় সমতল।

তার বুক বেয়ে বয়ে যাচ্ছে একটি ঝরণা। আর সেই ঝরণার তীরে বসে আছে রসিদ ব্রাদার্স। তারা আগুন জ্বালিয়ে চা গরম রাখছে।

বোধকরি গৌতমরা এখানে এসে ছাতু মেখেছে, চা বানিয়েছে। নিজেরা খেয়ে আমাদের জন্য রেখে গিয়েছে। সেই থেকে দু-ভাই জুনিপার জ্বালিয়ে আমাদের চা গরম করে চলেছে। এখানে প্রচুর জুনিপার রয়েছে। এগুলো কাচাই জ্বলে।

কাছে আসতেই ওরা সেলাম করে। রুক্স্যাক্ নামাই। ছোট-

রসিদ থালা ও মগ বের করে। ঝরণা থেকে জল নিয়ে আসে। ঠাণ্ডা ও মিঠে জল। তেষ্টা দূর হয়। বড়-রসিদ খাবার ও চা পরিবেশন করে।

খেতে খেতে চারিদিকে তাকাই। আরে তাই তো। আমি যে ব্রহ্মলোকে পৌঁছে গিয়েছি। সামনেই ব্রহ্মা হিমবাহের নাসিকা, গ্লেশিয়ার স্নাউট তথা কিবারের উৎসমুখ। এখানেই ব্রহ্মা হিমবাহ গলে গলে সৃষ্ট হচ্ছে ব্রহ্মবারি, পরমাত্মার চরণামৃত। সেই স্বর্গীয় শান্তিজল নিয়ে কিবার ধেয়ে চলেছে মর্তলোকে, মর্ত্যজনকে ত্রাণ করতে।

উৎসমুখটি অবশ্য গোমুখীর মতো বিশাল কিংবা বৈচিত্র্যময় নয়। নিতান্তই একটি সাধারণ হিমবাহ-নাসিকা। এমন স্নাউট হিমালয়ের প্রায় সব হিমবাহে দেখতে পাওয়া যায়। তবু দেখি, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিশ্বকর্মার বিচিত্র সৃষ্টিকে আরেকবার দেখি। আর মনে মনে জীবন-দেবতাকে বলি—তোমাকে প্রণাম, তুমি আবার আমাকে এই অপরূপ রূপ দর্শনের সুযোগ দান করলে।

স্নাউট ছাড়িয়েই শুরু হল গ্রাবরেখা। তার মানে ব্রহ্মা হিমবাহের শেষাংশ। ওপরের বরফ গিয়েছে গলে, পড়ে আছে পাথর আর মাটি। গজিয়েছে ছোট ছোট গাছ আর ঘাস। এই তৃণভূমির জন্যই ভেড়াওয়ালারা উচ্চহিমালয়ে পশুচারণে আসে।

কিবারের কলরব আর শুনতে পারছি না। পাবো কেমন করে? আমরা যে তার উৎসমুখ ছাড়িয়ে এসেছি। সে ব্রহ্মাবারি বয়ে নিয়ে যায়, তবু তার ব্রহ্মলোকে প্রবেশাধিকার নেই।

মনে পড়ছে চন্দ্রভাগা মারু-চেনাব আর কিবারের কথা। সেদিন বাটোট থেকে সঙ্গী হয়েছিল চন্দ্রভাগা। তারপর থেকে গত ছ'দিন ধরে দিবারাত্র নদীর শব্দ শুনে আসছিলাম। এই মাত্র সেই শব্দ স্তব্ধ হয়ে গেল। ব্রহ্মলোকে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মসঙ্গীত সাঙ্গ হ'ল।

তাই তো হবে। এই প্রণবধ্বনি আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে

এসেছে ব্রহ্মলোকে। এখন তো তার আর প্রয়োজন নেই। ঐ তো, ওখানে সবার ওপরে- মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছেন স্বয়ং ব্রহ্মা। তাঁকে দর্শন করতে করতে এখন আমরা তাঁর পদতলে পৌঁছতে পারব।

সেই পাথর আর মাটির পথ। সেই কালো পাহাড়ের পাশ দিয়ে আঁকাবাঁকা উঁচু নিচু সংকীর্ণ পায়ে-চলা পথ। সেই পথ বেয়ে আমরা গুটিকয়েক অকাজের মানুষ অকারণের পথ চলেছি। সত্যই কি তাই? কোন কাজ নেই বলেই কি আমরা এইসব অকারণের পথে আসি? সবাই বলে।

বলুক গে। তবু আমরা আসব। হিমালয় যে কাছে ডাকেন আমাদের। ব্রহ্মাজী যে ডাক দিয়েছেন এবারে। তাইতো আমরা আজ ব্রহ্মলোকে।

রোদ রয়েছে কিন্তু সেই সঙ্গে ফুরফুরে হাওয়া বইছে। এখন আর আগের মতো গরম লাগছে না। লাগবে কেমন করে? ব্রহ্মাজী যে ক্রমেই কাছে আসছেন। আর কি তিনি দূরে থাকতে পারেন? তিনি আমাদের দেহ ও মনের সব উত্তাপ ঘুচিয়ে দেবেন, সব জ্বালা জুড়িয়ে দেবেন।

বাঁদিকের যে পাথুরে পাহাড়গুলো সেই সকাল থেকে সমানে সঙ্গে সঙ্গে এসেছে, সেটাও ব্রহ্মাজীর পায়ের কাছে পৌঁছে শেষ হয়ে গেছে। আর ব্রহ্মাণী? তাঁকেও তো দেখছি না! তিনি কোথায় গেলেন? তাঁকেও ব্রহ্মাজী আড়াল করে দিয়েছেন। ভালই হয়েছে। এখন আর আমাদের সামনে ব্রহ্মা ছাড়া কিছু নেই। ব্রহ্মা, শুধুই ব্রহ্মা। আমরা যে ব্রহ্মলোকে এসেছি।

চলতে চলতে আবার তাঁকে দেখি, ব্রহ্মা-১ পর্বতশিখরকে। নিচের দিকে তার পর্বতগাত্রে কালো কঠিন পাথরের দেওয়াল। ওপরের দিকে মাঝে মাঝে বরফ মেশানো কয়েকটি পাথরের ঢেউ খেলানো গিরিশিরা। আর সবার ওপরে ত্রিভুজাকৃতি তুষারাবৃত পর্বতশিখর। ওখানে উপস্থিত হয়ে পিতামহের পূজার্চনা করতে

পারলে আমাদের এই যাত্রা সার্থক হবে।

কিন্তু সেসব কথা থাক। আমি আবার তাঁর দিকে তাকাই, তাঁকে দেখি আর দেখি। এদিক থেকে অবশ্য তাঁর গায়ে, কিছু কালো পাথর দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু ডানদিকে অর্থাৎ পুবে ব্রহ্মা হিমবাহের দিকে শুধু সাদা, কেবলি বরফ। ওদিক থেকেই ক্রিস্ বনিংটন শিখরে আরোহণ করেছেন, আমাদেরও তাই করতে হবে।

হিমবাহের ওপারে, উত্তর-পুবে খানিকটা জায়গা জুড়ে তুষারাবৃত শৃঙ্গ দেখতে পাচ্ছি। কৃষ্ণ বলছে, ফ্ল্যাট টপ। ওরই পেছনে এ অঞ্চলের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ সিক্‌ল মুন লুকিয়ে রয়েছে। থাকগে, ফ্ল্যাট টপ্-কে তো দেখা যাচ্ছে। ব্রহ্মালোকে বসে বসে তার মাথায়ও মেঘ আর রোদের খেলা দেখা যাবে।

সিক্‌ল মুন-এর জন্য মন খারাপ না হলেও ব্রহ্মাণীর জন্য মায়া হচ্ছে। কিন্তু স্বয়ং ব্রহ্মা যদি ব্রহ্মাণীকে আড়াল করে রাখেন, তাহলে আমরা আর মা-সরস্বতীকে দর্শন করব কেমন করে? ব্রহ্মালোকে বসেও ভারতীর আরতি করতে পারলাম না।

কিন্তু ব্রহ্মা তো রয়েছেন সামনে। তিনি সর্বদা জেগে রইবেন আমার শিয়রে। তাঁরই জন্য তো এই দুর্গম পথ পেরিয়ে আজ আমরা এসেছি ব্রহ্মালোকে। আমি তাঁকে এত কাছে পেলাম। আমার সকল শ্রম সার্থক হল।

আমরা পৌঁছে গিয়েছি। ঐ তো তাঁবু দেখা যাচ্ছে, আমাদের মূল-শিবির। এখন বেলা দুটো। দোবাতি থেকে এই ৮ কিলোমিটার পথ আসতে সত্যি ছ'ঘণ্টাই লাগল। কিবারের উৎস ছাড়িয়ে প্রায় এক কিলোমিটার এগিয়ে ব্রহ্মা পর্বতের পাদদেশে ১৩,৫০০ ফুট উঁচু অসিত কাননে প্রতিষ্ঠিত হল আমাদের মূল-শিবির। কলকাতা থেকে ব্রহ্মালোকে আসতে আটদিন সময় লাগল। আজ ১৭ই সেপ্টেম্বার, ১৯৮৬।

॥ দশ ॥

স্থানীয় নাম সোনামার্গী। নামের অর্থ এবং কারণ কিছুই জানি না। কেবল বলতে পারি কাশ্মীরের সোনামার্গের সঙ্গে কিশ্‌তোয়ারের সোনামার্গীর কোন মিল নেই। সেখানে সবুজ এখানে কালো, সেখানে মাটি এখানে পাথর, সেখানে হাজার হাজার মানুষের মেলা, এখানে আমরা ছাড়া আর কোন মানুষ নেই।

আমরা কিন্তু আমাদের মূল-শিবিরকে সোনামার্গী বলছি না, বলছি অসিত কানন। প্রয়াত পর্বতারোহী অসিত মৈত্রের নামে নেতা এই নাম রেখেছে। আর তাই আজ সকালে ঘুম ভাঙতেই অসিতের কথা মনে পড়ে গেল। বড়-রসিদের হাত থেকে চায়ের মগটা হাতে নিয়ে তার কথাই ভাবতে থাকি, অসিতের কথা—

হিমালয়ের নেশা যদি একটা পাগলামো হয়, তাহলে অসিত বেশ বড় পাগল ছিল। এবং তাই বোধকরি সে আর হিমালয় থেকে ঘরে ফিরল না, চিরকালের মতো এখানেই রয়ে গেল।

অসিতকে নিয়ে আমরা হারালাম অনেককেই। ভারতের কথা বাদই দিলাম। যতদূর জানি, বিগত পঁচিশ বছরে কেবল পশ্চিমবঙ্গই হিমালয়কে বিশটি প্রাণ ডালি দিয়েছে। আজ অসিত কাননে বসে তাঁদের নামগুলি একবার স্মরণ করা যাক। তারা হলেন—এন. চক্রবর্তী, অনিমা সেনগুপ্তা, গৌরাঙ্গ সুন্দর চৌধুরী, অমর রায়, সুজয়া গুহ, কমলা সাহা, শ্রীলা কুণ্ডু, কৃষ্ণচন্দ্র দে, প্রদীপ দাস, সত্যজিৎ দে, বাদল দত্তগুপ্ত, অমলেশ সেনগুপ্ত, সুখেন্দু মুখার্জি, অরুণ ঘোষ, প্রবীর সাহা, রণজিৎ লাহিড়ী, কানাই ঘোষ, অমিতাভ চৌধুরী, গৌতম চক্রবর্তী ও অসিত মৈত্র।

আগে এক একটি আত্মদানের জন্য আমরা অনেক চোখের জল ফেলতাম; এখন মৃত্যু প্রায় বাৎসরিক ব্যাপার হয়ে গিয়েছে। তাই

বোধকরি হিমালয়-প্রেমিকদের চোখের জল গিয়েছে শুকিয়ে। সত্যি, বলতে কি আজকাল আমি আর স্মৃতিচারণও বড় একটা করি না।

কিন্তু অসিত যে আমাকে বড়ই ভালোবাসত। শিখর বিজয়ী কিংবা নেতা অসিতকুমার মৈত্র নয়, আমার অনুজপ্রতিম অসিতই আজ আমাকে ব্যথিত করে তুলছে।

ওর সঙ্গে আমার পরিচয় কিন্তু খুব বেশিদিনের নয়। আর সে পরিচয় করে দিয়েছে অমূল্য। অসিত ছিল তার মন্ত্রশিষ্য। তাই অসিতের স্মৃতিচারণ করতে অমূল্যের একটি লেখার কথাই মনে পড়ছে। রুক্স্যাক্ থেকে স্মারক স্মৃতি পত্রখানি টেনে নিয়ে পড়তে শুরু করি। অমূল্য লিখেছে—

অসিতের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের স্মৃতি আজও স্পষ্ট মনে পড়ে। সালটা ১৯৭০। শ্রাবণ মাসের এক বৃষ্টিস্নাত সন্ধ্যা। ভবানীপুরের 'দূতাগার' ক্লাবের ছোট্ট ঘরে বসে আমরা কয়েকজন গভীর আলোচনায় ব্যস্ত। আলোচনার মূল-বিষয় হিমালয়ের যোগীন পর্বতশ্রেণী. বিশেষ করে যোগীনের দু-নম্বর শিখর (২০,৮০৫ ফুট)। 'দূতাগার' ক্লাবের উৎসাহী সভ্যদের প্রথম পর্বতাভিযানের লক্ষ্য যোগীনের ঐ দু-নম্বর শিখর। ক্লাব কর্তৃপক্ষ অভিযানের নেতৃত্বভার আমার উপর দেওয়ায় চিন্তায় পড়েছি সবচেয়ে বেশী আমি।

আলোচনায় ছেদ পড়ল অভিযানের মেডিক্যাল অফিসার ডাঃ শঙ্কর নারায়ণ চৌধুরী ঘরে ঢোকায়। পেছন পেছন এসে ঢুকল তেইশ চব্বিশ বছরের এক অচেনা ছেলে। দোহারা চেহারা, বুদ্ধিদীপ্ত চোখ, আচরণে সপ্রতিভ। মুখে ফৌজী গোঁফের মানানসই অবস্থান। সবদিক থেকে বলা যায় স্মার্ট ছেলে।

ডাক্তার চৌধুরী বলল, "লীডার দেখ, এই ছেলেটিকে নিয়ে এসেছি; আমার আত্মীয়। মানালীর মাউণ্টেনীয়ারিং ইন্‌সটিটিউট থেকে বেসিক আর অ্যাডভান্স কোর্স করে এসেছে। পর্বতারোহণ সম্বন্ধে খুবই আগ্রহী।"

ছেলেটিকে হেসে নাম জিজ্ঞাসা করলাম। বলল—অসিত মৈত্র।

নামটা খুবই পরিচিত ঠেকল। কোথায় যেন শুনেছি। হ্যাঁ এতক্ষণে মনে পড়েছে। ওয়েষ্টার্ন হিমালয়ান মাউণ্টেনীয়ারিং ইন্‌সটিটিউটের ডিরেক্টার হরনাম সিং-এর মুখে ওর নাম শুনেছি। হরনাম বলেছিল, "অমূল্য, তোমাদের বেঙ্গল থেকে একটি ছেলে আমার ইন্‌সটিটিউটে ট্রেনিং নিয়েছে। ছেলেটি খুবই টাফ এবং পাহাড়ে ওঠার ব্যাপারে প্রচণ্ড ঝোঁক আছে।"

সেই আমার অসিতের সাথে প্রথম পরিচয়। সেই পরিচয় পরবর্তীকালে আরো ঘনিষ্ট হয়ে উঠেছিল। অদৃশ্যভাবে হৃদয়ের টান অনুভব করতাম ওর জন্য।

সেবার আমরা পারলাম না যোগীনের নির্দিষ্ট শিখরে উঠে আমাদের বিজয় পতাকা ওড়াতে। কয়েকদিন ধরে এক নাগাড়ে বয়ে যাওয়া তুষার ঝড় বিশ হাজার ফুট উঁচুতে ছোট্ট তাঁবুগুলিতে প্রায় একরকম বন্দী করে রেখেছিল আমাদের। পালিয়ে চলে এসেছিলাম কোনমতে। মনে পড়ছে, সেই অভিযানে আমার একটা দুর্ঘটনা ঘটেছিল। সারারাত যন্ত্রণায় ঘুমোতে পারি নি। অসিতও ছিল সেই রাতের নিদ্রাহীন সাথী। প্রতিটি কাজে অসিতের এই শ্রদ্ধা, বন্ধুত্ব, ও ভ্রাতৃত্ববোধ আমাকে বিমুগ্ধ করত।

যোগীন অভিযান ব্যর্থ হয়েছে। অসিতের খুবই মন খারাপ। ওকে হতাশ দেখে বললাম, "মন খারাপ করার-কি আছে! তোমার তো এটা প্রথম অভিযান। দেখলে তো কি পরিস্থিতিতে আমরা পিছিয়ে আসতে বাধ্য হলাম। যোগীন তো আর চলে যাবেনা। আবার না হয় কোনদিন আসব। কিন্তু এই প্রতিকূল অবস্থায় প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া আত্মহত্যারই সামিল—যার কোন মানে হয় না।"

ফিরে এলাম কলকাতায়।

অসিতের সাথে তারপর প্রায়ই দেখা সাক্ষাৎ হতে লাগল। দেখা হলেই বলত, "অমূল্যদা, চল আবার যোগীনে যাই।" একই শিখরে পরপর দুবার অভিযানের পিছনে কিছু অসুবিধা আছে। প্রধান অসুবিধা অর্থকরী দিকটা। কোন প্রতিষ্ঠান কিংবা জনসাধারণকে

একই শিখরে পরপর দুবার অভিযানে উপুর হস্ত হতে রাজি করানো মুশকিল।

ব্যাপারটা অসিতকে ভেঙে বললাম। কিন্তু সে ছেলে নাছোড়-বান্দা। যোগীনে যাওয়ার জন্য তার প্রাণ নাকি আকুপাঁকু করছে। শেষ পর্যন্ত দুতাগার রাজী হল আবার যোগীন অভিযানের আয়োজন করতে। মুশকিল আসান হিসাবে সাহায্যের হাত প্রসারিত করলেন পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন।

১৯৭১ সাল। আমরা আবার চললাম গঙ্গোত্রীর পথে, কুমারী যোগীন-এর দু-নম্বর শিখর অভিযানে। এই অভিযানে অসিত আর একটি ছেলেকে নিয়ে এল। বয়সে অসিতের চেয়ে ছোট। সেই ছেলেটিই আজকের প্রখ্যাত পর্বতারোহী এবং হিমালয়ান মাউণ্টেনী-য়ারিং ইন্‌সটিটিউটের প্রাক্তন প্রথম ভাইস প্রিন্সিপাল সুভাষ রায়।

এবারেও প্রথম আমাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল। মাত্র চারশ ফুট নিচ থেকে চলে আসতে হয়েছিল। কিন্তু অসিত দমবার পাত্র নয়। ওর চোখেমুখে তখন শিখর জয়ের দৃঢ় প্রত্যয়, অনমনীয় সংকল্প। দুদিন পরে—তাই দ্বিতীয় শিখর আরোহণকারীদের দলে ওকে আবার রেখেছিলাম। হ্যাঁ, এবারে অসিত পেরেছিল। ঝকঝকে একমুখ হাসি নিয়ে আর তিন-জনের সাথে প্রথম মানুষ হিসাবে অসিত উদ্ধত কুমারী যোগীনের গলায় মালা পড়িয়ে দিল। বলতে দ্বিধা নেই, আমাদের এই স্যফল্যের পিছনে ওর অবদান ছিল সবচাইতে বেশী।

১৯৭১ সালে যোগীন শিখর জয়ের পর থেকেই শুরু হল অসিতের পর্বতারোহী জীবনের গৌরবময় ঝলমলে অধ্যায়। একের পর এক অভিযানের নেতৃত্ব দিতে লাগল সে। সাংগঠনিক প্রতিভাবলে অন্যান্য-দের সাথে প্রতিষ্ঠা করল ইন্‌সটিটিউট অব এক্সপ্লোরেশন এবং পরে এ্যাড-ভেঞ্চারার ক্লাব।

ওর অভিযানের যাবার সময় প্রতিবারই হাওড়া স্টেশনে শুভেচ্ছা জানাতে যেতাম। মাঝে মাঝে গোঁফের আড়ালে মুচকি হেসে বলত "অমুল্যদা অভিযানে সংখ্যার দিক দিয়ে তোমাকেও ছাড়িয়ে যাব।"

ভাল লাগত ওর প্রাণশক্তি দেখে। কিন্তু যোগীনের পরে অনেক-দিন একসাথে দুর্গম পাহাড়ী পথে হাঁটা হল না। অসিতের খেদ তাতে। প্রায়ই বলত, "তোমার সাথে কোন অভিযানে আর যাওয়াই হচ্ছে না। চল না একসঙ্গে দুজনে কোন অভিযানে বেড়িয়ে পড়ি।"

শেষপর্যন্ত সুযোগ পেয়ে বেরিয়ে পড়া গেল। ১৯৮০ সালের সিনিয়লচূ (২২, ৬২০´) অভিযানে। বলা বাহুল্য অসিতই প্রধান হোতা। ওর প্রচেষ্টাতেই অভিযান পরিকল্পনা স্পষ্ট রূপ পেল। অভিযানের শেষপর্বে নেতৃত্বের ভার বলতে গেলে ওর উপরই ছিল। অভিযানের সেই দিনগুলিতে ওর দাঁতে দাঁত চেপে সংগ্রামের কাহিনী অবিশ্বাস্য মনে হলেও সত্যি। কাছাকাছি থেকে ওকে যতই দেখেছি, ততই অবাক হয়েছি। ভোলা যায় না সেসব কথা।

অনেকে বলে, অসিতের প্রতি আমার নাকি একটু বেশি দুর্বলতা ছিল। জানিনা কথাটা সত্যি কিনা। তবে ওর মিষ্টি ব্যবহার, অদম্য সাহস, চিত্তের দৃঢ়তা এবং বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব প্রথম থেকে আমাকে ভীষণভাবে মুগ্ধ করেছিল। সিনিয়র পর্বতারোহীদের ওর মতো সম্মান করতে কাউকে আমি দেখিনি।

সিনিয়লচু-র কয়েকমাস পরেই ও আবার সফল ব্ল্যাক পিক্ (২০,৯৫৬ ফুট) অভিযানের নেতৃত্ব দিল। অভিযানের নেশা যেন ওর রক্তে। তাই প্রতিবছরই ছুটে যেতে হত কতকগুলি দামাল ছেলের সঙ্গে। শিখর জয়ের সফল ও সার্থক নেতা অসিত।

গতবছর হঠাৎ একদিন আমায় এসে বলল "অমূল্য দা, এবার একটা বেশ মজা হয়েছে। দুটি অভিযান একই এলাকায় হচ্ছে। মোটামুটি একই সময়ে।" একটু থেমে গোঁফের ফাঁকে লাজুক হাসি হেসে বলল, "জান, এই দুটি অভিযানের নেতৃত্ব দিচ্ছি আমি।"

ছেলেটা বলে কি! অভিজ্ঞতা থেকে বললাম, "যাচ্ছ ভাল কথা কিন্তু স্ট্রেইন পড়বে খুব।"

—"আসলে দুটো দলের কাউকেই না করতে পারছি না। ভেবে রেখেছি প্রথম অভিযানটার পর গঙ্গোত্রী ফিরে আসব। তারপর

ওখানেই আবার দ্বিতীয় অভিযাত্রী দলটার সঙ্গে যোগ দেব।"

"একটা কথা, সফল হও বা না হও, সবাইকে নিয়ে নিরাপদে ফিরে এস।"

অসিত আমার কথায় আত্মবিশ্বাসের হাসি হাসল। বলল, "তবে এবারেই শেষ অমূল্যদা! আর অভিযান-টভিযানে যাচ্ছি না।"

অসিত যাবে না অভিযানে! উড়িয়ে দেবার মত কথাই বটে। বললাম, "এই শেষ আর যাব না, এসব বলে লাভ নেই। আমি জানি, তুমি থেমে যাবার ছেলে নও।"

"না, সত্যি বলছি অমূল্যদা! একজনকে কথা দিয়েছি আর অভিযানে যাব না। তবে তোমার সাথে যদি কখনও যাইতো আলাদা কথা।"

ওর মতো পাহাড়ীর মুখে নেতিবাচক কথাবার্তা শুনে অবাক হবারই কথা আমার। তবু আমল দিতে চাই না। আমরা যারা পাহাড়ে যাই তারা মাঝে মধ্যে এমন ধারা কথা বলে থাকি। তাই ওর কথার গুরুত্ব দিলাম না।

চব্বিশে আগস্ট ১৯৮৫। 'হিমালয়ান ফোরাম' চলেছে আপার গঙ্গোত্রী এক্সপিডিশনে। হাওড়া স্টেশনে অনেকেই অভিযাত্রীদের সম্বর্ধনা জানাতে এসেছেন—আমিও আছি তার মধ্যে। ভিড়ের মধ্যে অসিতকে খুঁজেই পাচ্ছি না। হঠাৎ পেছন থেকে কে এসে জড়িয়ে ধরল। ফিরে দেখি অসিত—পরনে পায়জামা-পাঞ্জাবী। অসিতকে ঐ পোশাকে আমি কোনদিন দেখি নি, তাই স্বভাবতই অবাক হয়ে বলাম, "কি ব্যাপার? দেখে মনে হচ্ছে বরযাত্রী যাচ্ছ!"

ওর দুরন্ত হাসিখানা সমস্ত মুখে ছড়িয়ে দিয়ে অসিত বলল, "বরযাত্রী···! ফিরে আসি, তোমাকেই বরযাত্রী যেতে হবে।"

"সত্যি!"

"হ্যানড্রেড পার্সেণ্ট সত্যি।"

এতক্ষণে 'এই অভিযানই শেষ অভিযান' কথাটার ইঙ্গিত ধরতে পারা গেল। ভাবতে ভাল লাগল যে দামাল ছেলেটা এবার কারও

শাসনে আঁটকে পড়বে !

অসিতের সাথে সেই আমার শেষ দেখা।

প্রথম অভিযান চলাকালীন ওর শেষ চিঠি পেয়েছিলাম ২/৯/৮৫ তারিখে। পঞ্চানন ভট্টাচার্য, তরুণ চক্রবর্তী, শংকর দে-র সাথে সুন্দরবন বেসক্যাম্প থেকে অসিত ওর শেষ চিঠিটা আমাকে পাঠিয়েছিল। চিঠিতে লিখেছিল—"প্রিয় অমূল্যদা, রাস্তায় অনেক আলোচনা তোমাকে কেন্দ্র করে করেছি। কারণ হিমালয় আর অমূল্যদা আমার কাছে অভিন্ন। তোমার অকৃত্রিম আন্তরিক শুভেচ্ছা আমাদের পাথেয়।..."

তারপর নানাভাবে জানতে পেরেছিলাম ওর প্রথম অভিযানের কথা। জীবন আর মৃত্যুর সাথে লড়াই করতে করতে সবাই কিভাবে প্রাণ নিয়ে ফিরে এসেছে। ১৬ই সেপ্টেম্বর শ্যামবরণ অভিযাত্রী-দলের সাথে ওর যোগ দেবার খবরও পেয়ে গিয়েছিলাম।

তিরিশে সেপ্টেম্বর রাত বারোটা নাগাদ হঠাৎ আমার বাড়ীর ফোনটা বেজে উঠল। ফোন এসেছে সুভাষ রায়ের বাড়ী থেকে। অসিতের দুর্ঘটনার খবর শুনে বুকটা কেঁপে উঠল। দুরুদুরু বুকে নিজেকে প্রবোধ দিয়েছি—'নিশ্চয় অসিত বেঁচে আছে।'

রাত দুটোয় আবার ফোন। সুভাষ রায়ের কান্নায় ভেঙে পড়া গলা—"অসিতদা আর নেই। ২৬শে সেপ্টেম্বর শ্যামবরণ হিমবাহের ২০,১২৫ ফুট অনামী শিখরে আরোহণের পর, নামার পথে প্রায় দু-হাজার ফুট নিচে পড়ে গিয়ে......।"

দু:সংবাদের আকস্মিকতায় স্তব্ধ হয়ে গেলাম।

তবু বলি, একদিক থেকে অসিত ভাগ্যবান। হিমালয়ের শিখরে শিখরে আরোহণের সময় কোন পর্বতারোহীর মৃত্যু হলে তার নশ্বর দেহের শেষকৃত্য সেখানেই করা হয়ে থাকে। নিচে মৃতদেহ আনার অসুবিধার জন্যই ঐ ব্যবস্থা। কিন্তু আশিস রায়ের তত্ত্বাবধানে শ্যামবরণ অভিযানের সদস্যরা যেভাবে অসিতের মৃতদেহ ঐ দুর্গম অঞ্চল থেকে গঙ্গোত্রীতে নিয়ে এসে তড়িঘড়ি অসিতের আত্মীয়-

স্বজনদের খবরটা পৌঁছে দিতে পেরেছিল, তাতে অসিতকে ভাগ্যবানই বলা চলে। পর্বতারোহণের ইতিহাসে এ ধরণের ঘটনা বিরল।

গঙ্গোত্রী ভগীরথের তপভূমি, লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীর পদরেণুধন্য। এই গঙ্গোত্রী থেকেই শুরু হয়েছিল অসিতের প্রথম পর্বতাভিযান। আর এই গঙ্গোত্রীতেই বিগলিত করুণা ভাগীরথীর তীরে স্রোতের মূর্ছনা আর পাহাড়ী গাছের আকুল নিঃশ্বাসের শব্দের মধ্যে অভিযাত্রী বন্ধু ও সহোদর ভাইদের চোখের জলের ধারায় অসিতের দেহ পঞ্চভূতে লীন হয়ে গেল।

হিমালয়প্রেমিক অসিতের ভস্মীভূত শরীরের অণু পরমাণু মিশে গেল তুষারমৌলী হিমালয়ের আবহমণ্ডলে।

কিন্তু শরীর হারিয়ে গেলেও, আমার মন থেকে অসিত হারিয়ে যাবে না। যেমন ছিল তেমনই থাকবে। থাকবে চিরকাল।

ভবিষ্যতে যখনই হিমালয়ে যাব, যখনই অভিযানের কথা ভাবব, তখনই অসিত আমার সামনে এসে দাঁড়াবে। হয়ত বলবে, "চল না একসঙ্গে যাই অমূল্যদা…।"

মৃত্যুহীন-প্রাণ অসিত আমৃত্যু আমার জীবনে, আমার কর্মে ভাস্বর হয়ে থাকবে।'

কিন্তু কাজটা ঠিক করছি কি? ব্রহ্মলোকে আজ প্রথম প্রভাত। অথচ সকাল থেকে বসে বসে শুধু আমার হারিয়ে যাওয়া হিমালয়-সঙ্গীর স্মৃতিচারণ করছি।

হ্যাঁ, ঠিকই করছি। অসিত আমাদের সঙ্গে নেই। কারণ সে আমাদের আগেই ব্রহ্মলোকে স্থায়ী হবার গৌরব অর্জন করেছে। আর তাই তো ব্রহ্মলোকে বসে আমরা তাঁর স্মৃতিতর্পণ করছি।

কিন্তু থাক্ এখন আর অসিতের কথা নয়, এবার একটু নিজেদের কথা ভেবে নেওয়া যাক, আমাদের এই মূল-শিবিরের কথা।

কিবার নালার উৎসমুখ থেকে আরও এক কিলোমিটারের মতো উত্তর-পূর্বে এগিয়ে ব্রহ্মা হিমবাহের দক্ষিণ তীরে ১৩,৫০০ ফুট অর্থাৎ

৪১১৫ মিটার উঁচুতে আমরা এই মূল-শিবির স্থাপন করেছি। জায়গাটা প্রায় সমতল এবং পাথরমুক্ত, এটি ব্রহ্মা-১ শৃঙ্গের দক্ষিণ পাদদেশ এবং ব্রহ্মা হিমবাহের পশ্চিমতীর।

খুবই নিরাপদ জায়গা। পাথর পড়ার কোন সম্ভাবনা নেই। অবশ্য আমাদের সামনেই হিমবাহের একটা ছোট স্নাউট রয়েছে। সেখানে মাঝে মাঝেই ধস নামছে। টন টন বরফ মাটি আর পাথর পড়ছে। কিন্তু ওখান থেকে আমরা বেশ খানিকটা দূরে রয়েছি।

প্রায় পাথরমুক্ত এই সমতলটি মোটেই বড় জায়গা নয়। তিনটি তাঁবু ও মালবাহকদের ত্রিপল টাঙাবার পরে সামান্য জায়গাই খালি রয়েছে। সেখানেও আবার একটা বড় পাথরের সঙ্গে ত্রিপল ঝুলিয়ে রান্নাঘর তৈরি করা হয়েছে।

জল ? হ্যাঁ, জল রয়েছে বৈকি। জল না থাকলে কি সেখানে মূল-শিবির করা যায় ? পশ্চিমের সেই কালো পাহাড়টার গায়ে একটা ছোট জলপ্রপাত রয়েছে। সেই জল ঝরণা হয়ে প্রান্তরের বুক বেয়ে বয়ে চলেছে। গতকাল নালা কেটে তার একটি ধারা নিয়ে আসা হয়েছে রান্নাঘরের সামনে। কাল রাতে সেই ক্ষুদ্র ঝরণার কুলকুল শব্দ শুনতে শুনতে আমরা ঘুমিয়ে পড়েছি।

আজ ঘুম ভাঙার পরে কিন্তু আর সে শব্দ শুনতে পাচ্ছি না। বোধকরি রাতের ঠাণ্ডায় ধারাটি জমে গিয়েছে। রোদ উঠলেই বরফ গলবে, ঝরণা আবার নাচতে নাচতে নেমে আসবে আমার কাছে।

কিন্তু থাকগে, এসব ভাবনা। অনেক কাজ পড়ে রয়েছে। কাজগুলো করে ফেলতে হবে। গতকাল সন্ধ্যার পরে অবশ্য একটা কাজ করে রেখেছি। মূল-শিবির প্রতিষ্ঠার সংবাদ দিয়ে টেলিগ্রামগুলি সব লিখে ফেলেছি। একটা টেলিগ্রাম যাচ্ছে দিল্লীতে, ইণ্ডিয়ান মাউণ্টেনীয়ারিং ফাউণ্ডেশানে। আরও তিনটি টেলিগ্রাম যাচ্ছে কলকাতায়—পি. টি. আই-য়ের দীপক বসাক, আজকাল পত্রিকার অসীম মিত্র এবং মাননীয় ক্রীড়ামন্ত্রী শ্রীসুভাষ চক্রবর্তীর কাছে। আগেই বলেছি, হিমালয়-প্রেমিক সুভাষবাবুর সক্রিয় সাহায্য না

পেলে আমরা এ অভিযানের আয়োজন করতে পারতাম না।

আমাদের মালবাহকরা কিছুক্ষণ বাদেই বাড়ি রওনা হবে। তারাই নিয়ে যাবে টেলিগ্রাম। ওরা আজই সোন্দার পৌঁছে যাবে। পিঠে মাল নিয়ে চড়াই ভেঙে যেপথ আসতে দুদিন লেগেছে, খালি হাত-পায়ে উৎরাই ভেঙ্গে সেই পথটুকু পার হতে ওদের একদিন লাগবে। ওরা আজ বিকেলেই ঘরে ফিরবে।

আগামীকাল ওরা টেলিগ্রামগুলো সুয়েদ ডাকঘরের পোস্ট-মাস্টারসাবকে দিয়ে দেবে। তিনি সেগুলো রাণারের সঙ্গে পাঠিয়ে দেবেন কিশ্‌তোয়ার। সেখান থেকে শর্মাজী বার্তাগুলো ফোনে জানিয়ে দেবেন বাটোট। বাটোট থেকে জম্মু হয়ে দিল্লী, দিল্লী থেকে কলকাতা। কবে পৌঁছুবে, তা কেবল ব্রহ্মাজী বলতে পারেন।

সংবাদ পাঠাবার পরেও অনেক কাজ পড়ে রয়েছে। যাঁদের সক্রিয় সাহায্য ও শুভেচ্ছায় আমরা আজ ব্রহ্মলোকে, তাঁদের সবাইকে মূল-শিবির প্রতিষ্ঠার সংবাদ পাঠাতে হবে। ব্রহ্মা-১ পর্বতশিখরের 'পিক্‌চার পোস্টকার্ড' ছাপিয়ে নিয়ে এসেছি। সেগুলিতে সুন্দর করে লিখতে হবে—

ASIT KANAN (13,500´)
17.9.86

Here in the high cold and thin air, we remember you with deep gratitude.'

অথবা বাংলায়—

অসিত কানন (১৩,৫০০´),
১৭. ৯. ৮৬

চন্দ্রভাগার তীরে তীরে ভয়ঙ্কর ও সুন্দর পথ পেরিয়ে পৌঁচেছি ব্রহ্মা পর্বতের পাদদেশে অসিত কাননে। তুষারশীতল মূল-শিবিরে বসে আমরা আপনাদের শুভেচ্ছা কামনা করি।

কাজটা সহজ নয় কারণ আমাদের সকল শুভানুধ্যায়ী এবং ভারতের সমস্ত পর্বতারোহণ সংস্থাকে চিঠি পাঠাতে হবে। অন্তত শ'চারেক চিঠি লেখা, নেতার সই করা, ঠিকানা লিখে ডাকটিকেট লাগানো— সব মিলে রীতিমত রাজসূয় যজ্ঞ। তাও মাত্র দিন দুয়েকের মধ্যে সেরে ফেলতে হবে। ঠিক হয়েছে পরশু সকালে বড়-রসিদ চিঠি নিয়ে সুয়েদ রওনা হবে।

নেতা নির্দেশ দিয়েছে শৈলেশ রঞ্জু ও আমাকে এই কাজটি করতে হবে, সে এবং জয় আমাদের সঙ্গে থাকবে। তার মধ্যে আবার রঞ্জুর ওষুধ গোছানো রয়েছে।

নেতা গতকালই সবার 'ডিউটি' ভাগ করে দিয়েছে। গোরা রসিদ ব্রাদার্সকে নিয়ে রান্না করবে। আজ পেটভরা ভাল খাবার চাই। কারণ গত চারদিন ঠিকমত খাওয়া হয় নি।

গৌতম শিবু জগদীশ ও টুলটুল পর্বতারোহণের সাজ-সরঞ্জাম ও রসদ গোছগাছ করবে। দুজন 'হ্যাপ্' তাদের সঙ্গে থাকবে। এর ওপরে ক্রিস বনিংটন মাত্র দুটি শিবির করে ব্রহ্মা-১ শিখরে আরোহণ করেছিলেন। অবরোহণের পথে, তাঁরা উন্মুক্ত আকাশতলে বরফের ওপরে রাত্রিবাস বা bivouac করেছেন। আবার জাপানী অভি-যাত্রীরা মূল-শিবিরের ওপরে চারটি শিবির স্থাপন করে শিখরে আরোহণ করেছেন। এর কোনটাই সম্ভব নয় আমাদের পক্ষে। আমাদের দলে যেমন ক্রিস বনিংটনের মতো পর্বতারোহী নেই, তেমনি আমরা জাপানীদের মতো অঢেল সাজ-সরঞ্জাম ও রসদ নিয়ে আসি নি।

অতএব আমাদের মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে হবে। আমরা ষোলো থেকে বিশ হাজার ফুটের মধ্যে তিনটি শিবির স্থাপন করব। তাই প্রয়োজনীয় সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম ও রসদ পৃথক পৃথক ভাবে 'প্যাক' করে শিবিরের নাম লিখে ফেলতে হবে। ঠিক হয়েছে আগামীকাল থেকে ওপরে মাল পাঠানো শুরু করা হবে।

তপন ও কৃষ্ণ শেরপা পল্‌দিন ও নিমাকে নিয়ে এক নম্বর শিবিরের

পথ আর জায়গা দেখতে বের হচ্ছে। গতকাল বিকেলেই লা[illegible] কাপড় কেটে গাছের ডালের সঙ্গে বেঁধে বেশ কিছু মার্কিং ফ্ল্যাগ তৈরি করে ফেলা হয়েছে। ওরা সেই নিশান দিয়ে পথ চিহ্নিত করতে করতে এগিয়ে যাবে। যাতে পরে পথ ভুল না হয়। হিমালয় পথ-ভোলা পথিকের জন্য নয়।

তপন ও গৌতম মালবাহকদের পাওনা মিটিয়ে দিল। ওরা বিদায় নিচ্ছে। বিদায় সর্বদা বেদনাদায়ক। দুটি দিন ধরে ওরা সবাই সর্বশক্তি দিয়ে সেবা করেছে আমাদের। তাই সবার জন্যই খারাপ লাগছে। তাহলেও বেশি কষ্ট হচ্ছে মেট ও ঠাকুরজীর জন্য।

পরশু দোবাতি পৌঁছবার কিছু আগে ক্লান্ত-মালবাহকরা সেই পাথুরে প্রান্তরে বসে পড়েছিল। আর এগোতে চাইছিল না। তখন ঠাকুরজী তাদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে দোবাতি নিয়ে এসেছে।

আর মেটসাব? তার তুলনা সে নিজেই। এমন শান্ত ধীর-স্থির ও সদাহাস্যময় মানুষ সংসারে খুব কমই পাওয়া যায়। গত দুটি দিন আমরা যে যখন যা বলেছি, মানুষটি সাধ্যমত তা করার চেষ্টা করেছে। সর্বদা আমাদের পথ চলায় উৎসাহ দিয়েছে আর অমূল্যকে ছায়ার মতো অনুসরণ করেছে।

এই মানুষগুলো এখন চলে যাচ্ছে আমাদের ছেড়ে। পর্বতাভি-যানের তাই নিয়ম। যারা জীবন বিপন্ন করে আমাদের জীবন রক্ষা করে, এমনি করে তাদের দিতে হয় বিদায়। তাও তো এরা মাত্র দুদিনের সঙ্গী। যারা অনেকদিন ধরে আমাদের সেবা করবে, সেই পল্‌দিন নিমা রাম পেয়ার আর রসিদদের কাছ থেকেও একদিন এমনি অতর্কিতে নিতে হবে বিদায়। আর তখুনি প্রথম বুঝতে পারব, আজকের এই আপনজনেরা কেউ আমার আপন নয়।

করমর্দন করে, জড়িয়ে ধরে, সাফল্য কামনা করে ওরা বিদায় নিল। আমরা তাঁবুর বাইরে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রইলাম ঘরমুখো মানুষগুলোর দিকে। বার বার ওরা পেছন ফিরে হাত নাড়ছে, আমরাও হাত নাড়ছি। একসময় ওরা গ্রাবরেখার বাঁকে অদৃশ্য

হয়ে গেল।

ওদের বিদায় দেবার ব্যস্ততায় এতক্ষণ ভাল করে ব্রহ্মাজীর দিকে তাকাবার অবকাশ পাই নি। এবারে তাঁর দিকে তাকাই। তাঁর গায়ে এখনো সোনালী চাদর। তিনি প্রশান্ত দৃষ্টিতে আমাদের দিকে চেয়ে রয়েছেন। আশীর্বাদ করছেন কি?

নিশ্চয়ই। নইলে তিনি এমন শান্ত থাকবেন কেন? গতকাল বিকেল থেকে আমরা একটা তুষার ধসের শব্দ পর্যন্ত শুনতে পাই নি।

আগেই বলেছি এখানে নদী নেই, খানিকটা দূরে একটা ছোট জলপ্রপাত রয়েছে। তার শব্দ শোনা যাচ্ছে। ভাল লাগছে। অথচ শব্দ সভ্যতার অভিশাপ। যন্ত্রসভ্যতার সকল দূষণের মধ্যে শব্দ-দূষণ বোধকরি মানুষের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করছে। তবু অন্তহীন নৈঃশব্দ্য মানুষকে অস্থির করে তোলে। শব্দ ছাড়া আমরা বাঁচতে পারি না। শব্দহীন জগৎকে মৃত্যুপুরী বলে মনে হয়। তাই ঐ জলের শব্দটাকে জীবনের স্পন্দন বলে মনে হচ্ছে। তাছাড়া ঐ জল তো যেমন-তেমন জল নয়। ঐ জলধারা যে সৃষ্টিকর্তার কমণ্ডলু নিঃসৃত ব্রহ্মবারি।

কৃষ্ণ তপন পল্‌দিন ও নিমা একেবারে তৈরি হয়ে কিচেনের সামনে এসে হাজির হল। আজ ওরা মাল বইছে না। তবে সবাই রুকস্যাক্ পিঠে নিয়েছে। ওতে আছে খাবার ও প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম। খাবার বলতে কিছু বিস্কুট চকোলেট আর ফলের রস। সাজ-সরঞ্জাম মানে ক্লাইম্বিং-গীয়ার—রোপ, ক্যারাবিনার, পিটন, ক্র্যাম্পন, জুমার, টর্চ, বাইনোকুলার, ক্যামেরা ইত্যাদি। আর নিয়েছে মার্কিং ফ্ল্যাগ। ওরা সকলেই ক্লাইম্বিং বুট পরে নিয়েছে।

পরোটা তরকারী ও হালুয়া দিয়ে ব্রেকফাস্ট করা হবে আজ। রাম সেই খাবারই ওদের দেয়। খেতে খেতে ওরা কাজের কথা বলে।

সব শুনে নেতা নির্দেশ দেয়—কাজ শেষ করে বেলা একটার মধ্যে এখানে ফিরে আসবে। সবাই একসঙ্গে লাঞ্চ করব।

পল্‌দিন বলে—আমরা চেষ্টা করব। তবে যদি কোন কারণে দেরি

হয়ে যায়, চিন্তা করবেন না। আপনারা খেয়ে নেবেন। আমরা এসে লাঞ্চ্ করে নেব।

—কিন্তু তোমরা চেষ্টা করবে একটার মধ্যে ফিরে আসার।

চারজনেই মাথা নাড়ে। পেয়ার ওদের মগে চা ঢেলে দেয়। চায়ে চুমুক দিতে দিতে ওরা আবার ম্যাপ খুলে অমূল্য ও গৌতমের সঙ্গে আরেকবার আলোচনা করে নেয়।

তারপরে একে একে আমাদের সবার সঙ্গে করমর্দন করে। ওপর-দিকে তাকিয়ে ব্রহ্মাজীকে প্রণাম করে। আমরাও প্রণাম করি তাঁকে। তাঁর কাছে ওদের কুশল কামনা করি।

অবশেষে চার পর্বতারোহী এগিয়ে চলে ব্রহ্মা পর্বতের দিকে। রঞ্জু চিৎকার করে ওঠে—ব্রহ্মাজীকি···

—জয়। আমরা সমস্বরে জয়ধ্বনি দিই। ওরাও আমাদের সঙ্গে গলা মেলায়

ওরা এগিয়ে চলে, আমরা দাঁড়িয়ে থাকি। কয়েক মিনিট বাদে ওরা ব্রহ্মা হিমবাহে মিলিয়ে যায়।

আমরা ফিরে আসি কিচেনের সামনে। ব্রেকফাস্ট করি

কলকাতা ছাড়ার পরে এত ভাল জলখাবার জোটে নি। কিন্তু তাও কি ধীরে সুস্থে খাবার উপায় আছে? নেতা তাগিদ লাগায়—তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে যে যার কাজে লেগে যাও। নটা বেজে গেছে, বহুকাজ পড়ে আছে। অযথা সময় নষ্ট ক'রো না।

অতএব তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে শৈলেশ ও রঞ্জুর সঙ্গে তাঁবুর ভেতরে আসি। কিন্তু একি কাণ্ড! এসে দেখছি রীতিমত গরম। এখুনি এই, দুপুরে কি হবে? অথচ তাঁবু ছাড়া তো আর ছায়া নেই এই বৃক্ষহীন পাথুরে প্রান্তরে।

নেতা বাইরে দাঁড়িয়ে সাজ-সরঞ্জাম দেখছে। আমাদের কথাবার্তা তার কানে গেছে। সে বলে—তাঁবুর দুটো দরজাই সম্পূর্ণ খুলে দাও। দেখবে হাওয়া আসবে। বাইরে বেশ হাওয়া আছে।

তাই করি। রঞ্জু ওষুধ নিয়ে বসে, আমি ও শৈলেশ কার্ড লিখতে

শুরু করি।

ওদের কথাবার্তাও আমাদের কানে আসছে। ওরা খুবই মুশকিলে পড়েছে। এত ছুটোছুটি করে এতগুলো টাকা ভাড়া দিয়ে সাজ-সরঞ্জাম আনা হয়েছে। কিন্তু এগুলো দিয়ে আমাদের কতটা কাজ হবে, তা বোধকরি ব্রহ্মাজীও বলতে পারেন না। বুটগুলো লোহার মতো শক্ত, বেশ কয়েকটার 'সোল্' ফেটে গিয়েছে। অধিকাংশ বুটে ক্র্যাম্পন 'ফিট' করা যাচ্ছে না, সাইজের গোলমাল।

বাধ্য হয়ে নেতা বলছে—খুঁজে-পেতে নিজের জুতো বেছে নিয়ে আজই ভাল করে grease মাখিয়ে রাখো, কাল সকালে খানিকটা নরম হয়ে যাবে।

কিন্তু কেবল তো জুতো-সমস্যা নয়, সমস্ত সাজ-সরঞ্জামই প্রায় সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে। স্লীপিং ব্যাগের পালক জায়গায় জায়গায় জড়ো হয়ে আছে। এয়ার-ম্যাট্রেস ফুলছে না, ফুটো হয়ে গেছে। ক্র্যাম্পনের সাইজ ঠিক নেই। উইণ্ড-প্রুফ, ফেদার-জ্যাকেট, গ্লাভস কোনটাই অক্ষত নয়। পিটনগুলো দিয়ে কতটা কাজ হবে বোঝা যাচ্ছে না। আরও অনেক সমস্যা।

তাহলেও বেলা একটার মধ্যে ওদের কাজ অনেকটা এগিয়ে যায়। রঞ্জুও শিবির এবং সদস্যদের সংখ্যা অনুযায়ী ওষুধ-পত্র গুছিয়ে ফেলেছে। শেষদিকে জয় ও টুল্‌টুল্ ওকে সাহায্য করেছে। কেবল বাকি রয়ে গেল আমাদের কাজ। থাকবারই কথা। চার শ' চিঠি কি চার ঘণ্টায় লেখা যায়? খেয়ে নিয়ে আবার বসতে হবে। শুধু আমাদের দুজনের দ্বারা সম্ভব নয়, আরও কয়েকজনের সাহায্য দরকার। তা নেওয়া যাবে, এখন তো খেয়ে নেওয়া যাক। একটা বেজে গেছে। গোরা তাগিদ দিচ্ছে।

কিন্তু ওরা ফিরে এলো না যে!

—চার ঘণ্টার মধ্যে ওরা ফিরে আসতে পারবে না আমি জানতাম। পাছে বেশি দেরি করে, তাই আমি একটার মধ্যে ফিরে আসার কথা বলেছি।

এতক্ষণে অমূল্য মনের কথা প্রকাশ করে। গৌতম বলে—তাহলে আমরা খেয়ে নিই, কি বল লীডার ?

—নিশ্চয়ই। গোরা বলছে, আজ নাকি একেবারে থ্রি-কোর্স লাঞ্চ্, ভাত ডাল শাকের তরকারী ও ডিমের ঝোল।

—আরও আছে, পাপড় ও আচার। ম্যানেজার যোগ করে।

অতএব আর দেরি নয়। কাগজপত্র গুছিয়ে রেখে বেরিয়ে আসি তাঁবু থেকে। তখন ঠিকই ভেবেছিলাম। ঝরণায় জল এসে গিয়েছে। কিচেনের সামনে বসে সেই জলে ছোট-রসিদ থালা—মগ ধুয়ে নিচ্ছে।

হঁ্যা, আজ আমরা সত্যই হট্-লাঞ্চ্ খাচ্ছি। গোরা রেঁধেছেও চমৎকার। বিশেষ করে সোনামুগের ডালটা !

খাওয়াটা বড্ড বেশি হয়ে গেল। আবার ঘুম না পেয়ে যায়। একে তো অনেক কাজ পড়ে আছে, তার ওপরে দুপুরে ঘুমোলে রাতে বিপদে পড়ে যাবো।

উচ্চ-হিমালয়ে এসে প্রায় প্রত্যেকের ঘুম কমে যায়। অথচ এখানে রাত বড়ই দীর্ঘ। সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে নেমে আসে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। সবাই তাঁবুতে ঢুকে স্লীপিং ব্যাগে আশ্রয় নেয়। পরদিন রোদ ওঠার আগে সে আশ্রয় ত্যাগ করতে মন চায় না। অর্থাৎ সন্ধ্যে আটটা থেকে সকাল আটটা পর্যন্ত শুয়ে থাকতে হয়। অথচ অতক্ষণ ঘুমিয়ে থাকা সম্ভব নয়। তার ওপরে যদি আবার দিবানিদ্রা দেওয়া যায়। তাহলে, বলা বাহুল্য, নিদ্রাহীন রাত অতিবাহিত করতে হবে।

কৃষ্ণ তপন ও শেরপাদের খাবার রেখে দিয়ে হ্যাপ্ ও ল্যাপ্রা খেয়ে নিল। হ্যাপ্রা গিয়ে তাঁবুতে ঢুকল আর ল্যাপ্রা বাসনপত্র পরিষ্কার করতে লেগে গেল। বড়-রসিদ গোরাকে বলে—সাব্, আপনি এখন তাঁবুতে গিয়ে শুয়ে পড়ুন, ওপর থেকে সাব্রা এলে, আমি তাদের খাবার গরম করে দেব।

তা না হয় দেবে। কিন্তু ওদের এত দেরি হচ্ছে কেন ? বেলা

আড়াইটে বেজে গেছে। ওরা মাল নিয়ে যায় নি। জায়গাটা খুব দূরেও নাকি নয়। শুনেছি ব্রহ্মা হিমবাহ ধরে খানিকটা উত্তর-পুবে এগিয়ে ব্রহ্মা পর্বতের গা বেয়ে হাজার দুয়েক ফুট ওপরে উঠতে হবে। তাছাড়া পথে বোধকরি বরফ নেই। তাহলে ওদের এত দেরি হচ্ছে কেন ?

পর্বতাভিযানে আসার সবচেয়ে বড় যন্ত্রণা এই দুশ্চিন্তা। বিশেষ করে আমার মতো মূল-শিবিরবাসীদের। ওপরে যারা যায়, তারা জীবন তুচ্ছ করে এগিয়ে চলে। তারা সারাদিন অমানুষিক পরিশ্রম করে, সারারাত তুষারঝড়ে কাটায়। দুঃসহ শীত, অনাহার আর অনিদ্রা তাদের নিত্যসাথী। কিন্তু তাদের কর্মময় জীবনে দুশ্চিন্তার অবকাশ থাকে না। আর আমাদের, আমরা যারা মূল-শিবিরে থাকি, সহযাত্রীদের জন্য দুশ্চিন্তা করাই আমাদের সবচেয়ে বড় কাজ। ওদের অগ্রগতি, ওদের স্বাস্থ্য, ওদের নিরাপত্তা আর ওপরের আবহাওয়া—আরও কত চিন্তা।

কিন্তু কি করব ? জীবনদেবতা যার ভাগ্যে যা লিখে রেখেছেন। কেদারনাথ পর্বতাভিযানে (২২, ৭৭০´) গিয়ে কেবল উনিশ হাজার ফুট উঁচুতে তুষারাবৃত এক নম্বর শিবিরে কয়েকজন পর্বতারোহী সদস্যের সঙ্গে কয়েকটা দিন কাটাতে পেরেছিলাম। কিন্তু তারপর থেকে যতবার এসেছি, মূল-শিবির আর অগ্রবর্তী মূল-শিবিরেই অভিযানের দিনগুলো কেবল দুশ্চিন্তা করে কেটে গিয়েছে। আর এবারে ? এবারে তো বয়স আরও বেড়েছে। তার ওপরে নেতার পায়ে চোট। এবারে ওপরে যাবার কোন প্রশ্নই ওঠে না। অতএব দুশ্চিন্তার তো সবে শুরু।

তাই বলে আমরা বসে থাকি না। পর্বতাভিযানে সময় নষ্ট করবার সময় নেই। কাজ চলতে থাকে। আমরা চিঠি লিখছি, ওরা সাজ-সরঞ্জাম ঠিক করছে।

খাবার পর থেকে রঞ্জু জয় ও গৌতম আমাদের সাহায্য করছে। অমূল্য এসে তাঁবুতে বসেছে। সে চিঠি সই করছে। আর মাঝে

মাঝে ঝুঁকে পড়ে দরজা দিয়ে হিমবাহের দিকে তাকাচ্ছে। মুখে যাই বলুক, ওর চাইতে বেশি চিন্তা কেউ করছে না। করার কথাও নয়। কারণ সে নেতা।

মনে যা-ই থাক, আমিও কিন্তু মুখে কিছু বলছি না। নিজের কাজ করে চলেছি। তবে ঘড়ি দেখছি।

না, আর শান্ত থাকা সম্ভব নয়। চারটে বাজে। যাদের একটার মধ্যে আসতে বলা হয়েছে, তারা চারটেয় না এলে কলকাতায় পর্যন্ত চিন্তা হয়। আর এখানে, এই অচেনা দুর্গম ও ভয়ঙ্কর পথে! তাহলে কি কোন দুর্ঘটনা, কিংবা পথ ভুল হয়েছে?

হতে পারে। আরও অনেক কিছুই হতে পারে।

আর চুপ করে থাকা গেল না। আমি বলি—চা-বিস্কুট টর্চ এবং ফার্স্ট-এড্ বক্স দিয়ে দুজনকে ওপরে পাঠালে হত না?

অমূল্য আমার কথা শোনে। কিন্তু বলে না কিছু। সে গৌতমের দিকে তাকায়। গৌতম আপত্তি করে। বলে—না, না, তুমি অযথা চিন্তা করছ শঙ্কুদা! পথ ভাল, আবহাওয়া ভাল। 'রেসকিউ পার্টি' পাঠাবার কোন দরকার নেই। ওরা এখুনি এসে যাবে। তবে সাড়ে চারটে বাজে, এবারে চায়ের জল চড়ানো যেতে পারে। আমাদেরও চায়ের সময় হয়ে গেছে।

—সাবাস ডেপুটি! নেতা সহনেতাকে তারিফ করে। তারপরে ডাক দেয়—গোরা, দি হেড-কুক্, টী প্লীজ।

গোরা ঘুমিয়ে পড়েছিল। নেতার ডাকে তার ঘুম ভেঙে যায়। সে উত্তর দেয়—সরি লীডার!

—মানে? নেতার স্বরে কৃত্রিম গাম্ভীর্য।

—মানে খুব সহজ। আমি চা বানাতে পারব না।

—পারবে না মানে। তুমি হেড-কুক্ নও?

—হেড-কুক্ কখনও চা বানায় না।

—কে বানায় তাহলে?

কিন্তু গোরা সে প্রশ্নের জবাব দেবার আগেই শিবু ডাক দেয়—

রাম সিং!

জগদীশ হাঁক দেয়—রসিদ!

শিবু আবার বলে—রাম সিং চায় বানাও!

জগদীশ যোগ করে—জল্‌দি।

কয়েক মিনিট বাদে স্টোভের শব্দ কানে আসে। আমরাও বেরিয়ে আসি বাইরে।

পাঁচটা বাজে। কিন্তু এখনও চারিদিকে ঝকঝকে রোদ। গৌতম বলে—এ রকম আবহাওয়া পেলে দশদিনের মধ্যে ক্লাইম্ব্‌ হয়ে যাবে।

—নিশ্চয়ই। জগদীশ ও শিবু সমর্থন করে তাকে।

ওরা পর্বতারোহী তাই পর্বতারোহণের কথা বলছে। আমি ব্রহ্মলোকের পথিক। আমি ব্রহ্মাজীর দিকে তাকাই। তিনি তেমনি শান্ত, তেমনি সৌম্য, তেমনি সুন্দর। করুণাঘন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছেন আমাদের দিকে। আশীর্বাদ করছেন কি? নিশ্চয়ই। আমরা যে ব্রহ্মলোকে এসেছি। তাঁর পদতলে আশ্রয় নিয়েছি। কৃষ্ণ তপন ও শেরপারা নিশ্চয়ই ভাল আছে। এখুনি ফিরে আসবে।

চা হয়ে যায়। ছোট-রসিদ মগ নিয়ে আসে, বড়-রসিদ পরিবেশন করে। আমরা চায়ে চুমুক দিতে দিতে হিমবাহের দিকে তাকিয়ে রয়েছি।

—এসে গেছে, ওরা এসে গেছে।

তাঁবুর ভেতর থেকে সহসা জয়ের চিৎকার ভেসে আসে! তাড়াতাড়ি হিমবাহের দিকে তাকাই। না। কোথাও কাউকে দেখতে পাচ্ছি না তো!

জয় বেরিয়ে এসেছে। তার হাতে বাইনোকুলার। এতক্ষণে ওর চিৎকারের কারণ বুঝতে পারি। আমরা বেরিয়ে আসার পর থেকেই সে তাঁবুতে বসে বাইনোকুলার দিয়ে হিমবাহের দিকে নজর রেখেছিল ইচ্ছে করেই বাইরে বের হয় নি। আমরা দুটি বাইনোকুলার নিয়ে এসেছি। তার একটা কৃষ্ণ নিয়ে গেছে। ওটা নিয়ে বাইরে এলেই কাড়াকাড়ি পড়ে যেতো।

তাই পড়ে গেল। বাইনোকুলার নিয়ে জয় বাইরে আসতেই গৌতম হাত বাড়ালো। বলল—বড়দা, দে তো আমাকে। একবার দেখি।

একে ছোটভাই, তার ওপরে সহনেতা। জয় দূরবীণটা গৌতমের হাতে দিয়ে বলে—ঐ যে প্রকাণ্ড পাথরটা দাঁড়িয়ে আছে। ওটার বাঁদিকে দেখ, ওরা নেমে আসছে।

গৌতম চোখে দূরবীণ লাগায়। আমরা ওর দিকে তাকিয়ে থাকি। একটু বাদে গৌতম বলে ওঠে—হ্যাঁ, বড়দা ঠিকই দেখেছে লীডার! ওরা আসছে।

—দেখি, দেখি, আমাকে একটু দে তো! মুখে বললেও দেবার অপেক্ষা করে না রঞ্জু। সে গৌতমের হাত থেকে বাইনোকুলারটা প্রায় কেড়ে নিয়ে নিজের চোখে লাগায়।

তারপরে একে একে শিবু শৈলেশ জয় জগদীশ গোরা ও টুলটুল হয়ে দূরবীণটা নেতার হাতে এলো। কিন্তু নেতা সেটা চোখে না লাগিয়ে জয়ের হাতে ফিরিয়ে দিল। বলল—আমার আর বাইনোকুলারের দরকার নেই, কারণ আমি ওদের খালি চোখেই দেখতে পাচ্ছি।

সত্যই তাই। আমিও দেখতে পাচ্ছি। শুধু আমি নই, আমরা সবাই।

ওরা আসছে। প্রথমে পল্‌দিন, তারপরে কৃষ্ণ আর তপন। সবার শেষে নিমা।

আমরা সমস্বরে চিৎকার করে ওদের স্বাগত জানাই। ওরাও হাত নাড়ে।

ওরা কাছে আসে, রুক্‌স্যাক্‌ নামায়। ছোট-রসিদ ওদের চা দেয়। অমূল্য জিজ্ঞেস করে, ভাত খাবে তো? গরম করে দেবে।

—তাই তো ভাল। কৃষ্ণ বলে। সে তপনের দিকে তাকায়।

তপন শুধু বলে—বড্ড খিদে পেয়েছে!

—তা তো পাবেই, সারাদিন না খাওয়া। গৌতম বলে।

খেতে খেতে ওরা কাজের কথা বলে। অপ্রত্যাশিত সুসংবাদ দেয়। শুধু এক নম্বর নয়, ওরা দু নম্বর শিবিরের জায়গাও দেখে এসেছে।

—সাবাস পল্‌দিন, সাবাস নিমা! নেতা প্রথমে শেরপাদের বাহবা দেয়। তাই নিয়ম। তারপরে কৃষ্ণ ও তপনকে বলে—তোমরা প্যাক্-লাঞ্চ্ নিয়ে গেলেই ভাল করতে।

—আমরা কি আগের থেকে জানতাম যে একদিনে এতটা পারব? তপন বলে।

—তবে পল্‌দিনের উৎসাহেই সম্ভব হয়েছে। কৃষ্ণ যোগ করে।

—কেয়া পল্‌দিন, কেয়া কিয়া তুমনে? তুম তো কামাল কর্ দিয়া ভাই!

নেতার প্রশংসায় যেন একটু লজ্জা পায় পল্‌দিন। মাথা নত করে কোনমতে বলে—কেয়া কিয়া সাব, জায়দা কুছ নহী কিয়া। সাব্‌লোগ ভি বহত অচ্ছা চলতে।

—দেখলেন। নেতার দিকে তাকিয়ে তপন বলতে থাকে—আপনি তো বলেন, আমি ইন্‌স্ট্রাক্টরদের ঘুষ দিয়ে মাউণ্টেনীয়ারিং ট্রেনিং-য়ের সার্টিফিকেট যোগাড় করেছি। শুনুন, আপনার শেরপা সর্দার কি বলছে?

—শুনেছি। কিন্তু পল্‌দিন তোমার কথা বলছে না, বলছে কৃষ্ণের কথা। অমূল্য গম্ভীর স্বরে উত্তর দেয়।

আমরাও গম্ভীর থাকার চেষ্টা করি।

তপন প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে—কখ্‌খনো নয়, পল্‌দিন আমাদের দুজনের কথাই বলেছে। একবার থামে সে। তারপরে পল্‌দিনের কাছে এগিয়ে এসে অনুরোধ করে—পল্‌দিন ভাইয়া, বোলো হাম ক্যাঁয়সে চলা?

পল্‌দিন চালাক ছেলে। সে বুঝতে পারে, নেতা তপনের সঙ্গে ঠাট্টা করছে। তাই সে অন্য কথা বলে—অভি খানা তো খা লেও সাব!

—না, তুম বাতাও, হামনে ক্যাঁয়সে চলা?

—বহুত অচ্ছা। নিমা পাশ থেকে বলে ওঠে। সে পল্‌দিনের চেয়ে বয়সে বড়। সোজা-সরল মানুষ। সে নেতার মতলব বুঝতে পারে নি।

তাই ওর কথা শুনে আমরা সবাই হো হো করে হেসে উঠি। নেতাও সে হাসিতে যোগ দেয়। তার মতলব মাঠে মারা গেছে।

ওদের খাওয়া হতেই রোদ মিলিয়ে গেল। মিলিয়ে গেল ওপারের পাহাড় আর হিমবাহের ওপর থেকে, মিলিয়ে গেল আমাদের শিবির থেকে, এককথায় ব্রহ্মলোকের বুক থেকে। সন্ধ্যা নেমে আসছে ব্রহ্মলোকে। এখুনি সে আঁধারে বিলীন হবে।

জানি সে আঁধার ক্ষণস্থায়ী। কিছুক্ষণ বাদেই চাঁদ উঠবে। মুহূর্তে ব্রহ্মলোক রূপান্তরিত হবে অমৃতলোকে। তখন আবার আসা যাবে বাইরে। এখন বড্ড ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। তাড়াতাড়ি তাঁবুতে গিয়ে গরম-পোশাক পরে নেওয়া যাক। এই এক বিচিত্র ব্যাপার হিমবাহ অঞ্চলে। যতক্ষণ রোদ ততক্ষণ জীবন। রোদ মিলিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুপুরী।

তাঁবুতে এসে তাড়াতাড়ি মোজা, সোয়েটার, উইণ্ড-প্রুফ আর টুপি পরে নিয়ে ম্যাট্রেসের ওপর এসে বসি। শুধু আমি নই, সবাই তাই করে। কি করবে, ব্রহ্মলোকে দ্বিতীয় রাত সমাগত।

একটু বাদে বড়-রসিদ পেট্রোম্যাক্স ধরিয়ে নিয়ে আসে। তাঁবু আলো ঝলমল হয়ে ওঠে। নেতা রসিদকে বলে—চায় বানাও!

সহনেতা যোগ করে—চানাচুর নিকালো!

নেতা আবার বলে—চায় কি বাদ শেরপালোগ আউর হ্যাপ্‌-লোগকো ভি ইধর বোলাও। তোম দোনো ভি আ যাও। গানা হোগী।

আগামী কাল খুব সকালেই পর্বতারোহী ও শেরপারা স্থায়ীভাবে ওপরে চলে যাবে। গোরা টুলটুল হ্যাপ্‌ এবং ল্যাপরাও ওদের সঙ্গে মাল নিয়ে ওপরে যাবে। কিন্তু মাল ফেলে তারা আবার নেমে আসবে। পরশু হ্যাপ্‌রা ওপরে চলে যাবে আর বড়-রসিদ ডাক নিয়ে সুয়েদ যাবে। সুতরাং অভিযানের প্রথম পর্বে আজই আমাদের শেষ মিলনসন্ধ্যা। তাই নেতা আজকের সন্ধ্যাটিকে গানের ডালি দিয়ে

সাজিয়ে তুলতে চাইছে।

নেতার ইচ্ছা পূর্ণ হল। চা ও চানাচুর পরিবেশনের পরে শুরু হল গান। প্রথমে পল্‌দিন নেপালী গান গাইল। তারপরে পেয়ার সিং গাড়োয়ালী ও বড়-রসিদ কিশ্‌তোয়ারী লোকসঙ্গীত। ওদের পরে রঞ্জুও গাইল একটা ইংরেজী গান। তারপরে শুরু হল শৈলেশের ভজন। ওর গানের গলাটি বড়ই মিঠে। তার ওপরে টুলটুল সসপ্যান ও জয় মগ বাজিয়ে বেশ ভাল সঙ্গত করছে। ব্রহ্মলোক মুখরিত হয়ে উঠেছে দামাল যুবকদের ভক্তিসঙ্গীতে।

অবশেষে শুরু হয় ক্লাবের সমবেত সঙ্গীত। ব্রহ্মলোকে বসে আমরা ব্রহ্মাজীকে গান গেয়ে শোনাই, জীবনের জয়গান—

'ঝঞ্ঝা ঝড় মৃত্যু দুবিপাক—
ভয় যারা পায়, তাদের ছায়া দূর মিলাক্।
আমরা অগ্নিদহনে দীপ্ত দহনে
জীবন করেছি জয়,
আর শত নিষেধের বাধা বন্ধনে
দুঃখ করেছি ক্ষয়।
এবার নয় কাঁদন, ক্ষয় বাঁধন, সামনে দিন—
আজ দুঃখ শেষ, স্বপ্নাবেশ দূর পালাক্।
ঝঞ্ঝা ঝড় মৃত্যু······ছায়া দূর মিলাক্॥
আমরা জয় করেছি দুঃখকষ্ট
জয় করেছি ভয়,
আর জেনেছি এবার মোদের
মৃত্যু হবার নয়।
তাই ব্যর্থ নয়, ব্যর্থ নয় এই চলা;
আজ শঙ্কাহীন মৃত্যুহীন পথ চলা;
ঝঞ্ঝা ঝড় মৃত্যু······ছায়া দূর মিলাক।'

॥ এগারো ॥

আজ সকালে ঠিকসময়ে ঘুম ভেঙে গেল। তাহলে কি উচ্চতার প্রভাব কাটিয়ে উঠেছি? আমার শরীর ও মন কি এই আবহাওয়ায় অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে?

থাক্ গে আমার কথা, অভিযানের কথা ভাবা যাক্। আজ গৌতম শিবু জগদীশ কৃষ্ণ ও তপন শেরপাদের নিয়ে এক নম্বর শিবিরে চলে যাবে। গোরা ও টুলটুল হ্যাপ্ এবং ল্যাপ্‌দের নিয়ে ওদের সঙ্গে যাবে। ওরা এক নম্বরে মাল ফেরী করবে।

আজ তাই সকালে ঘুম থেকে ওঠার দরকার ছিল। ভালই হল, আমার ঘুম ভেঙে গেছে। এবারে চায়ের বন্দোবস্ত করা দরকার। গরম চায়ের মগ হাতে না ধরিয়ে দিলে বাবুরা কেউ স্লীপিং ব্যাগের মায়া ছাড়বেন না।

উঠে বসি। সোয়েটার ও উইণ্ডপ্রুফ গায়ে চাপাই জুতো পরে বাইরে আসি।

হ্যাঁ, চারিদিক ফর্সা হয়ে গেছে। কেনই বা হবে না। পৌনে ছ'টা বাজে।

নালায় জল নেই। কিন্তু কাল রাতে রসিদ কিচেনের সামনে দু বালতি জল ধরে রেখেছে। তাই দিয়ে চোখ-মুখ ধুয়ে নিই। জল তো নয়, বরফ। হাত জমে যেতে চাইছে।

রুমালে হাত মুছে দুহাত ঘষতে ঘষতে হ্যাপ্‌দের তাঁবুর সামনে আসি। রাম ও পেয়ারকে ডাকি। সাড়া পাই নে। ওরা অঘোরে ঘুমুচ্ছে।

ঘুমাক। ল্যাপ্‌দের ডাকা যাক। ওদের তাঁবুর সামনে এসে ডাক দিই—রসিদ।

—জী সাব্।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সাড়া পাই। ওদের চা বানাতে বলি। তারপরে ফিরে আসি তাঁবুতে।

কিছুক্ষণ বাদে বড়-রসিদ তাঁবুতে ঢুকে বলে—গুড মর্নিং সাব্, বেড টি।

—গুড মর্নিং।

—গুড মর্নিং।...

সদস্যরা একে একে মুখ বের করে। রসিদ তাদের হাতে চায়ের মগ ধরিয়ে দেয়। একে একে সদস্যরা উঠে বসে। সবাই সুপ্রভাত জানায়।

পাঁচ পর্বতারোহী আজ ওপরে চলে যাবে। তারা গতকালই রুক্স্যাক্ গুছিয়ে রেখেছে। এমন কি ক্যামেরা ও বাইনোকুলার পর্যন্ত ভরে রেখেছে। শেরপারাও আজ এক নম্বর শিবিরে চলে যাচ্ছে। তারাও নিজেদের মালপত্র ঠিক করে রেখেছে।

গোরা ও টুলটুল হ্যাপ্ ও ল্যাপ্‌দের নিয়ে ওদের সঙ্গে যাচ্ছে। ওরা মাল পৌঁছে দিয়ে বিকেলে ফিরে আসবে। তারা কে কোন্ মাল নিয়ে যাবে, তাও কাল ঠিক করে রাখা হয়েছে।

আজ আমাদের সমস্যা একটাই। কে রান্না করবে? হেড-কুক্ গোরাকে আজ হাই অল্‌টিচ্যুড পোর্টারের কাজ করতে হবে। শিবু আর জগদীশও আজ ওপরে চলে যাচ্ছে। রাঁধুনী তো হতে চাইলেই হওয়া যায় না, রান্না করতে জানা চাই।

বেশ কয়েক মিনিট আলোচনার পরে সাব্যস্ত হল, আজ জয় ও শৈলেশ রান্নার দায়িত্ব নেবে। রঞ্জু তাদের সাহায্য করবে। এবং রাঁধুনীরা নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করার জন্য ঘোষণা করে—আজ Maggi ও কফি দিয়ে ব্রেক-ফাস্ট হবে আর অভিযাত্রীরা পরোটা ও আলুর তরকারী প্যাক্-লাঞ্চ্ নিয়ে যাবে।

—সাবাস্! এই না হলে ম্যানেজার। নেতা জয়কে বাহবা দেয়। তারপরেই গৌতমকে তাগিদ লাগায়—তোমরা তৈরি হয়ে নাও। ওরাও কিচেনে চলে যাক। সাতটা বাজে। গোরাদের ফিরে

আসতে হবে।

পর্বতারোহীরা তৈরি হবার আগেই কিচেন থেকে 'ব্রেক্-ফাস্ট রেডী' চিৎকার ভেসে এলো।

বাইরে এসে দেখি ম্যাগী তৈরি হয়ে গেছে। দুটো স্টোভ জ্বলছে। একটায় কফির জল ফুটছে, আরেকটায় ওদের প্যাক্-লাঞ্চের পরোটা হচ্ছে।

নেতা আসতেই ম্যানেজার প্রস্তাব দেয়—তোমরাও ওদের সঙ্গে ব্রেক্-ফাস্ট করে নাও, নইলে কফি ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। খাবার মধ্যে ওদের প্যাক্-লাঞ্চ্ তৈরি হয়ে যাবে।

পর্বতাভিযাত্রীকে যে জুতো সেলাই থেকে চণ্ডী পাঠ পর্যন্ত—সবই জানতে হয়, জয় ও রঞ্জু তার প্রমাণ দিয়ে দিল। ম্যাগী এবং কফি দুটোই বেশ ভাল হয়েছে।

পর্বতারোহীরা পিঠে রুক্স্যাক্ নিল। মুহূর্তে মনটা চঞ্চল হয়ে উঠল! ওরা চলে যাচ্ছে। যাচ্ছে অচেনা ও অজানা পথে। যাচ্ছে দুর্গম ও ভয়ঙ্করের মাঝে। মনে পড়ছে পঁচাত্তর সালের জাপানী অভিযানে সহনেতা সাতোরু তাকাচি এবং আঙ ছাতারের কথা, মনে পড়ছে আটাত্তর সালের বৃটিশ অভিযানের জন এবং ডানকানের কথা। তাঁরাও একদিন এইভাবে রুক্স্যাক্ পিঠে তুলে নিয়েছে। সতীর্থদের কাছে বিদায় নিয়ে এগিয়ে গিয়েছে ব্রহ্মা—১ শিখরের দিকে। সে বিদায় শেষ বিদায় হয়েছে। তাঁরা আর ফিরে আসেন নি।

এরাও বিদায় চাইছে। জানি না, আমাদের অদৃষ্টে কি আছে? মনটা তাই অজানা আশঙ্কায় বার বার দুলে উঠছে। আশ্চর্য! মাত্র একমাস আগেও আমি গৌতম শিবু কৃষ্ণ তপন আর জগদীশকে চিনতাম না। অথচ আজ তারা আমার অনুজপ্রতিম প্রিয়। তাদের বিদায় দিতে তাই মন আমার এমন উতলা হয়ে উঠেছে।

তাহলেও আমি আকুলতা প্রকাশ করতে পারব না। উতলা মনকে সংযত করতে হবে। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে সেই চেষ্টাই করতে থাকি। কিন্তু ওদের দিকে চোখ পড়লেই আমার সংযমের বাঁধ ভেঙে যেতে চাইছে।

তাড়াতাড়ি পেছিয়ে আসি খানিকটা। ওদের থেকে দূরে থাকতে চাই।

পারি না। ওরাই কাছে আসে আমার। গৌতম প্রণাম করে। আমার সংযমের বাঁধ ভেঙে যায়। ওকে জড়িয়ে ধরে শিশুর মতো কেঁদে উঠি।

গৌতম সান্ত্বনা দেয়—তোমার কোন ভয় নেই শঙ্কুদা? তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। তোমাদের জন্য জয়মাল্য নিয়ে আসতে পারব কিনা কথা দিতে পারছি না। কিন্তু আমি কথা দিচ্ছি সবাইকে নিয়ে সুস্থ শরীরে তোমার কাছে ফিরে আসব।

—তাই আসিস ভাই! তোর কাছে আমার আর কোন দাবী নেই।

—আপনার এ দাবীর কথা আমরা সব সময় মনে রাখব শঙ্কুদা! আমরা সবাই ফিরে আসব আপনার কাছে। কৃষ্ণ তপন আর শিবুও আশ্বাস দেয় আমাকে।

ভরসা দেয় জগদীশ—আমরা কোন বাড়তি ঝুঁকি নেব না শঙ্কুদা, সবাই সুস্থ শরীরে ফিরে আসব।

বিদায়ের পালা শেষ হয়। ওরা চলতে শুরু করে। আমরা ওদের অনুসরণ করি। পাথর ডিঙ্গিয়ে এগিয়ে চলি। প্রান্তরের প্রান্তে পৌঁছই। সামনেই হিমবাহ।

গৌতম বলে—এবারে তোমরা এসো লীডার! আমাদের আশীর্বাদ করো, আমরা যেন তোমার যোগ্য হয়ে উঠতে পারি।

—আসি শঙ্কুদা, আসি লীডার! জগদীশ কৃষ্ণ আর তপন বলে।

শিবুও বিদায় চায়। বলে—এবারে আমাদের বিদায় দিন।

তাই দিই। আমরা দাঁড়িয়ে থাকি। ওরা এগিয়ে চলে। চেয়ে চেয়ে ওদের দেখি। দেখতে দেখতে একসময় দেখা শেষ হয়। গ্রাব-রেখার পাথুরে পথে ওরা যায় হারিয়ে।

ওরা আমাদের চোখের আড়ালে চলে গেছে। কিন্তু ব্রহ্মাজী দেখতে পাচ্ছেন ওদের। ওরা যে তাঁরই কাছে চলেছে। তাই তাঁকে প্রণাম করে বলি—হে জগৎস্রষ্টা চতুরানন, তুমি ওদের দেখো। ওরা

সৃষ্টিছাড়া হলেও তোমারই সৃষ্টি। তুমি ওদের রক্ষা ক'রো।

ধীর পদক্ষেপে ফিরে আসি শিবিরে। কর্মমুখর প্রাণচঞ্চল অসিত কানন এখন বড় শান্ত, বড়ই ফাঁকা। তাতো হবেই। আঠারোজন মানুষের তেরোজনই চলে গেল।

কিন্তু আমরা পর্বতাভিযানে এসেছি। মূল-শিবির হল পর্বতাভিযানের প্রাণ-ভোমরা। আমাদের তৎপরতার ওপরে সারা অভিযানের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। বিদায় ব্যথায় মুষড়ে পড়ে কাজকর্ম বন্ধ করে দেওয়া চলবে না। অতএব কিছুমাত্র দেরি না করে কাজ শুরু করে দিতে হবে।

তাই করি। জয় ও রঞ্জু কিচেনে চলে যায়। আমাদের জন্য লাঞ্চ আর গোরা ও টুলটুলদের জন্য বিকেলের জলখাবার করে রাখতে হবে। ওরা ফিরে এসে খাবে।

আমি ও শৈলেশ চিঠি লিখতে বসে যাই। আগামীকাল বড়-রসিদ ডাক নিয়ে স্ময়েদ যাবে।

রান্না-খাওয়া আর লেখা-লেখি করতেই সকাল গড়িয়ে বিকেল হয়ে গেল। পাঁচটায় ফিরে এলো গোরা ও টুলটুল। ওদের সঙ্গে রসিদ ব্রাদার্স ও রাম সিং। পেয়ার সিং আসে নি। সে নাকি থেকে গিয়েছে।

কাজটা ঠিক করে নি। পর্বতারোহণে পূর্ব-পরিকল্পনা ছাড়া এক পা-ও এগোনো ঠিক নয়। ঠিক ছিল পেয়ার আজ ফিরে আসবে। সে তার নিজের রুক্স্যাক্ রেখে গিয়েছে। নিয়ে গেছে টিন ফুডের একটা কিট্। ম্যাট্রেস ও স্লীপিংব্যাগ ছাড়া সে রাত কাটাবে কেমন করে? আগামীকাল তার রুক্স্যাক্ পাঠাবার জন্য আমাদের একজন বাড়তি মালবাহক চাই। তার ওপরে আজ ওর থাকার জায়গারও অভাব পড়বে। ওপরে আমরা আজ মোটে তিনটি তাঁবু পাঠিয়েছি, তুটো সদস্যদের একটা শেরপাদের।

মনে মনে যা-ই ভাবুক, নেতা মুখে কিছু বলে না। চা-জলখাবার খাবার পরে টুলটুলকে বলে—এবারে জোরে জোরে গৌতমের চিঠিটা

পড়ে শোনাও। সবাই মিলে শোনা যাক।

টুলটুল চিঠি পড়তে শুরু করে। সহনেতা লিখেছে—

এক নম্বর শিবির (১৬,৮০০´)

প্রিয় নেতা, ১৯.৯. ৮৬

তোমাদের কাছে বিদায় নিয়ে আমরা ব্রহ্মা হিমবাহের সেই পাথর বোঝাই গ্রাবরেখা ধরে ঘণ্টাখানেক প্রায় সোজা পুবে এগিয়ে এসেছি। পথটি যেন গ্রাবরেখার পেট চিড়ে এগিয়ে এসেছে। বলা বাহুল্য খুবই ধীরে ধীরে পথ চলতে হয়েছে।

তারপরে আমরা ডাইনে অর্থাৎ দক্ষিণে বাঁক নিয়েছি। পথের পাথর কমে দেখা দিয়েছে ছাই মাটি বালি আর বরফ। বেশ কয়েকটা চওড়া ফাটল মাঝে মাঝে আমাদের পথরোধ করেছে। অনেকটা করে ঘুরে ঘুরে সেগুলোকে পার হতে হয়েছে। তবে রাস্তা চিনতে অসুবিধে হয় নি। একে তো কৃষ্ণ তপন পলদিন আর নিমা সঙ্গে ছিল। তার ওপরে গতকাল ওরা মার্কিং ফ্ল্যাগ লাগিয়ে পথ চিহ্নিত করে গিয়েছে। মাঝে মাঝেই মনে হয়েছে আমরা এখন ব্রহ্মলোকের লোকেশ্বর।

আরও আধঘণ্টা পথচলার পরে আমরা বাঁয়ে অর্থাৎ উত্তরে বাঁক ফিরেছি। এগিয়ে চলেছি উত্তর-পুবে। হাঁটতে হাঁটতে ব্রহ্মা হিমবাহের উত্তরতীরে চলে এসেছি। চলতে চলতে পৌঁছে গিয়েছি ব্রহ্মা পর্বতের দক্ষিণ-পশ্চিম পর্বতগাত্রে। পাথর নয়, মাটি নয় তৃণাচ্ছাদিত পর্বতগাত্র। দূর থেকে দেখে মনে হয়েছে ব্রহ্মাজী একখানি সবুজ চাদর গায়ে জড়িয়ে রেখেছেন।

তৃণাচ্ছাদিত হলেও পর্বতগাত্রটি কিন্তু মোটেই সমতল নয়। খাড়া উঠে গিয়েছে ওপরে। গিয়ে মিশেছে ব্রহ্মা-১ শিখরের দক্ষিণ-পূর্ব গিরিশিরায়। এই গিরিশিরা ধরে তিয়াত্তর, আটাত্তর ও উনআশি সালের সফলকাম অভিযাত্রীরা শিখরে আরোহণ করেছেন।

কিন্তু আগেই লিখেছি, সবুজ পর্বতগাত্রটি খাড়া উঠে গেছে ওপরে। শুধু তাই নয়, মাঝে মাঝে এত খাড়া যে পিঠে রুকস্যাক্ নিয়ে হামা-

গুড়ি দিয়ে চতুস্পদ প্রাণীর মতো ওপরে উঠতে হয়েছে। কাজটা কঠিন। কারণ আজ আমাদের রুক্‌স্যাক্ খুবই ভারী। কম করেও পঁচিশ কিলো পিঠে চাপিয়ে সেই চড়াই পার হয়ে এসেছি। তবে ঘাস থাকার জন্য পথটি বেশ নিরাপদ। পড়ে যাবার কোন ভয় নেই।

তাহলেও জায়গাটি পার হবার সময় বার বার মনে হয়েছে, এই মসৃণ পথের চেয়ে এবড়ো-খেবড়ো পাথুরে পথ অনেক ভাল ছিল। কিন্তু কি করব? আমাদের সুবিধে হবে বলে ব্রহ্মাজী কি সহজ সরল সমতল রাস্তা বানিয়ে রাখবেন? আর তা যদি সত্যই রাখতেন, তাহলে কি আমরা ব্রহ্মলোকে আসতাম?

যাই হক আরও ঘণ্টাখানেক চলার পরে থামতে হল। সামনে একটা খাড়া পাথরের দেওয়াল। খুবই খাড়া। নতিমাত্রা বোধকরি ৮০ডিগ্রি হবে। নিরেট পাথরের দেওয়াল, ফাঁক ফোকড় ফাটল কিছুই চোখে পড়ছে না। ক্লান্ত দেহ, পিঠে ভারী রুক্‌স্যাক্, এ অবস্থায় ফিক্‌সড রোপ ছাড়া এই দেওয়াল বেয়ে ওঠা খুব কষ্টকর।

তাহলেও সেই কষ্টকর কাজটাই করতে হল। আমরা সাবধানে ও ধীরে ধীরে সেই দেওয়াল বেয়ে উঠে এলাম ওপরে। পৌঁছলাম ব্রহ্মা-১ পর্বতের দক্ষিণ-পূর্ব গিরিশিরার ওপরে। তারপরে সেই গিরিশিরা ধরে কিছুটা উত্তরে এগিয়েই শিবিরের জায়গা পেয়ে গেলাম। মূল-শিবির থেকে এক নম্বর শিবিরে আসতে আমাদের প্রায় পাঁচঘণ্টা লাগল। দূরত্ব বোধকরি চার-পাঁচ কিলোমিটারের মতো। জায়গাটার উচ্চতা ১৬,৮০০ ফুট তার মানে ৫১২১ মিটার।

এখানেও বরফ নেই। বরং কিছু ঘাস আর ঝোপঝাড় রয়েছে আর রয়েছে পাথর। কেবল মাটিতে নয়, চারিদিকে, প্রায় প্রাচীরের মতো। ছোট-ছোট টিলার মতো নিরেট পাথরের স্তূপ। তারই ভেতর দিয়ে উত্তরে তুষারাবৃত ব্রহ্মা-১ শিখরকে দেখা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে ব্রহ্মা হিমবাহকে। প্রায় হাজার দুয়েক ফুট নিচে। দক্ষিণ থেকে পশ্চিমে প্রসারিত। হিমবাহের ওপারে অর্থাৎ পুবে দেখতে পাচ্ছি ব্রহ্মলোকের উচ্চতম শৃঙ্গ সিক্‌ল মুন। দেখতে পাচ্ছি ফ্ল্যাট

টপ আরও কয়েকটি তুষারাবৃত পর্বতশিখর।...

কিন্তু লীডার, আজ আর আমাদের কথা থাক। গোরা টুলটুল রাম আর রসিদদের খাওয়া হয়ে গেছে। ওদের দিনের আলো থাকতে থাকতে মূল-শিবিরে নেমে যেতে হবে। আর দেরি করা উচিত হবে না। যেতে অবশ্য ওদের তিন ঘণ্টার বেশি লাগবে না। কিন্তু যে কোন সময় আবহাওয়া খারাপ হতে পারে।

আরেকটা কথা পেয়ার সিং ফিরে যেতে চাইছে না। ও নিজের রুক্‌স্যাক্ নিয়ে আসে নি, তবু বলছে থাকবে। রাতে অসুবিধে হবে। অথচ ওকে রেখে দিতে হল।

এই সঙ্গে একটা ফর্দ পাঠালাম। আগামীকাল এই মালগুলো পাঠিয়ে দিও। কাল আমরা ছ নম্বর শিবিরের পথ তৈরি এবং মাল ফেরী করব। সময় পেলে একবার সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে বসব।

প্রকৃতি সহায় হলে তোমাদের জন্য জয়মাল্য নিয়ে আসতে পারব। আমাদের জন্য চিন্তা ক'রো না, আমবা ভাল আছি ভাল থাকব। তোমাদেব

গৌতম।

গতকাল সাতটার পরেও রোদ ছিল। আব আজ ছটার আগেই রোদ মিলিয়ে গেল। বৈকালী চা খেয়ে নিয়েই তাঁবুতে চলে এলাম। রাম ও রসিদরা বলেছে, ওরাই রাতেব রান্না করবে। 'ডাল রোটি আউর ভাজি' খাওয়া হবে।

অমূল্য তাঁবুতে এসে গৌতমের ফর্দ দেখে। বলে—পেয়ারের রুক্‌স্যাক্ নিয়ে আগামীকাল অন্তত ছ' বোঝা মাল ওপবে পাঠাতে হবে।

—অত লোক কোথায়? গোরা জিজ্ঞেস করে।

টুলটুল বলে—মানুষ তো আমরা তিনজন, আমি গোরা আর ছোট-রসিদ। রাম তার নিজের রুক্‌স্যাক্ নিয়ে যাবে।

—কালও বড়-রসিদ ওপরে যাবে, শৈলেশ আর জয়ও মাল ফেরী করবে। রঞ্জু আর আমি শঙ্কুদাকে চিঠি লেখায় সাহায্য করব।

—আপনাদের রান্না-খাওয়া ? শৈলেশ প্রশ্ন করে।

—তাও আমরাই করে নেবো। সকালে ব্রেক-ফাস্ট বানাতে তোমরা আমাদের একটু সাহায্য ক'রো।

—নিশ্চয়ই। টুলটুল বলে।

—তাহলে কাল ডাক যাচ্ছে না ? আমি জিজ্ঞেস করি।

অমূল্য উত্তর দেয়—না। কাল বড়-রসিদ ওপরে মাল নিয়ে যাচ্ছে। পরশু সকালে সে ডাক নিয়ে সুয়েদ যাবে।

মূল-শিবির প্রতিষ্ঠার সংবাদ দিয়ে পাঠানো টেলিগ্রাম আশা করি দু-তিন দিনের মধ্যে দিল্লী ও কলকাতায় পৌঁছে যাবে। কাগজে খবর বের হলে সবাই জানতে পারবে। কাজেই চিঠিগুলো আরেক-দিন পরে গেলে তেমন কোন ক্ষতি হবে না। তাছাড়া আরেকটা দিন হাতে পেলে বাকি চিঠিগুলো লিখে ফেলা যাবে। অবশ্য কাল শৈলেশ থাকছে না। তাকেও মাল ফেরী করতে হবে। আগেই বলেছি ওর হাতের লেখাটি ভারী সুন্দর। লিখতেও পারে বেশ তাড়াতাড়ি। অধিকাংশ চিঠি সে-ই লিখেছে। কিন্তু কাল সে থাকছে না। বাকি চিঠিগুলো আমাদেরই লিখে ফেলতে হবে।

—আরেকটা কথা……। অমূল্য কথা বলে—পরশু ওরা দু নম্বর শিবির প্রতিষ্ঠা করছে। কিন্তু সেদিন এখান থেকে কেউ ওপরে যাবে না। তরশু ছোট-রসিদ এক নম্বরে যাবে। যদি তখন ওরা কেউ শিবিরে না থাকতে পারে, তাহলে যেন একটা চিঠি লিখে তাঁবুর ভেতরে পাথর চাপা দিয়ে যায়। ছোট-রসিদ সেটা নিয়ে আসবে।

টুলটুল ও জয় মাথা নাড়ে।

অমূল্য আবার বলে—আমি গৌতমকে একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি, কিন্তু তোমরাও মুখে সব বুঝিয়ে ব'লো।

—বলব। নিশ্চয়ই বলব। শৈলেশ বলে—কিন্তু তাই বলে কি আজ সন্ধ্যায় চা-চানাচুর পাওয়া যাবে না ?

—চা পাবি কিন্তু চানাচুর নয়। ম্যানেজার জয় ফরমান দেয়।

—সেকি ! টুলটুল বলে ওঠে—তাহলে এত কষ্ট করে মাল

পৌঁছে দিয়ে এলাম কেন ?

—আবার কালও নাকি যেতে হবে। গোরা যোগ করে।

—শুধু চা দিয়ে মূল-শিবিরের সান্ধ্য আড্ডা ? টুলটুল রীতিমত বিস্মিত।

মুচকি হেসে রঞ্জু বলে—শুধু চা কেন ? চানাচুর ছাড়া বুঝি আর কিছু আনি নি আমরা ?

—কি পাওয়া যাবে রে ? গোরা জিজ্ঞেস করে।

—বাদাম দিয়ে চিড়ে ভাজা। জয় উত্তর দেয়।

—রিয়েলী ? আমি বলে উঠি।

ম্যানেজার মাথা নাড়ে। বলে—তুপুরেই চিড়েভাজা ও বাদাম বের করে রেখেছি। এখন শুধু একটু গরম করে নিতে হবে। আমি আর রঞ্জু কিচেনে যাচ্ছি।

—থ্রি চীয়ার্স ফর আওয়ার মার্ভেলাস ম্যানেজার এ্যাণ্ড মেডিক্যাল অফিসার······

—হিপ্ হিপ্ হুররে, হিপ্ হিপ্·········

মানুষের জয়ধ্বনিতে ব্রহ্মালোক মুখরিত হয়ে ওঠে।

॥ বারো ॥

গতকাল অসিত কাননে তবু আমরা পাঁচজন ছিলাম। আর আজ মাত্র তিনটি প্রাণী সারাদিন কাটিয়েছি—নেতা রঞ্জু ও আমি। আজ ওরা ওপরে চলে যাবার পরে আমরা রান্নার বেশি হাঙ্গামা করি নি। চাল-ডাল ধুয়ে প্রেসার কুকারে বসিয়ে দিয়েছি। রঞ্জু কয়েকটা আলু ও পেয়াজ কেটে দিয়েছে। পরে নুন ও কারি-মিক্‌সচার মিশিয়ে নামিয়ে নিয়েছে। ভারী উপাদেয় খিচুরি হয়েছে। আচার সহযোগে তাই দিয়ে তিনজনে ভরপেট হট-লাঞ্চ্ সেরেছি। বাকিটা রেখে দিয়েছি। ওরা ফিরে এলে গরম করে দেব।

শিবির যতই নিস্তব্ধ হোক, মন যতই ভারাক্রান্ত হোক, আমরা কিন্তু হাত গুটিয়ে বসে থাকি নি। সারাদিন খেটে বাকি চিঠিগুলো লিখে ফেলেছি। সবমিলে চারশ' একখানি চিঠি হয়েছে। সুয়েদ ডাকঘরের মাষ্টারজীকেও নেতা একখানি ব্যক্তিগত চিঠি দিয়েছে।

শুধু পিক্‌চার পোস্টকার্ড নয়, সেই সঙ্গে সদস্যদের পারিবারিক চিঠি ও কয়েকখানি টেলিগ্রামও যাচ্ছে। এক নম্বর শিবির প্রতিষ্ঠা ও দু নম্বরের স্থান নির্বাচনের সংবাদ যাচ্ছে দিল্লী ও কলকাতায়। অর্থাৎ তিন সদস্যের শিবিরে আজ কাজ কিছু কম হয় নি।

আজও বিকেল পাঁচটা নাগাদ ওরা ফিরে এলো। গিয়েছে সাতজন কিন্তু ফিরে এসেছে ছ'জন। রাম সিং আসে নি, এক নম্বরে থেকে গিয়েছে। তাই কথা ছিল।

আজও সহনেতা একখানি চিঠি পাঠিয়েছে। লিখেছে—

এক নম্বর শিবির (১৬,৮০০´)

প্রিয় লীডার, ২০. ৯. ৮৬

মালপত্র পেলাম। রাম সিং-ও এসে গেছে। আগামীকাল

লোক পাঠাবার দরকার নেই, পরশু কাউকে পাঠিও। তার কাছে সব খবর দিয়ে দেব। কোন কিছুর দরকার পড়লে, তাও জানিয়ে দেব।

গতকাল রাতে ভাল ঘুম হয় নি। আগেই জানিয়েছি, আমাদের পাশে ব্রহ্মা-১ ও ব্রহ্মাণী আর হিমবাহের ওপারে রয়েছে ব্রহ্মা-২, ক্রুকেড ফিঙ্গার, আইগার, ফ্ল্যাট-টপ্, সিক্‌ল মুন প্রভৃতি তুষারাবৃত শিখর। কোনটি দেখা যাচ্ছে, কোনটি দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু বেশ বুঝতে পারছি যে তাদের প্রায় প্রত্যেকটি থেকে পালা করে হিমানী-সম্প্রপাত বা 'avalanche' হয়েই চলেছে এবং তার প্রচণ্ড শব্দে ব্রহ্মলোক অবিরত কেঁপে কেঁপে উঠছে।

আমাদের শিবিরটা অবশ্য এইসব হিমানী-সম্প্রপাতেব ধরা-ছোঁওয়ায় বাইরে। কিন্তু শব্দের জন্য আমরা কাল সারারাত ঘুমোতে পারি নি।

সেই ভয়ঙ্কর শব্দ শুনতে শুনতে এক সময় রাত ফুরিয়েছে। তাঁবুর বাইরে এসেছি। ভোরের আলোয় চারিদিকের দৃশ্য আমাদের অনিদ্রার দুঃখ দূর করে দিয়েছে। মুগ্ধ নয়নে চেয়ে চেয়ে দেখেছি।

গতকাল সন্ধ্যার কিছু আগে ব্রহ্মাজী মেঘের আড়ালে মুখ লুকিয়ে ছিলেন। আজ সকালে আবার তিনি দর্শন দিলেন। শুধু তাই নয়, আজ মনে হচ্ছে তিনি যেন আমাদের মাথার ওপরে।

আজ ব্রহ্মা-১ পর্বতের দক্ষিণ-পূর্ব শিখর শিরাটিকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। ঐ শিখরশিরার দিকে লক্ষ্য রেখে এখন দক্ষিণ-পূর্ব গাত্রে আমাদের পথ তৈরি করতে হবে। বাইনোকুলার দিয়ে শিখরের সম্ভাব্য পথটিকে ভাল করে দেখে নিয়েছি। তোমাকে কথা দিচ্ছি লীডার, প্রকৃতি সহায় হলে এবং ব্রহ্মাজী কিঞ্চিৎ কৃপা করলে, আমবা শিখরপূজা সমাধা করতে পারব।

কিন্তু এসব হল পরের কথা। তার চেয়ে তোমাকে আজকের কথা বলি। আজ সকালেই দুজন শেরপাকে নিয়ে জগদীশ বেরিয়ে গেছে। দু নম্বর শিবিরের নির্বাচিত স্থান থেকে ওরা পথ তৈরি শুরু করবে।

সম্ভব হলে ওরা তিন নম্বর তথা শিখর-শিবিরের স্থান নির্বাচন করে আসবে। বাইনোকুলার দিয়ে দেখে মনে হচ্ছে বেশ কিছুটা ফিক্সড রোপ করতে হবে।

ওরা চলে যাবার পরে আমরা ব্রেক-ফাস্ট করে নিলাম। তারপরে হিসেব করে মালপত্র দিয়ে কৃষ্ণ শিবু ও পেয়ারকে পাঠিয়ে দিলাম। ওরা দু নম্বর শিবিরের নির্বাচিত স্থানে মাল রেখে আসবে। কৃষ্ণদের চলে যাবার পরে আমি ও তপন সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে বসেছিলাম। মুশকিল হয়েছে ক্র্যাম্পন নিয়ে। এত করে বলার পরেও ইন্স্টিটিউট ঠিক সাইজের ক্র্যাম্পন দেয় নি। অথচ ক্র্যাম্পন ছাড়া দু নম্বরেই যাওয়া যাবে না। কারণ পথে প্রচুর বরফ রয়েছে।

যাক্ গে, দেখি কি করতে পারি। তুমি জেনে খুশি হবে লীডার, এ পর্যন্ত আমরা তোমার সময়সূচী অনুযায়ী চলেছি। আশা করছি আগামীকাল দু নম্বর শিবির প্রতিষ্ঠা করতে পারব।

আমরা সবাই সুস্থ ও সতেজ রয়েছি। তোমার প্রতিটি নির্দেশ পালন করে সাবধানে ও দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছি। আমাদের জন্য কোন দুশ্চিন্তা করো না। তোমরা সর্বদা সাবধানে থেকো।

তোমার গৌতম।

চিঠি পড়তে পড়তেই দিনের আলো মিলিয়ে গেল। এতো যেমন তেমন চিঠি নয়, ওপরের চিঠি। আমার অনুজপ্রতিম পর্বতারোহীরা জীবন ও মৃত্যুর সীমারেখায় দাঁড়িয়ে যে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে, তারই বিবরণ। এ কথা কি একবার পড়লে আশ মেটে। তাই বার বার পড়া হল। আর পড়তে পড়তেই দিনের আলো গেল মিলিয়ে। ব্রহ্মলোকে নেমে এলো আঁধার, ছুটে এলো মৃত্যুশীতল হিমেল হাওয়া। তাড়াতাড়ি তাঁবুতে চলে আসি। গরম পোশাক পরে নিয়ে যে যার জায়গায় বসি।

এখন তাঁবুতে অনেক জায়গা। বারোজন যে তাঁবুতে থেকেছি, সেই তাঁবুতে আমরা মাত্র সাতজন। অবশ্য ওদের বাড়তি মালপত্র

ওরা সবই রেখে গিয়েছে। তাহলেও তাঁবুটাকে বড্ড বেশি ফাঁকা মনে হচ্ছে। কবে কিভাবে আবার এই ফাঁক ভরাট হবে, তা শুধু ব্রহ্মাজীই বলতে পারেন। আমরা কেবল সেই শুভদিনের প্রতীক্ষা করব, আমার দুঃসাহসী ভাইদের নিরাপদ প্রত্যাবর্তনের পথ চেয়ে রইব।

বড়-রসিদ আজও পেট্রোম্যাক্স জ্বালিয়ে নিয়ে এলো। নেতা তাকে জিজ্ঞেস করে—রসিদভাই, আজ কে রান্না করবে?

—কেন সাব্, আমরা করব।

—কিন্তু তোমরা যে আজ বড়ই ক্লান্ত, সারাদিন মাল বয়েছো, চড়াই-উৎরাই করেছো।

—তাতে কি হয়েছে সাব্? আমরা পাহাড়ীমানুষ, এসব আমাদের অভ্যেস আছে।

—কি খানা বানাবে রসিদ? রঞ্জু জিজ্ঞেস করে।

সে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয়—দাল চাপাতি আউর সবজি।

গোরা বলে—এক কাজ করো।

—কেয়া কাম সাব্?

—তোমরা রুটি বানিয়ে ফেলো। এখন দরকার নেই, আটটা নাগাদ আরম্ভ করলেই চলবে। রোটি হয়ে গেলে আমাকে ডাক দিও। আমি একটা মাংসের টিন কেটে ঝোল করে নেবো।

—লেকিন........। ঠিক হ্যায় সাব্।

কি যেন বলতে গিয়েও বলতে পারল না রসিদ।

শৈলেশ জিজ্ঞেস করে—কি হল রসিদ?

কিন্তু রসিদ কোন উত্তর দেয় না। নতমস্তকে দাঁড়িয়ে থাকে। টুলটুল জিজ্ঞেস করে—কি বলতে চাইছ, বলো।

—সাব, আমরা আজ মাংস খাবো না।

মাংস খাবে না! কি বলছে ছেলেটা? মুসলমানের ছেলে হয়ে মাংস খাবে না!

—তোমরা মাংস খাও না? জয় জিজ্ঞেস করে।

—খাই সাব্। তবে শুধুই রবিবার। আজ আমরা মাংস খাবো

না। ঠিক আছে, আপনারা রোটি-মাংস খাবেন। আমরা চিনি দিয়ে চাপাতি খেয়ে নেব।

—তোমরা শুধু রবিবার মাংস খাও? নেতা জিজ্ঞেস করে।

—জী, সাব্!

—আজ কি বার? টুলটুল প্রশ্ন করে।

খুবই স্বাভাবিক হিমালয়ের অন্তরলোকে এলে দিন তারিখ ঠিক থাকে না।

—শনিবার। সঙ্গে সঙ্গে রসিদ উত্তর দেয়।

তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে রুক্‌স্যাক্ থেকে ডায়েরী বের করে দেখি। তারপরে বলি—হ্যাঁ, ও ঠিকই বলেছে। আজ শনিবার।

—তাহলে আজ আর মাংসের টিন কেটো না। আজ অন্য কিছু রান্না করে নাও। আগামীকাল মাংস হবে। সবাই মিলে খাওয়া যাবে।

—কিন্তু কাল তো রসিদ থাকবে না। সে সকালেই চিঠি নিয়ে সুয়েদ রওনা হবে।

টুলটুল মনে করিয়ে দেয়। তবু নেতা বলে—তাহলেও আজ মাংস থাক। আমরা রুটি-মাংস খাবো আর ওরা চিনি দিয়ে রুটি গিলবে, এটা অন্যায়।

—ঠিক আছে রসিদ! গোরা বলে—চাপতি হয়ে গেলে আমাকে ব'লো, আমি এসে ডাল আলুভাজা করে নেবো।

—ঠিক হ্যায় সাব্! সে বাইরে যাবার জন্য পা বাড়ায়।

নেতা বাধা দেয়—আরেকটা কথা!

—বলুন সাব্!

—রুটি বানাবার আগে যে আরেকবার চা বানাতে হবে।

—ঠিক হ্যায় সাব্! যেন একটা দারুণ ভুল করে ফেলেছে এইভাবে সে তাড়াতাড়ি তাঁবু থেকে বেড়িয়ে যায়।

—আজ কিন্তু চায়ের সঙ্গে চানাচুর কিংবা চিড়েভাজা হবে না। ম্যানেজার ঘোষণা করে।

—কি হবে তাহলে ? শৈলেশ প্রশ্ন করে।

—ভাঙা বিস্কুট।

—ও. কে. বস্। সামথিং ইজ বেটার দ্যান নাথিং। রঞ্জু আমাদের মুখপাত্র হয়ে মনের কথাটি বলে দেয়।

কিছুক্ষণ বাদে রসিদ ব্রাদার্স কেটলি ও মগ নিয়ে তাঁবুতে আসে। জয় টিন খুলে কিছু ভাঙা বিস্কুট বের করে একখানি থালায় রাখে। আমরা চা-বিস্কুট খেতে শুরু করি। রসিদ ব্রাদার্স ওদের চা-বিস্কুট নিয়ে কিচেনে চলে যায়।

সহসা শৈলেশ বলে ওঠে—শঙ্কুদা, আপনি কিন্তু একটা অদ্ভুত কাণ্ড করে বসে আছেন।

সবিস্ময়ে প্রশ্ন করি—কি কাণ্ড ?

—আপনি পথে আসতে আসতে আমাদের কাছে ব্রহ্মা ১ পর্বত-শিখরে দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার আরোহণের কাহিনী বলেছেন। ১৯৮০ সালে ফরাসী অভিযাত্রীদের চতুর্থবার আরোহণের কথাও আমরা জানি। কিন্তু যাঁর প্রথম আরোহণের কথা শুনে আমরা ব্রহ্মা পর্বতের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছি, আপনি ক্রিস বনিংটনের সেই আরোহণের কথাই বাদ দিয়ে গিয়েছেন।

একটু হেসে বলি—বাদ দিয়েছি কারণ তোমরা সবাই ১৯৭৩ সালের সেই বিস্ময়কর আরোহণের কথা জানো।

—না, না। আমরা জানি না। টুলটুল বলে ওঠে।

—আমরা কেবল শুনেছি বনিংটন ফিক্সড-রোপ না করে মাত্র দশ দিনের মধ্যে এই দুর্গম শিখরে আরোহণ করেছেন। রঞ্জু যোগ করে।

ব্যাপারটা পরিষ্কার। ওরা জোট বেঁধে আমাকে বকবক করাতে বদ্ধপরিকর।

অতএব শুরু করতে হয়—একালে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পর্বতারোহী ক্রিস বনিংটন। শুধু দুঃসাহসিক আরোহণের জন্য নয়, সেই সঙ্গে পর্বতারোহণে নবনব পদ্ধতির প্রচলন, অভিনব সাজ-সরঞ্জামের

আবিষ্কার ও নানা অবিশ্বাস্য পরিকল্পনার বাস্তব রূপায়ণের জন্য তাঁর নাম ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবে। লেখক হিসেবেও তাঁর অবদান কিছু কম নয়।

অমূল্য মাথা নাড়ে। আমি বলতে থাকি---কিন্তু বনিংটনের ব্রহ্মা-১ পর্বতশিখরে আরোহণের বিস্তৃত বিবরণ জানা নেই আমার। শুনেছি একখানি বইতে তিনি এই বিবরণ দিয়েছেন। কিন্তু বইখানি পড়া হয় নি। আসার আগে গৌতমকে বৃটিশ কাউন্সিলে পাঠিয়েও বইখানি যোগাড় করতে পারি নি। তবে ১৯৭৩ সালের এইচ. এম. আই. জার্নালে বনিংটন সেই আরোহণের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন। তোমরা শুনতে চাইলে সেটি শোনাতে পারি।

—শুনব। আমরা তাই শুনব। সহযাত্রীরা প্রায় সমস্বরে বলে ওঠে।

অতএব শুরু করি—সেবারে ক্রিস্ তাঁর পর্বতারোহী বন্ধু নিক্ এস্ট্কোর্ট-কে নিয়ে কিশ্তোয়ার-হিমালয়ে এসেছিলেন। তাঁদের মাত্র মাসখানেক সময় হাতে ছিল, তাও আবার অগাস্ট মাসে, যখন হিমালয়ের অধিকাংশ অঞ্চল বর্ষার জন্য অগম্য হয়ে ওঠে। ক্রিস্ দুটি কারণে এ অঞ্চলে এসেছিলেন। প্রথমতঃ চার্লস ক্লার্ক-এর বিবরণ তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিল, দ্বিতীয়তঃ তাঁর ধারণা ছিল কাশ্মীর উপত্যকার দক্ষিণে অবস্থিত পশ্চিম-হিমালয়ের এই অংশটিতে অগাস্ট মাসেও ভাল আবহাওয়া পাওয়া যাবে।

—পেয়েছিলেন? শৈলেশের প্রশ্নে থামতে হয় আমাকে।

উত্তর দিই—না। মোটেই ভাল আবহাওয়া পান নি তাঁরা।

—আবহাওয়ার কথা যথাসময়ে হবে। এখন আপনি অভিযানের কথা বলুন। টুলটুল তাগিদ দেয় আমাকে।

আমি বলতে থাকি—বনিংটনের উদ্দেশ্য ছিল কিশ্তোয়ার-হিমালয়ের একটি অপরাজিত শিখরে এ্যাল্পাইন পদ্ধতিতে আরোহণ করবেন। তিনি ব্রহ্মা-১ পর্বতশিখরটিকে পছন্দ করেছিলেন কারণ ক্লার্ক বহুচেষ্টা করেও এই শিখরে আরোহণ করতে পারেন নি এবং এটি

কিশ্‌তোয়ার-হিমালয়ের দুর্গমতম শিখর। হিমালয়ে মাত্র তিন সপ্তাহ সময় হাতে নিয়ে এই আরোহণের পরিকল্পনা নিঃসন্দেহে অতিশয় উচ্চাশা। তিনি নিজেও বলেছেন, 'Ambitious plan indeed…'

তাঁরা ২রা অগাস্ট (১৯৭৩) লণ্ডন থেকে রওনা হয়ে এয়ার ইণ্ডিয়ার বিমানে দিল্লী আসেন। দার্জিলিঙের শেরপা ছেওয়া তাসি ও উত্তর কাশীর ইন্‌স্ট্রাক্টর উজাগর সিং তাঁদের সঙ্গে যোগদান করেন।…

—উজাগর সিং ; মানে ১৯৬৮ সালে চতুরঙ্গী অভিযানের অগ্রবর্তী মূল-শিবিরে যার সঙ্গে আমাদের দেখা হয়েছিল ?

অমূল্যের প্রশ্নে থামতে হয় আমাকে। উত্তর দিই—সম্ভবতঃ সেই একই লোক।

—যাক্ গে, তুমি ক্রিস্ বনিংটনের কথা বলো।

আমি বলতে থাকি—তুদিন দিল্লীতে কাটিয়ে তারা রেলে জম্মু আসেন। সেখান থেকে বাসে কিশ্‌তোয়ার। কিন্তু প্রচণ্ড বৃষ্টির জন্য তাঁদের তিনদিন কিশ্‌তোয়ার বিশ্রামভবনে বন্দী থাকতে হয়।

১১ই অগাস্ট শুরু হয় তাঁদের পদযাত্রা। তখনও মারু-চেনাব উপত্যকায় মোটরপথ তৈরি হয় নি। ১৫ই অগাস্ট কিবার নালার উৎসের কাছে তৃণাচ্ছাদিত একটি প্রান্তরে তাঁদের মূল-শিবির প্রতিষ্ঠিত হয়।

—তার মানে, তারা আমাদের পেছনে মূল-শিবির করেছিলেন ? টুলটুল প্রশ্ন করে।

আমি মাথা নাড়ি। কিন্তু কথা বলতে পারি না। তার আগেই শৈলেশ বলে—তাহলে কিশ্‌তোয়ার থেকে পায়ে হেঁটে ব্রহ্মা হিমবাহে পৌঁছতে তাঁদের মাত্র পাঁচদিন লেগেছে ?

—হ্যাঁ। অথচ পথে তিনদিনই বৃষ্টি পেয়েছেন। খুবই তাড়াতাড়ি পথ চলেছিলেন তাঁরা।

লেখকের 'চতুরঙ্গীর অঙ্গনে' বইখানি দ্রষ্টব্য।

একবার থেমে আমি আবার বলতে থাকি—আমি আগেই বলেছি চার্লস ক্লার্ক-এর বিবরণ পাঠ করে উদ্বুদ্ধ হয়েই ক্রিস্ কিশ্‌তোয়ার-হিমালয়ে এসেছিলেন। ক্লার্ক বলেছেন, ব্রহ্মা-১ পর্বতশিখরে আরোহণের একমাত্র সম্ভাব্য পথ দক্ষিণ-পূর্ব গিরিশিরা। সেইদিকে লক্ষ্য রেখেই ক্রিস্ মূল-শিবির থেকে অগ্রসর হতে থাকলেন। কিন্তু মেঘ ও বৃষ্টির জন্য তাঁদের খুবই অসুবিধে হচ্ছিল।

১৭ই অগাস্ট তাসি ও উজাগরের সহায়তায় ব্রহ্মা-১ শিখরের দক্ষিণ পাদদেশে স্থায়ী তুষাররেখার ঠিক নিচে আনুমানিক ১৫,০০০ ফুটে তাঁরা এক নম্বর শিবির প্রতিষ্ঠা করেন। বৃষ্টির মধ্যে তাঁদের একাজ করতে হয়েছে। তাই সেদিন তাঁরা ব্রহ্মাজীকে দর্শন করতে পারেন নি। তিনি মেঘের আড়ালে অদৃশ্য হয়েছিলেন।

বৃষ্টির জন্য পরের দিনটি তাঁদের তাঁবুতে বন্দী থাকতে হল। তার পরদিন অর্থাৎ ১৯শে অগাস্ট অকস্মাৎ প্রকৃতি করুণা করলেন। মেঘ মিলিয়ে গেল। ঝলমলে রোদে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল ব্রহ্মা হিমবাহ। আর সেদিনই কাশ্মীর পর্বতারোহণ সংস্থার লেঃ কঃ বলবন্ত সান্ধু, ফু দোরজি এবং বাজওয়া এসে তাঁদের সঙ্গে যোগদান করলেন।

পরদিন তাঁরা দক্ষিণ-পূব গিরিশিরায় উপস্থিত হলেন। এবং ১৭,৫০০ ফুট উঁচুতে দু নম্বর শিবিরের স্থান নির্বাচিত করলেন। তার পরদিন অর্থাৎ ২০শে অগাস্ট নিক্, তাসি ও উজাগরকে নিয়ে বনিংটন দু নম্বরে চলে গেলেন।

২১শে অগাস্ট রাত সাড়ে তিনটায় চার পর্বতারোহী সংগ্রামে অবতীর্ণ হলেন। তাঁরা দুটি দড়িতে অগ্রসর হলেন। প্রথম দড়িতে ক্রিস্ ও নিক্, দ্বিতীয় দড়িতে তাসি ও উজাগর। আকাশে তখন একফালি বাঁকা চাঁদ। তাঁরই স্তিমিত আলোতে পথ দেখে তাঁরা সাবধানে অগ্রসর হতে থাকলেন। কঠিন বরফের ওপরে রাতের ঠাণ্ডায় জমে যাওয়া তুষারের ক্ষীণ আস্তরণের ওপর দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চললেন। আকাশে চাঁদ উঠলেও আকাশ কিন্তু মেঘমুক্ত নয়। দূরের আকাশে মাঝে মাঝেই বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে।

শিখরশিরার ওপরে উঠে তাসি বলল, তার ক্র্যাম্পন ভেঙে গিয়েছে। তার মানে তাকে ফিরে যেতে হবে। তারপরে ওঁরা থাকবেন তিনজন। একই দড়িতে অগ্রসর হতে হবে। এক দড়িতে তিনজন খুব বাজে সংখ্যা। কারণ প্রায় দ্বিগুণ সময় লাগে।

কিন্তু উপায় কি? তাসিকে ফিরে যেতে বলে ক্রিস উজাগরকে নিজেদের দড়িতে নিয়ে নিলেন। তারপরে চাঁদের আলোয় পথ দেখে দেখে তাঁরা সেই ভাঙাচোড়া পাথুরে শিখরশিরার ওপর দিয়ে খুব সাবধানে অগ্রসর হতে থাকলেন।

ভোরবেলা তাঁরা উনিশ হাজার ফুটে উপস্থিত হলেন। দেখতে পেলেন একসারি অতিকায় Gendarmes শিখরের পথ আগলে দাড়িয়ে রয়েছে।.........

—Gendarmes কি শঙ্কুদা? জয় জিজ্ঞেস করে।

—Isolated pinacle on a ridge forming obstacle to climbers. অমূল্য বলে ওঠে।

—বুঝেছি। জয় খুশি হয়ে উত্তর দেয়।

আমি আবার শুরু করি—এখানে বনিংটন একটা ভুল করে বসলেন। তিনি সেই 'জেণ্ডারমেস'-গুলোকে পাশ কাটিয়ে যেতে চাইলেন। ভাঙাচোড়া গিরিশিরার ঝুরো পাথরগুলোর ওপর দিয়ে অগ্রসর হতে থাকলেন। একটু বাদেই আলগা পাথরে বোঝাই একটা মারাত্মক জায়গায় উপস্থিত হলেন। তাঁদের চলার গতি আরও কমে গেল।

সকাল সাড়ে দশটাব সময় তাঁরা বহুকষ্টে আবার শিখরশিরার ওপরে ফিরে এলেন। ভাল করে লক্ষ্য করে ক্রিস্ বুঝতে পারলেন ঐ 'জেণ্ডারমেস'-গুলোই শিখরের পথে শেষ বাধা। তারই একটা মসৃণ জেণ্ডারমেস-এর সঙ্গে দড়ি লাগানো রয়েছে। নিক্ জিজ্ঞেস করলেন—কারা ফেলে গিয়েছেন, চার্লস ক্লার্ক কিংবা জাপানী অভিযাত্রীদল? জায়গাটার উচ্চতা বিবেচনা করে ক্রিস উত্তর দিলেন—ক্লার্ক। একাত্তর সালে তিনি এখান থেকে ফিরে গিয়েছেন।

বনিংটন বুঝতে পারলেন, তাঁকেও সেই একই সিদ্ধান্ত গ্রহণ

করতে হবে। তাঁরা কি করবেন? ফিরে যাবেন অথবা শিখরে আরোহণ করবেন? তিনি ভাবলেন, শিখর এখনও অনেক দূরে এবং পথ অতিশয় দুর্গম ও বিপজ্জনক। ব্রহ্মা-১ পর্বতশিখরের মতো দুর্গম শৃঙ্গে আরোহণের জন্য প্রস্তুত হয়ে তাঁরা সেদিন শিবির থেকে বের হন নি। কিন্তু আজ আবহাওয়া ভাল। শিখরে আরোহণের এমন সুযোগ হয়তো তিনি আর নাও পেতে পারেন।

তবু তিনি ফিরে আসার সিদ্ধান্তই গ্রহণ করলেন। কারণ ১৭,৫০০ ফুটে অবস্থিত শিবির থেকে একদিনে শৃঙ্গে আরোহণ সম্ভব নয়। ফেরার পথে আকাশতলে রাত্রি যাপন বা bivouac করতেই হবে। উজাগরের সঙ্গে কোন bivouac equipment নেই।

শিবিরে ফিরে এসে দেখতে পেলেন, সান্ধু ও দোরজি সেখানে চলে এসেছেন। আলোচনার পরে সাব্যস্ত হল ক্লান্ত উজাগর নিচে চলে যাবে। পরদিন সকলেই বিশ্রাম নেবেন। তার পরদিন ক্রিস্ এবং নিক্ প্রথম প্রচেষ্টায় চূড়ান্ত সংগ্রামে অবতীর্ণ হবেন। তারপরে সান্ধু এবং দোরজি দ্বিতীয় প্রচেষ্টায় শিখরাভিযানে যাবেন। সেদিন রাতে আকাশ হঠাৎ খুব পরিষ্কার হয়ে গেল। আকাশের তারা তাঁদের মনের আকাশকেও উজ্জ্বল করে তুলল।

পরদিন উজাগর নিচে নেমে গেল। আর তারপরেই শুরু হয়ে গেল তুষারঝড়। তাছাড়া গতকাল আলোচনার সময়ে তাঁরা রসদের হিসেব করেন নি। হিসেব করে দেখলেন, শিখর শিবিরে চারজন মানুষ থাকলে মাত্র দুটি দিন চলতে পারে। অথচ নিচের থেকে খাবার আনিয়ে নেবারও সময় নেই। কারণ ক্রিস্ এবং নিকের হাতে আর মাত্র তিনদিন সময় রয়েছে। তৃতীয়দিন সন্ধ্যার মধ্যে তাঁদের মূল-শিবিরে ফিরতেই হবে। একদিকে অস্থির আবহাওয়া, আরেকদিকে সময় ও রসদের অভাব। ক্রিস্ খুবই মনমরা হয়ে পড়লেন।

সান্ধু আর দোরজিও বুঝতে পারলেন, এই অনিশ্চিত আবহাওয়ায় দ্বিতীয় প্রচেষ্টার জন্য তাঁদের এখানে বসে খাবারটকু ফুরিয়ে ফেলা উচিত হবে না। তাছাড়া ক্রিস্ ও নিক্ অনেক আশা করে বিলেত থেকে

এখানে ছুটে এসেছেন। তাই তাঁদের শেষ সুযোগ দেবার জন্য সান্ধু ও দোরজি সেই তুষারঝড় মাথায় করেই নেমে চললেন নিচে। বিদায় বেলায় তাঁরা ক্রিস ও নিকের সাফল্য কামনা করে ব্রহ্মাজীর কাছে প্রার্থনা পেশ করলেন।

অস্থির প্রকৃতি। সেদিনই বিকেলের দিকে আবার মেঘ সরে যেতে শুরু করল। সন্ধ্যের আগেই আকাশ মেঘমুক্ত হল। তারার দেওয়ালী শুরু হয়ে গেল।

সেদিনও রাত সাড়ে তিনটায় ক্রিস্ এবং নিক্ তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলেন। দেখলেন, চাঁদ উঠেছে, তেমনি একফালি বাঁকা চাঁদ। চাঁদের আলোয় পথ দেখে তাঁরা সেই ছুড়ির ফলার মতো সংকীর্ণ গিরিশিরা ধরে এগিয়ে চললেন।

কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার আবহাওয়া খারাপ হতে শুরু করল। ভোরের দিকে রীতিমত ঝড় শুরু হয়ে গেল। ঝড়ের মধ্যেই সকাল হল, ২৪শে অগাস্টের সকাল। কিন্তু সে প্রভাতকে তখন সুপ্রভাত বলে স্বাগত জানাতে পারেন নি ক্রিস্ বনিংটন।

ঝড় বেড়েই চলল। এক সময় এমন অবস্থা হল যে মাউণ্ট এভারেস্ট (২৯,০২৮´) অভিযানের নেতা এবং অন্নপূর্ণা (২৬,৫০৪´) বিজয়ী ক্রিস্ বনিংটন পর্যন্ত ফিরে যাবার কথা ভাবতে বাধ্য হলেন।

যাক্ গে, শেষ পর্যন্ত তিনি সে ভাবনাকে কার্যকরী করলেন না। এবং দুর্জয় সাহসে বুক ভরে নিয়ে এগিয়ে চললেন। তবে তাঁর মতো পর্বতারোহীকেও পরে স্বীকার করতে হয়েছে—"We knew now, all too well, just how serious climbing on Brammah could be."

এই আরোহণের বিবরণ দিতে গিয়ে ক্রিস্ বনিংটন লিখেছেন—"The rocks below the gendarmes were extremely loose and dangerous, a rubble of huge boulders piled one on top of the other. Then above this were the gendarmes themselves, giving difficult technical

climbing and beyond them, the great summit cone of Brammah—at least a thousand feet of steep snow on ice."

তবু তিনি এগিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। সকাল সাড়ে আটটার সময় তাঁরা আগের দিনের জায়গায় পৌঁছে গেলেন। বলা বাহুল্য তাঁরা যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি অগ্রসর হচ্ছিলেন।

সকাল সাড়ে দশটার সময় তাঁরা সেই summit cone বা শিখরের তলদেশে মোচাকৃতি সমতলে পৌঁছলেন। সেখান থেকে শুরু হয়েছে স্থায়ী ও কঠিন বরফের ওপরে অস্থায়ী কোমল তুষারের আস্তরণ। সেই পিচ্ছিল ও খাড়া পর্বতগাত্র বেয়ে প্রায় হাজারখানেক ফুট আরোহণ করতে হবে। ফিক্‌সড-রোপ ছাড়া এসব জায়গায় আরোহণ করা যেমন কষ্টকর, তেমনি বিপজ্জনক। কিন্তু তিনি যে আর কেউ নন, ক্রিস বনিংটন। সুতরাং সেই অসম্ভবকেই সম্ভব করে তুলবার জন্য এগিয়ে চললেন।

লাথি মেরে মেরে ধাপ তৈরি করে একপা একপা করে তাঁদের ওপরে উঠতে হচ্ছিল। বনিংটনের মতো পর্বতারোহীও প্রতি আট-দশপা ওঠার পরে কিছুক্ষণ করে বিশ্রাম নিতে বাধ্য হচ্ছিলেন। কঠিন বরফের ওপরে কোমল তুষার আস্তরণটি এতই পাতলা ছিল যে যেকোন সময় তুষারধস নামতে পারত। কিন্তু তাঁদের ভাগ্য ভাল। সেই ক্ষীণ আস্তরণ তাঁদের ওজন সইতে পারল। এবং অবশেষে বেলা সাড়ে বারোটার সময় তাঁরা ব্রহ্মা-১ পবতশিখরে উপস্থিত হলেন। পিতামহ ব্রহ্মা বীর বৃটিশ পর্বতারোহীযুগলকে জয়মাল্য পরিয়ে দিলেন।

শিখরের বর্ণনা প্রসঙ্গে বনিংটন বলেছেন—"a sharply and very steep pyramid of snow."

সেখান থেকে তারা মেঘের ফাঁক দিয়ে নিচের সবুজ উপত্যকা আর অনতিদূরের তুষারাবৃত শৃঙ্গমালার মনোহর রূপ দর্শন করলেন। তাঁদের দুজনের মনেই তখন পরম আত্মতৃপ্তি। তাঁরা এই কষ্টকর ও

বিপজ্জনক পথ পেরিয়ে সাফল্যের শিখরে এসে পৌঁছতে পেরেছেন। ন'ঘণ্টায় সাড়েতিন হাজার ফুট আরোহণ করেছেন।

অবরোহণের পথে প্রায় বিশ হাজার ফুটে তাঁরা 'bivouac' করলেন। বরফের ওপর শুয়ে খোলা আকাশের নিচে রাত কাটালেন। এই রাতের বর্ণনা প্রসঙ্গে ক্রিস্ লিখেছেন—"it was a cold but incredibly beautiful night, with one of the most magnificent sunsets that either of us had ever seen."

সেদিন রাতে কিন্তু আস্তে আস্তে আবহাওয়া ভাল হয়ে গেল। আর তাঁরা স্লীপিং ব্যাগে শুয়েই আকাশের তারা চাঁদ আর হিমালয়ের সৌন্দর্য দেখে নিদ্রাহীন রাতটি অতিবাহিত করে দিতে পারলেন। তাঁদের আর 'bivvy sack'-এ ঢোকাব দরকার পড়ল না।

এই রাতের বিবরণ দিতে গিয়ে ক্রিস্ আরও লিখেছেন—'Cramped but warm, we were able to wat~h the transition of light to dark, with the myriad stars and the beauty of the mountain scene around us.'

একটু থেমে আবার বলি—উচ্চতার বিচারে ব্রহ্মা-১ হিমালয়ের একটি অতি তুচ্ছ পর্বতশিখব। কিন্তু বাধা বিপত্তি কাঠিন্য ও বিপদের দিক থেকে ব্রহ্মা হিমালয়েব যেকোন দুর্গম শৃঙ্গের সমকক্ষ। আর ক্রিস্ বনিংটন-ও শ্রদ্ধার সঙ্গে সেকথা স্বীকার করেছেন। তাঁর ভাষায় —'Climbing without fixed ropes and with a long summit push had in some ways, been more committing than what we had experienced on Everest the previous Autumn.'

আমি থামতেই অমূল্য বলে ওঠে---তাহলে তুমি বলছ, আমাদের শিখর নির্বাচনে কোন ভুল হয় নি ?

---ভুল ? ভুল হবে কেন ? বরং বলব, তোর যোগ্য নির্বাচন হয়েছে। শস্তায় বাজি মাৎ করার চেষ্টা না করে তোরা যে ব্রহ্মাশিখরে আরোহণের চেষ্টা করছিস, এজন্য সবাই তোদের ধন্যবাদ জানাবে।

—শিখরে আরোহণ করতে না পারলেও?

মাঝখান থেকে টুলটুল প্রশ্ন করে। আমি উত্তর দিই—নিশ্চয়ই! ডুবাব এভারেস্ট শিখরে আরোহণ করার পরেও নওয়াং গম্বু 'গ্যারান্টি' দিতে পারেন না যে তিনি একটি বিশ হাজার ফুট উঁচু শিখরে আরোহণ করতে পারবেন। গৌরবময় অনিশ্চয়তা পর্বতারোহণের প্রধান আকর্ষণ। তাই সাফল্য নয়, প্রচেষ্টাই পর্বতাভিযানের মূল লক্ষ্য।

আমি চুপ করি। কিন্তু ওরা কেউ কোন কথা বলছে না দেখে আবার বলি---যাক্ গে, আমাদের কথা, বনিংটনের বিস্ময়কর অভিযানের শেষ অধ্যায়টি শুনে নাও।

---বলুন। শৈলেশ বলে।

---সেই বিশহাজার ফুট উঁচু তুষারক্ষেত্র থেকে পরদিন সকালে অবরোহণ শুরু করে সন্ধ্যার আগেই তাঁরা মূল-শিবিরে ফিরে এলেন।

---মূল-শিবিরে!

---হ্যাঁ। তেরো হাজার ফুটে। আর সেজন্য বোধকরি তাঁদের প্রাণ হাতে করে ১০/১২ কিলোমিটার উৎরাই ভাঙতে হয়েছিল। অবশেষে পাঁচদিনের মধ্যে দিল্লী ফিরে গিয়ে ক্রিস্ তাঁর সময়সূচী অক্ষুণ্ন রেখেছিলেন। আর সেই সঙ্গে তাঁর বিপজ্জনক ও বিস্ময়কর আরোহণের মালায় আরেকটি পারিজাত যুক্ত করেছেন।

॥ তেরো ॥

আজ একুশে সেপ্টেম্বর। আজ সকালে তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে প্রতিদিনের মতো ব্রহ্মাজীকে দর্শন করতে পারি নি। তাঁর মাথায় মেঘের চাদর। ব্রহ্মলোকে আসার পর এমনটি আর হয় নি। রোজ সকালে লোকপিতামহের মুখ দেখে দিন শুরু হয় আমাদের। কিন্তু আজ একি কাণ্ড! আজ যে ভোর না হ'তেই দাদু নাতিদের সঙ্গে লুকোচুরি শুরু করে দিলেন!

মনটা খারাপ হয়ে যায়। ব্রহ্মলোকে আসার পর থেকে সকালে ব্রহ্মাজীকে প্রণাম করা একটা অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। আজ তার ব্যতিক্রম হল।

না। ব্যতিক্রম হবে কেন? তাঁকে দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু তিনি আছেন। আমি দেখতে না পেলেও তিনি আমাকে দেখছেন। আমি তাই তাঁর দিকে তাকিয়ে তাঁকে প্রণাম করি। করজোড়ে বলি—হে জগৎস্রষ্টা চতুরানন, তুমি আমার ভাইদের দেখো। তাদের কৃপা ক'রো। তারা যেন তোমার শিখরপুজো সেরে নিরাপদে ফিবে আসে আমার কাছে।

আজ আরেক বিপদ হয়েছে। আজ আমরা বেকার, কোন কাজ নেই। সকালে বড়-রসিদ ডাক নিয়ে সুয়েদ যাবে আর ছোট-রসিদ কাঠ আনতে নিচের জঙ্গলে যাবে। তাদের পাঠিয়ে দেবার পরে রান্না-খাওয়া ছাড়া আমাদের সাতটি প্রাণীর অন্য কোন কাজ থাকবে না। মানুষ কাজ থাকলে বিরক্ত হয়। তখন ভুলে যায় যে কাজ না থাকা আরও বেশি বিরক্তিকর।

খেয়ে ও খাবার নিয়ে বড়-রসিদ রওনা হয়ে গেল। ওকে টাকা দিয়ে দেওয়া হয়েছে। রাজমা চিনি বিড়ি ও কিছু সবুজ সবজি নিয়ে আসবে। আর আনবে ডাকটিকেট। ডাকটিকেট সবই ফুরিয়ে গেছে।

কত আর থাকবে ? চারশ'র ওপরে চিঠি পাঠানো হল।

আমরা ভেবেছিলাম বড়-রসিদ পরশু দুপুর নাগাদ ফিরে আসবে। কিন্তু সে নাকি কালই ফিরতে পারবে। আজ সে সুয়েদ গিয়ে কাজ সেরে সোন্দার চলে আসবে। কাল সকালে সোন্দার থেকে রওনা হয়ে বিকেলে অসিত কানন পৌঁছে যাবে। কেমন করে, তা সে-ই জানে। তাছাড়া আজ রবিবার। আজ কি পোস্টাপিসের কাজ করতে পারবে ? সে বলেছে, মাস্টারসাবের সঙ্গে দেখা করলেই সব কাজ হয়ে যাবে।

যাক্ গে, কাল সে ফিরে আসতে পারলে আমাদেরই ভাল। পরশু ওকে এক নম্বরে পাঠানো যাবে। মাত্র দুজন মালবাহক মূল-শিবিরে রেখে আমরা অভিযান চালিয়ে যাচ্ছি।

বড়-রসিদ রওনা হয়ে যাবার পরে ছোট-রসিদের সাহায্যে গোরা ব্রেকফাস্ট বানিয়ে ফেলল। খাবার পরে ছোট-রসিদ দড়ি ও কাটারী নিয়ে নিচে চলে গেল। সেদিন আসার পথে মালবাহকরা যে কাঠ নিয়ে এসেছিল, তা দিয়েই এ-ক'দিন চালিয়ে দেওয়া গেল। কাঠ ছাড়া রুটি বানানো যায় না। আজ তাই ওকে দু'বোঝা কাঠ আনতে বলেছি।

কাজ না থাকলেও সময় বয়ে চলে। কিন্তু সূর্যের দেখা নেই। ব্রহ্মাজীকেও দেখতে পাচ্ছি না, দেখতে পাচ্ছি না ফ্ল্যাট টপ্ ও অন্যান্য তুষারাবৃত শৃঙ্গমালাকে। অসিত কাননের উত্তর ও পূর্বদিক পুরো সাদা হয়ে আছে। মনটা আশঙ্কায় দুলে উঠছে বার বার। পর্বতাভিযানে আবহাওয়া সাফল্যের প্রথম সোপান।

রোদ না ওঠায় আজ আর বেশিক্ষণ বাইরে দাঁড়ানো গেল না। হাওয়া দিচ্ছে, হাড় কাপানো হিমেল হাওয়া। আমরা তাই তাঁবুতে চলে এলাম। শুরু হল আড্ডা। চলতে থাকল গল্প। নানা গল্প। বলা বাহুল্য সব গল্পেরই বিষয়বস্তু হিমালয়, বিরাট ব্যাপক বিচিত্র-সুন্দর ও সুমহান হিমালয়।

অমূল্য বলছে—আসার পথে শম্ভুদা তোমাদের কাছে কিশ্ত্তোয়ার-

হিমালয়ের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য অভিযানের কথা বলেছে। কিন্তু তোমরা মনে করো না, সেই ক'টি অভিযান ছাড়া আর কোন শিখরাভিযান কিংবা সমীক্ষাভিযান আয়োজিত হয় নি এ অঞ্চলে। ভারতীয় পর্বতারোহীরা নজর না দিলেও কিশ্‌তোয়ার-হিমালয় বিদেশী পবতারোহীদের কাছে খুবই প্রিয়। ১৯৬২ সালে চার্লস ক্লার্ক-য়ের প্রথম অভিযানের পর থেকে বিগত বিশ বছরে আমার হিসেবেই কিশ্‌তোয়ার-হিমালয়ে অন্তত ছেষট্টিট শিখরাভিযান ও সমীক্ষাভিযান আয়োজিত হয়েছে।

—এর মধ্যে ক'টি ভারতীয় অভিযান? অমূল্য থামতেই টুলটুল প্রশ্ন করে।

---দশটি। আমি উত্তর দিই।

---কবে কাঁরা এসেছেন?

---এ অঞ্চলে প্রথম ভারতীয় অভিযান হয়েছে ১৯৭৫ সালে। কর্ণেল ডি এন টঙ্কার নেতৃত্বে কিশ্‌তোয়ার-হিমালয়ের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ সিক্‌ল মুন শিখরে প্রথম আরোহণ। তারপরে ১৯৭৭ সালে দুটি অভিযান। মেজর এ. জি. রায়ের নেতৃত্বে প্রথম ঘারোল শৃঙ্গে আরোহণ এবং অসিতকুমার চক্রবর্তীর পরিচালনায় 'দিগন্ত' পর্বতারোহণ সংস্থার সদস্যদের সমীক্ষাভিযান। ১৯৮১ সালেও দুটি ভাবতীয় অভিযান হয়েছে। অনাথ নাথ অধিকারীর নেতৃত্বে হাইকার্স এ্যাণ্ড এক্সপ্লোরার্স ক্লাবের সদস্যরা ব্রহ্মা হিমবাহ অঞ্চলে সমীক্ষা অভিযান করেন এবং অধ্যাপক বিবেকরঞ্জন সরকারের নেতৃত্বে ক্লাইম্বার্স সার্কেলেব সদস্যরা কিয়ার উপত্যকায় সমীক্ষা করেছেন। এই অভিযাত্রীদলের সহনেতা বনভূষণ নায়কের সঙ্গে প্রাণেশ * একদিন পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। তাঁর কাছে আমি ব্রহ্মালোকের অনেক কথা শুনেছি।

একবার থেমে আবার বলতে থাকি—

* প্রখ্যাত পর্বতারোহী এবং 'রক ক্লাইম্বিং', 'মানসী মানা' ও 'হিমালয়ের গোপনপুরে' প্রভৃতি গ্রন্থের সুলেখক প্রাণেশ চক্রবর্তী।

—কিশ্‌তোয়ার-হিমালয়ে দ্বিতায় সকলকাম ভারতীয় অভিযান পরিচালিত হয় ১৯৮৩ সালে। অভিযাত্রীরা ব্রহ্মা-২ পর্বতশিখরে আরোহণ করেন। এটি ঐ শৃঙ্গে তৃতীয় আরোহণ। বি. দাশ সেই অভিযানে নেতৃত্ব করেছেন। এই বছরেই কলকাতার ট্রেকারস গিল্ড্‌ ব্রহ্মা হিমবাহে এক সমীক্ষা অভিযান পরিচালনা করেন।

—একি! থামলেন কেন? দশটি ভারতীয় অভিযানের মধ্যে তো মাত্র সাতটির কথা বললেন!

আমাকে থামতে দেখেই শৈলেশ বলে ওঠে। হেসে বলি—বাকি তিনটি অভিযানের কথা তোমরা সবাই জানো। কারণ সে তিনটি হল তোমাদের আশি সালের ব্রহ্মা হিমবাহ অভিযান, গত বছরের সমীক্ষা এবং এই অভিযান।

আমি চুপ করি। কিন্তু অমূল্য আমাকে থামতে দিতে চায় না। সে বলে—কিশ্‌তোয়ার-হিমালয়ে পর্বতাভিযানের কথা তুমিই বলো না শঙ্কুদা। সে তার ডায়েরী বন্ধ করে।

হেসে বলি—তাহলে যে আমাকে ডায়েরী বের করতে হবে।

—তাই ক'রো। তুমি গুছিয়ে বলতে পারবে।

উপায় নেই। পর্বতাভিযানে এসেছি। নেতার আদেশ অমান্য করা যাবে না। অতএব রুক্‌স্যাক্‌ থেকে ডায়েরী বের করে বলতে শুরু করি—১৯৬৫ সালে চালর্স ক্লার্ক প্রথম এ অঞ্চলে আসেন। তিনি ব্রহ্মা-১ শিখরে আরোহণে চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। কিন্তু ব্রহ্মা হিমবাহ সমীক্ষা করতে পারেন।

—আমরা শুনেছি সেকথা। আপনি সেদিন বলেছেন। ·রঞ্জু মাথা নাড়ে।

আমি শুরু করি—তারপরে তিন বছর কিশ্‌তোয়ার-হিমালয়ে আর কোন অভিযাত্রীদল এসেছেন বলে জানা নেই আমার। ১৯৬৯ সালে চার্লস ক্লার্ক আবার এলেন এবং ৫৬৩০ মিটার মানে ১৭,১৬০ ফুট উঁচু ক্রুকেড ফিঙ্গার শৃঙ্গে আরোহণ করেন।

—একথাও আপনার কাছে আমরা শুনেছি শঙ্কুদা! জয় জানায়।

আমি মাথা নেড়ে বলতে থাকি—১৯৭০ সালেও এ অঞ্চলে একটি বৃটিশ পর্বতাভিযান পরিচালিত হয়েছে। এই অভিযানের নেতা ছিলেন এন. ক্লাক্। তাঁরা কোন শৃঙ্গে আরোহণ করেন নি। শুধুই সমীক্ষা করেছেন।

১৯৭১ সালে আবার চার্লস ক্লার্ক আসেন, এলেন এক জাপানী অভিযাত্রীদল। তাঁরা ব্রহ্মা-১ শিখরে আরোহণের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। কিন্তু সেকথাও তোমরা সবাই শুনেছো।

ওরা মাথা নাড়ে। টুলটুল বলে—তারপরেই বোধহয় তেয়াত্তর সালে ক্রিস বনিংটনের ব্রহ্মা-১ শিখরে আরোহণ?

—হ্যাঁ। আমি উত্তর দিই। বলি—তার পরের বছর অর্থাৎ ১৯৭৪ সালেও কিশ্‌তোয়ার-হিমালয়ে কোন পর্বতাভিযান আয়োজিত হয় নি। কিন্তু পঁচাত্তর সালে চারটি অভিযান পরিচালিত হয়েছে। একটি বৃটিশ, দুটি জাপানী ও একটি ভারতীয়। বৃটিশ অভিযাত্রীরা আর. কলিস্টার-এর নেতৃত্বে ব্রহ্মা-২ শৃঙ্গে আরোহণের চেষ্টায় বিফল হয়ে 'কন্‌সোলেসন' শৃঙ্গে আরোহণ করেন।

—সেটা কি তাঁদের সান্ত্বনা পুরস্কার? আমি থামতেই গোরা জিজ্ঞেস করে।

উত্তর দিই—তা হতে পারে। মূল-অভিযানে ব্যর্থ হয়ে পাশের অনামী শৃঙ্গে আরোহণ করে নাম রেখেছেন Consolation peak.

যাক্ গে, যেকথা বলছিলাম, কে. কিরিয়ো স্যাপ্পোরো-র নেতৃত্বে একদল জাপানী অভিযাত্রী ব্রহ্মা-২ (১৯,৬৯২´) শিখরে প্রথম আরোহণের গৌরব অর্জন করেন। কিন্তু এফ. য়ুকি-র নেতৃত্বে অপর জাপানী অভিযাত্রীদল সিকৃল মুন আরোহণ করতে গিয়ে দুজন অভিযাত্রীকে হারান। একথাও আমি তোমাদের বলেছি।

ওরা মাথা নাড়ে। আমি বলতে থাকি—ভারতীয় পর্বতারোহণের ইতিহাসে কিশ্‌তোয়ার-হিমালয় অধ্যায়ে সবচেয়ে গৌরবময় কাহিনীটি রচিত হয়েছে এই ১৯৭৫ সালে। কর্নেল ডি. এন. টঙ্কার নেতৃত্বে-সিকৃল মুন (২১,৬৮৬´) শিখরে ভারতের জাতীয় পতাকা প্রোথিত হয়।

১৯৭৬ সালে কিশ্‌তোয়ার-হিমালয়ে ছ'টি পর্বতাভিযান পরিচালিত হয়েছে।·········

—ছ'টি! সবিস্ময়ে শৈলেশ বলে ওঠে।

উত্তর দিই—হ্যাঁ। এর আগে কোন বছরে এতগুলো অভিযান হয় নি। ছ'টি অভিযানের তিনটি বৃটিশ ও তিনটি জাপানী। তিনটি বৃটিশ অভিযানই ব্যর্থ হয়েছে। এর একটি অভিযানের নেতৃত্ব করেছেন ক্রিস্ বনিংটন। দুদল জাপানী অভিযাত্রী দুটি অনামী শৃঙ্গে আরোহণ করেন কিন্তু অপর দলের সিক্‌ল মুন আরোহণের চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

১৯৭৭ সালে পাঁচটি অভিযান হয়েছে, তিনটি বৃটিশ ও দুটি ভারতীয়। একটি বৃটিশ অভিযানের নেতৃত্ব করেছেন কেল্‌ভিন টোর‍্যান্‌স। তাঁরা 'আইগার' ও 'ক্যাথিড্রেল' শৃঙ্গে আরোহণের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। তাঁদের কথাও আমি তোমাদের বলেছি।

ওরা মাথা নাড়ে। আমি আবার বলতে থাকি—আরেকটি অভিযানে বৃটিশ অভিযাত্রীরা ৫৬০০ মিটার অর্থাৎ ১৮,৩৭৩ ফুট 'ভিউপয়েণ্ট' শৃঙ্গে আরোহণ করেন।

—ভিউপয়েণ্ট শৃঙ্গ থেকে নিশ্চয় কিশ্‌তোয়ার-হিমালয়ের দৃশ্য খুব ভাল দেখা যায়। জয় মাঝখানে প্রশ্ন করে বসে।

উত্তর দিই—নামকরণ থেকে তো তাই মনে হয়। কিশ্‌তোয়ার-হিমালয়, সিকিম ভুটান আসাম গাড়োয়াল কুমায়ন কাশ্মীর কিংবা হিমাচলের মতো নয়। ওখানে যেমন সুপ্রাচীন কাল থেকেই অধিকাংশ পর্বতশৃঙ্গগুলির স্থানীয় নাম ছিল, এখানে তেমন নয়। তাই বিদেশী অভিযাত্রীরা অনামী শৃঙ্গগুলির পছন্দমত নামকরণ করেছেন। যাক্‌গে, যেকথা বলেছিলাম, ১৯৭৭ সালের ভারতীয় অভিযান দুটির নেতা ছিলেন মেজর এ. জি. রায় এবং অসিত কুমার চক্রবর্তী। প্রথম দল ঘারোল শৃঙ্গে আরোহণ করেন এবং দ্বিতীয় দল আঞ্চলিক সমীক্ষা করেন।

ওরা মাথা নাড়ে কারণ কিছুক্ষণ আগে আমি একথা বলেছি। আমি বলতে থাকি—১৯৭৮ সালের চারটি অভিযানেরই আয়োজন

করেন বৃটিশ পর্বতারোহীরা। একটি অভিযানের নেতৃত্ব করেন এ. হুইটেন।.........

আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে সহসা শৈলেশ বলতে শুরু করে—এ্যান্টনি হুইটেন। তারা ১৫ই অগাস্ট ব্রহ্মা-১ পর্বত শিখরে আরোহণ করেন। কিন্তু চারজন পর্বতারোহীর দুজন চিরকালের মতো হারিয়ে যান।

মাথা নেড়ে বলি—তোর স্মরণশক্তির জন্য ধন্যবাদ। এবারে উনআশি সালের কথা বলছি।

—বলুন। রঞ্জু তাগিদ দেয়।

আমি শুরু করি—১৯৭৯ সালে সাতটি পর্বতাভিযান হয়েছে কিশ্‌তোয়ার-হিমালয়ে, তিনটি বৃটিশ, তিনটি পোলিশ ও একটি জাপানী। জাপানী অভিযানের নেতা ছিলেন কে. ডেণ্ডা।......

—তাঁরা সিক্‌ল মুন ও ব্রহ্মা-১ শিখরে আরোহণ করেছেন। রঞ্জু বলে ওঠে।

আমি মাথা নেড়ে বলি—হ্যাঁ। তিনটি বৃটিশ অভিযানের একটির নেতৃত্ব করেন হুইটেন। তাঁরা ব্রহ্মাণী শিখরে আরোহণ করেন।

---আশ্চর্য! আগের বছর দুজন সঙ্গীকে হারিয়ে হুইটেন আবার পরের বছরই ব্রহ্মা হিমবাহে এলেন? টুলটুল প্রশ্ন করে।

উত্তর দিই—হ্যাঁ। ওঁরা যে বৃটিশ। ওঁরা কোনদিন দুর্গম ও ভয়ঙ্করের কাছে আত্মসমর্পণ করেন নি। আর করেন নি বলেই আজ আমরা এখানে। ব্রহ্মলোকের সঙ্গে ওঁরাই আমাদের প্রথম পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন।

---যাক গে, আপনি অভিযানগুলির কথা বলুন। গোরা প্রসঙ্গ পরিবর্তন করাতে চায়।

আমি আবার শুরু করি---এই বছর দুদল পোলিশ অভিযাত্রীও ব্রহ্মাণী শিখরে আরোহণ করেন। একদল বৃটিশ পর্বতারোহী ব্রহ্মা-২ ও ফ্ল্যাট টপ শৃঙ্গে আরোহণের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। অপর দুটি অভিযানে বৃটিশ ও পোলিশ অভিযাত্রীরা দুটি দূরবর্তী শিখরে

আরোহণ করেন।

তারপরে ১৯৮০ সাল। সে বছর কিশ্‌তোয়ার-হিমালয়ে দশটি অভিযান পরিচালিত হয়েছে। তার মধ্যে একটি তোমাদের ব্রহ্মা হিমবাহ অভিযান, আরেকটি ফরাসী ব্রহ্মা-১ পর্বতাভিযান। ই. শমুৎজ (Schmutz) সেই অভিযানের নেতৃত্ব করেন। তাঁরা উত্তর শিখরশিরা ধরে ব্রহ্মা-১ শিখরে আরোহণ করেন। এটি ব্রহ্মা-১ শিখরে চতুর্থ আরোহণ।

—তাঁদের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়েছিল। গোরা বলে।

আমি মাথা নেড়ে বলতে থাকি—বাকি আটটি অভিযানের পাঁচটি বৃটিশ আর একটি করে জাপানী পোলিশ ও ইতালীয় অভিযান। মেজর আর. উইলসন-এর নেতৃত্বে এক বৃটিশ অভিযাত্রীদল প্রথম ৬১০৩ মিটার মানে ২০,০২২ ফুট উঁচু ফ্ল্যাট টপ শৃঙ্গে আরোহণ করেন। এ ক'দিন আমরা সামনে তাকালেই শৃঙ্গটিকে দেখতে পেয়েছি।

ওরা মাথা নাড়ে, আমি বলতে থাকি—আর. রুটল্যাণ্ড নামে আরেক বৃটিশ পর্বতারোহীর নেতৃত্বে একদল অভিযাত্রী সিক্‌ল মুন শিখরে আরোহণের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। অপর তিন বৃটিশ অভিযাত্রী-দল এবং জাপানী পোলিশ ও ইতালীয়রা যেসব শিখরে অভিযান করেছেন, সেগুলির কোনটাই ব্রহ্মা হিমবাহ অঞ্চলের শৃঙ্গ নয়।...

আর কিছু বলার সুযোগ পাই না। তার আগেই বৃষ্টির শব্দে চমকে উঠি। তাঁবুর ওপরে সশব্দে বৃষ্টি পড়ছে। আজ সকাল থেকেই ব্রহ্মালোকে মেঘের সমারোহ দেখেছি। ঘুম থেকে উঠে ব্রহ্মাজীর মুখ দেখতে পাই নি। রোদ ওঠে নি বলেই অন্যদিনের মতো বাইরে না বসে তাঁবুর ভেতরে এসে গল্প করছিলাম। কিন্তু সত্যি সত্যি বৃষ্টি নামবে বুঝতে পারি নি। পারলে তখুনি রান্নার ব্যবস্থায় লেগে যাওয়া যেত। এখন বৃষ্টিতে ভিজে কিচেনে যাওয়া আর বৃষ্টি মাথায় করে রান্না করা খুবই অসুবিধে।

তাহলেও করতে হবে। তাই উইণ্ডচীটার গায়ে চাপিয়ে গোরা ও

টুলটুল তাঁবু থেকে বেরিয়ে গেল।

রসিদের ভাগ্য ভাল। এক বোঝা কাঠ নিয়ে কিছুক্ষণ আগে সে ফিরে এসেছে। এখন সে বোধহয় কিচেনে বসে সবজি কাটছে। অতটুকু জায়গায় তিনটে মানুষ বসে কাজ করবে কেমন করে?

আজ এখনও নালায় জল আসে নি। আসবে কেমন করে? আজ কি রোদ উঠেছে যে বরফ গলবে। তবে এ রকম বৃষ্টি হলে কিছুক্ষণের মধ্যে জল চলে আসবে, বৃষ্টির জল। কিন্তু সে জল খাওয়া চলবে না। খাবার জল আনতে হবে ওপরের ঝরণা থেকে। বৃষ্টিতে ভিজে পাথর পেরিয়ে অতটা পথ ভেঙে জল বয়ে আনা খুবই কষ্টকর। কিন্তু রসিদ হাসিমুখে জল এনে দেবে। জল না আনলে যে গোরা রান্না চড়াতে পারবে না।

না, খুব জোরে বৃষ্টি নেমেছে। আমাদের তাঁবুর দুটি ফ্ল্যাপ (Flap), একটি 'আউটার' একটি 'ইনার'। আউটারটি ওয়াটার প্রুফ। মনে হচ্ছে সেটি বহু জায়গায় ছিঁড়ে গেছে। ছেঁড়া জায়গা দিয়ে জল এসে ইনার-টিকে ভিজিয়ে দিয়েছে। ফলে টপ টপ করে জল পড়ছে।

মুষলধারে বৃষ্টি নেমেছে। এভাবে বেশিক্ষণ বৃষ্টি হলে আরেক বিপদ ঘটবে। আমরা তাঁবুর চারিদিকে নালা কেটে দিই নি। তাঁবুর জায়গাটায় ঢাল আছে। ওপরের জল তাঁবুর ভেতর দিয়ে সোজাসুজি নিচে নামবে। আমাদের কারও এয়ার-মাট্রেস ফুলছে না। সুতরাং জল বইলে স্লীপিং ব্যাগ রুকস্যাক্ সহ সবকিছু ভিজে যাবে।

যিনি স্রষ্টা তিনিই রক্ষক। ব্রহ্মাজী রক্ষা করলেন। কিছুক্ষণ বাদে বৃষ্টি থেমে গেল। তবে এসব অঞ্চলে যা হয়, তা হল না। রোদ উঠল না। তার মানে আকাশ এখনও মেঘে ঢাকা। তা হোক্ গে। আমরা জুতো ও উইণ্ড প্রুফ পরে বেরিয়ে আসি বাইরে। জয় রঞ্জু ও শৈলেশ আইস এ্যাক্স নিয়ে তাঁবুর চারিদিকে নালা কাটতে লেগে যায়। আমি আর অমূল্য এসে দাঁড়াই কিচেনের সামনে।

অমূল্য হাঁক দেয়—হেড কুক!

—কি বলছেন লীডার! গোরা সাড়া দেয়।

—খানা রেডী?

—ইয়েস লীডার।

—থ্যাঙ্ক ইউ।

গোরা এবারে রসিদকে বলে—সাব লোগোকো থালা মগ লেকে আও! খানা দেও!

—ঠিক হ্যাঁয় সাব্! রসিদ হাত ধুয়ে তাঁবুতে চলে যায়। কিন্তু সে বেরিয়ে আসার আগেই আমরা দেখতে পাই ওদের। চমকে উঠি! ওরা কারা? গোরা ও টুলটুল বেরিয়ে আসে বাইরে। শৈলেশ জয় আর রঞ্জু নালা কাটা বন্ধ করে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে। এত দূর থেকে কেউ বুঝতে পারছি না, কারা আসছে? যারাই আসুক, তারা আমাদেরই লোক। আমবা ছাড়া আর কে আছে এই ব্রহ্মালোকে?

কিন্তু কেন? কেন নেমে আসছে ওরা? আজ ৫ নম্বর শিবির প্রতিষ্ঠা হবে। আজ তো ওপর থেকে কারও আসার কথা নয়!

তাহলেও আসছে। ওরা তিনজন। জয় বাইনোকুলারে চোখ রেখে বলে ওঠে—রাম সিং, পেয়ার সিং আর তপন।

ঠিকই বলেছে সে। একটু বাদে আমরাও চিনতে পারি। ওরা আসে, কাছে আসে। তপনের চোখে জল। কিন্তু কেন? তপন কাঁদছে কেন? কি হয়েছে ওর? ওপরে কারও কোন বিপদ, কোন দুর্ঘটনা? বুকটা কেঁপে ওঠে আমার।

সে কাছে এসেই জড়িয়ে ধরে আমাকে। আমার বুকে মুখ লুকিয়ে কাঁদতে কাঁদতে তপন বলে ওঠে—শঙ্কুদা, ব্রহ্মাজীকে পুজো দেওয়া আমার অদৃষ্টে লেখা নেই।

—কেন কি হয়েছে?

—অনেক খোঁজাখুঁজি করেও আমার সাইজের কোন ক্র্যাম্পন পাওয়া গেল না।

ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে যায়। তাহলে কারও কোন বিপদ হয় নি, কোন দুর্ঘটনা ঘটে নি। ক্র্যাম্পন পাওয়া যায় নি বলে তপন এক নম্বর

শিবির থেকে আর ওপরে যেতে পারে নি। গৌতম তাকে নিচে নামিয়ে দিয়েছে। ঠিকই করেছে, ওপরের তাঁবুতে বসে অন্ন ধ্বংস করা পর্বতারোহণে অমার্জনীয় অপরাধ।

কিন্তু তপনের পায়ের মাপে ক্র্যাম্পন পাওয়া গেল না কেন? সাজ-সরঞ্জাম আনতে সে নিজে দার্জিলিং গিয়েছে। নিশ্চয়ই সে তার পায়ের মাপও দিয়েছে। তবু কর্তৃপক্ষ ঠিক সাইজের ক্র্যাম্পন দেন নি। ফলে একটি ছেলের দু বছরের স্বপ্ন মিথ্যে হয়ে গেল।

তবু আমরা ওকে সান্ত্বনা দিই। বলি—তুই যেতে না পারলেও গৌতম জগদীশ কৃষ্ণ ও শিবু রয়েছে। ওরা যাবে। ওরা শিখরপূজা করতে পারলে, আমাদের সবারই পুজো দেওয়া হবে।

আমি একা নই। জয় রঞ্জু টুলটুল শৈলেশ গোরা ও অমূল্য, সবাই মিলে ওকে সান্ত্বনা দেয়।

একটু বাদে তপন শান্ত হয়। সে চোখ মোছে। তারপরে জিজ্ঞেস করে—রান্না হয়ে গেছে?

—হ্যাঁ। ভাত বসিয়েছি, হয়ে এলো বলে। গোরা উত্তর দেয়। জিজ্ঞেস করে—তোর খুব খিদে পেয়েছে বুঝি?

—তা পেয়েছে। কিন্তু আমার জন্য জিজ্ঞেস করছি না।

—তাহলে?

—রাম ও পেয়ার এখুনি খেয়ে ওপরে চলে যাবে। ওদের সঙ্গে কিছু জিনিসও দিয়ে দিতে হবে। তাই ওরা খালি রুক্‌স্যাক্ নিয়ে এসেছে।

—বেশ তো তোরা জিনিসগুলো গুছিয়ে দে, ভাতটা হয়ে গেলেই আমি ওদের খেতে দিচ্ছি। গোরা রান্নাঘরে চলে যায়।

তপন পকেট থেকে একখানি চিঠি বের করে নেতার হাতে দেয়। বলে—গৌতম দিয়েছে।

নেতা জোরে জোরে চিঠিখানি পড়তে শুরু করে—

'গতকাল শেরপাদের নিয়ে জগদীশ দু নম্বরের জায়গা দেখে

এসেছে। সেদিন কৃষ্ণরা যেখানে দেখে গিয়েছিল, জায়গাটা তার চেয়ে কিছু ওপরে। উচ্চতা বোধকরি ১৮,৫০০ ফুটের মতো হবে আমরা আজ সবাই দু নম্বরে চলে যাচ্ছি।

রাম ও পেয়ার আজই এক নম্বরে ফিরে আসবে। ওদের খাইয়ে দিও। দেখেশুনে আরও দু-জোড়া ক্লাইম্বিং বুট, একটা টু-ম্যান টেন্ট্ ও কিছু টিন ফুড দিয়ে দিও। ওরা আজকের রাত এক নম্বরে কাটিয়ে আগামীকাল মাল নিয়ে ওপরে চলে আসবে।

আমরা সবাই সুস্থ। আনন্দে আছি। তবে আবহাওয়া একটু ভাবিয়ে তুলছে। রোজই বিকেলের দিকে তুষারঝড় হচ্ছে। তাই ঠিক করেছি, ক্রিস্ বনিংটনের মতো আমরাও শেষরাতে চূড়ান্ত সংগ্রামে অবতীর্ণ হব। কিন্তু তার আগে তিন নম্বরের জায়গা পাওয়া দরকার।

আগামীকাল ও পরশু অর্থাৎ ২২শে ও ২৩শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে আমাদের তিন নম্বর প্রতিষ্ঠা করতে হবেই। ২৪শে শিখরাভিযাত্রী সদস্যরা তিন নম্বর শিবিরে চলে যাবে। আমরা ২৫ তারিখে শিখরে আরোহণ করতে চাই। সেদিন দুজন ল্যাপ্-কে এক নম্বর পাঠিয়ে দেবে।......'

ভাত-ডাল ডিমের ঝোল দিয়ে ভরপেট খেয়ে নিল রাম ও পেয়ার। তারপরে রুক্স্যাকে মালপত্র ভরে নিয়ে ওপরে রওনা হয়ে গেল।

তপন ঘড়ি দেখে বলে—একটা বাজে। ওরা পাঁচটার মধ্যে পৌঁছে যাবে।

—কিন্তু পাঁচ ঘণ্টা লাগে শুনেছি। রঞ্জু বলে।

—হ্যাঁ। আমাদের তাই লাগে কিন্তু ওরা চার ঘণ্টায় চলে যাবে।

ওরা চলে যাবার পরে আমরাও খেয়ে নিলাম। রসিদকে বললাম—নালায় জল এসে গেছে। বাসন-পত্র ধুয়ে তাঁবুতে গিয়ে একটু বিশ্রাম করে নাও। আজ আর কাঠ আনতে যেও না। যে কোন সময় আবার বৃষ্টি নামতে পারে।

—লেকিন সাব্, কাল উপার যানা পড়েগা তো!

অর্থাৎ কাল তাকে ওপরে যেতে হলে, সে কাঠ আনার সুযোগ পাবে না।

আমি বলি—ঠিক আছে। ওপরে গেলে কাল কাঠ আনবে না। পরন্তু দু-ভাই গিয়ে কাঠ নিয়ে আসবে।

—নহী চলেগা সাব্। এক বোঝ লকরিসে দো রোজ নহী চলতে।

—না চলে, স্টোভ আছে, রুটি না খেয়ে পরোটা খাওয়া যাবে। গোরা বলে।

কিন্তু কাকে এসব কথা বলা? সে বলে—সাব্ আপ ফিকর মাত কিজীয়ে। বর্তন সাফা করকে ম্যাঁয় তুড়ন্ত লকরি লে আয়েগা। উসকো বাদ আপকো চায় পীলায়গা।

আকাশের অবস্থা ভাল নয়। যে কোন সময় আবার বৃষ্টি আসতে পারে। নেতা ওকে আবার মনে করিয়ে দেয়।

—আনে দেও সাব্! ম্যাঁয় পাহাড়ী আদমী, পানিসে হমাবা কুছ নহী হোতী।

অতএব আর বাক্য ব্যয় বৃথা। বরং তাতে ওর দেরি হয়ে যাবে। তার চাইতে ওর কার্জ ওকে করতে দেওয়াই ভাল। আমরা তাঁবুতে চলে আসি।

তপন ভেতরে এসে এয়ার-ম্যাট্রেস বিছিয়ে নিজের জায়গা ঠিক করে নিল। 'লেফ্ট-লাগেজ' থেকে চটি ও পায়জামা বের করে পোশাক পালটে নিল। অর্থাৎ আমাদের দলে নাম লেখালো। ছেলেটার সত্যি দুর্ভাগ্য। ক্লাইম্বিং মেম্বার হয়েও নন-ক্লাইম্বারদের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধতে হল।

কথাটা আর সবাই ভুলে গেলেও শৈলেশ ভোলে নি। সে সহসা বলে ওঠে—এবারে তাহলে ১৯৮১ সাল থেকে আবার শুরু করুন শঙ্কুদা!

—কি শুরু করবেন? তপন বুঝতে পারে না শৈলেশের কথা।

রঞ্জু বুঝিয়ে দেয়—শঙ্কুদা আমাদের কাছে কিশ্‌তোয়ার-হিমালয়ে পর্বতারোহণের কথা বলছিলেন। তুই আসার আগে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত বলা হয়েছে।

—আমার শোনা হল না। যাকগে, আপনি একাশি থেকেই শুরু করুন। তাই শোনা যাক। তপন যোগ করে।

অতএব আবার ডায়েরী খুলে শুরু করি—১৯৮১ সালে কিশ্‌তোয়ার-হিমালয়ে ছ'টি অভিযান হয়েছে। তাঁদের মধ্যে প্রথমেই বলব কলকাতার হাইকার্স এ্যাণ্ড এক্‌সপ্লোরার্স এবং ক্লাইম্বার্স সার্কেলের অভিযানের কথা। প্রথম দল জুন-জুলাই মাসে অনাথ নাথ অধিকারীর নেতৃত্বে ব্রহ্মা ও কিরলসর হিমবাহ সমীক্ষা করেন। দলের অন্যান্য সদস্যরা হলেন, গৌতম মুখার্জি, অশোক মুখার্জি ও বিকাশ দাস। তাঁরা নান্থ নালার পথে গিয়েছিলেন। আর দ্বিতীয় দল বি. আর. সরকারের নেতৃত্বে কিয়ার উপত্যকায় ৫৫৯৭ মিটার (১৮,৩৫২´) উঁচু একটি অনামী শৃঙ্গে আরোহণের চেষ্টা করেন।

বাকি চারটি অভিযানের আয়োজন করেছিলেন বৃটিশ পোলিশ ডাচ্‌ ও ইতালীয় অভিযাত্রীরা। ডাচ্‌ অভিযানটির নেতা ছিলেন M. C. Boerlage তারা নতুন পথে অর্থাৎ দক্ষিণ-পশ্চিম গিরি-শিরা ধরে ব্রহ্মা-২ শিখরে আরোহণ করেন। এটি এই শৃঙ্গে দ্বিতীয় আরোহণ।

অপর তিনটি অভিযান যেসব শৃঙ্গে পরিচালিত হয়েছে, তার কোনটাই ব্রহ্মা হিমবাহ অঞ্চলে অবস্থিত নয়।

১৯৮২ সালে কিশ্‌তোয়ার-হিমালয়ে মাত্র একটি অভিযান হয়েছে। কয়েকজন তুষার-প্রেমিক 'স্কি' করতে এসে 'কন্‌সোলেশন' শৃঙ্গে আরোহণ করেন। আর. কলিস্টার ছিলেন তাঁদের নেতা।

১৯৮৩ সালে কিশ্‌তোয়ার-হিমালয়ে আবার ন'টি অভিযান পরিচালিত হয়েছে। চারটি বৃটিশ এবং একটি করে জাপানী আমেরিকান পোলিশ ফরাসী ও ভারতীয় অভিযান।

বি. দাশের নেতৃত্বে ভারতীয় অভিযাত্রীরা ব্রহ্মা-২ শিখরে

আরোহণ করেন। এটি এই শৃঙ্গে তৃতীয়বার আরোহণ।

আমেরিকান অভিযাত্রীরা ব্রহ্মা-১ এবং জাপানী অভিযাত্রীরা আইগার শৃঙ্গে আরোহণের চেষ্টা করেন। বাকি ছ'টি অভিযান যেসব শৃঙ্গে পরিচালিত হয়েছে, সেগুলি সবই এখান থেকে বহুদূরে অবস্থিত। তাহলেও একটি অভিযানের উল্লেখ না করে পারছি না। সেটি হল এস· ভেনাবল্স-এর নেতৃত্বে প্রথম কিশ্‌তোয়ার-শিবলিঙ্গ শিখরে আরোহণ। *

আমি থামতেই শৈলেশ বলে ওঠে—২১,৪৬৬ ফুট উঁচু শিবলিঙ্গ শৃঙ্গ তো গাড়োয়ালে, গোমুখীর ওপরে। কিশ্‌তোয়ার-শিবলিঙ্গ নামে আবার কোন শৃঙ্গ আছে নাকি!

—আছে। অমূল্য উত্তর দেয়। বলে—৬০০০ মিটার অর্থাৎ ১৯,৬৮৫ ফুট উঁচু এই শৃঙ্গটির আকৃতি অনেকটা শিবলিঙ্গের মতো বলে এর নাম কিশ্‌তোয়ার-শিবলিঙ্গ। অবশ্য শৃঙ্গটি কিশ্‌তোয়ার-হিমালয়ের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে অর্থাৎ লাদাখ সীমান্তে অবস্থিত।

থামে অমূল্য, আমি বলতে থাকি—১৯৮৪ সালে কিশ্‌তোয়ার-হিমালয়ে দুটি পর্বতাভিযান পরিচালিত হয়েছে। একটি বৃটিশ ও একটি আইরিশ। পঁচাশি সালে অর্থাৎ গতবছরেও দুটি অভিযান হয়েছে, একটি বৃটিশ ও একটি আমেরিকান। এই চারটি অভিযানের কোনটিতেই ব্রহ্মা-হিমাঙ্গনের কোন শিখরে আরোহণ করার চেষ্টা করা হয় নি।

একবার একটু থেমে আবার বলি—এই হোল কিশ্‌তোয়ার-হিমালয়ে পর্বতারোহণের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

—হয়ে গেল? আমি থামতেই গোরা প্রশ্ন করে।

একটু হেসে বলি—হ্যাঁ, পঁচাশি সাল অর্থাৎ গতবছর পর্যন্ত হিসেব তো দিয়ে দিলাম।

—এ বছরের কথা বলবেন না?

—এ বছর তো এখনও শেষ হয় নি। তাছাড়া তুমিও জানো, এ

* 'Painted Mountains' by Stephen Venables

বছর এ পর্যন্ত তুটি ব্রহ্মা-১ অভিযান আয়োজিত, একটি জাপানীদের ও একটি আমাদের।

—সেই কথাটা বলেই আপনার বিবরণ শেষ করুন। গোরা হাসতে হাসতে বলে।

এতক্ষণে আমি ওর প্রশ্নটার কারণ বুঝতে পারি। কিন্তু সেকথা বলতে পারার আগেই জয় বলে ওঠে—হাসি-গল্প অনেক হল, আর নয়। তাঁবুর চারিরিকে নালা কাটা শেষ হয় নি তখন, এসো এখন সেটা কেটে ফেলা যাক। আকাশের অবস্থা ভাল নয়। যে কোন সময় আবার বৃষ্টি নামতে পারে।

—জয় ঠিকই বলেছে। আয় সবাই মিলে নালাটা কেটে দিই। গোরা উঠে দাঁড়ায়।

নেতা বাধা দেয়। বলে—নো। হেড-কুক মাটি কাটার কাজে হাত দেবে না, সে তার নিজের কাজ করবে।

—কি কাজ ?

—তুমি হেড্-কুক তোমাকে বলতে হবে কেন যে টী-টাইম হয়ে গিয়েছে।

—কিন্তু আমি তো সেদিন বলে দিয়েছি লীডার, হেড্-কুক চা বানায় না।

—না বানালেও তাকেই ব্যবস্থা করতে হয়।

—যো হুকুম লীডার! গোরা হাসতে হাসতে দোরের দিকে এগিয়ে যায়। আমরাও অট্টহাসিতে ফেটে পড়ি।

॥ চোদ্দ ॥

আজ ২২শে সেপ্টেম্বার।

না, থাক্। আজকের কথা পরে হবে, তার আগে কালকের কথা বলে নিই। গতকাল সন্ধ্যার সময় আবার আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নেমেছিল। প্রায় সারা তাঁবুতেই জল পড়েছে। দুপুরে ভাগ্যিস চারিদিকে নালা কেটে দেওয়া হয়েছিল। গ্রাউণ্ড-শীটের ওপর দিয়ে জল বয়ে যায় নি। কিন্তু গ্রাউণ্ড-শীট ভিজে উঠেছে। আগেই বলেছি অধিকাংশ এয়ার-ম্যাট্রেস ফুটো। কাজেই সাড়ে তেরো হাজার ফুট উঁচুতে চুপসে যাওয়া এয়ার-ম্যাট্রেসে রাত কাটানো। তার ওপরে চলেছে দুর্যোগ। অসিত কাননে রাজ্যের ঠাণ্ডা এসে হাজির হয়েছে। রুক্স্যাক্ সহ তাবুর ভেতরের সব জিনিসই ভিজে গেছে। অনেক চেষ্টা করে কেবল স্লীপিং ব্যাগগুলো বাঁচাতে পেরেছি।

তাহলেও আমাদের অদৃষ্ট ভাল। রাত ন'টা নাগাদ বৃষ্টি থেমে গেছে। একটু বাদে আকাশের অবস্থা দেখতে বাইরে এসেছি। অবাক হয়েছি। তারায় ভরা-আকাশে চাঁদ উঠেছে। চাঁদের আলোয় মুখ আলো করে বসে আছেন ব্রহ্মাজী। পরম স্নেহে তিনি তাকিয়ে আছেন আমাদের দিকে। আমরা পরমানন্দে প্রজাপতিকে প্রণাম করেছি।

জলসিক্ত শিবিরে ঘুমের ব্যাঘাত হয়েছে। রাতে ঠিকমত ঘুমোতে পারি নি। একে ঠাণ্ডা তার ওপরে সবই ভিজে। তাঁবু থেকেও ফোঁটা ফোঁটা জল পড়েছে সর্বত্র। সবারই বার বার ঘুম ভেঙে গিয়েছে। তাহলেও রাত ফুরিয়েছে। সুখের দিনের মতো দুঃখের রাতও অন্তহীন নয়।

আজ সকালে তাঁবুর বাইরে বেরিয়েই বুকখানি আমার আনন্দে ভরে উঠেছে। আজ আকাশ আবার আগের মতই ঘন নীল। করুণাঘন

দৃষ্টিতে ব্রহ্মাজী তাকিয়ে আছেন আমার দিকে। আমি তাঁকে প্রণাম করি।

হিমবাহের পরপারে শ্বেতশুভ্র ফ্ল্যাট-টপ ও তার প্রতিবেশীরাও তাকিয়ে আছেন। আমিও তাঁদের দেখি।

আমার মন অপার আনন্দে নেচে উঠেছে। প্রকৃতি তাহলে সহায় হলেন আমাদের। আর তিনি সহায় হলে আমার পর্বতারোহী ভাইরা দু-তিন দিনের মধ্যেই ব্রহ্মা-১ পর্বতশিখরে ভারতের জাতীয়-পতাকা প্রথম প্রোথিত করতে পারবে।

রসিদকে ডেকে তুলি। তাকে চা বানাতে বলি। পাথরের ফাঁকে ফাঁকে তুষার পড়ে রয়েছে। রাতের ঠাণ্ডায় বৃষ্টির জল জমে গিয়েছে। দেখতে ভারী ভাল লাগছে। মুক্তোর মতো মনে হচ্ছে। এ যাত্রায় আমি এখন পর্যন্ত তুষারপাত দেখি নি।

এই সাত সকালেই নালায় জল এসে গেছে। বৃষ্টির জল। সেই জলেই মুখ ধুয়ে নিয়ে তাঁবুতে ফিরে আসি। সঙ্গীদের ডেকে তুলি। আকাশের সংবাদ দিই। সবাই খুশিতে চিৎকার করে ওঠে।

কিছুক্ষণ বাদে রসিদ চা নিয়ে আসে। বলে—গুড-মর্ণিং সাব্, চায়।

সবাই হৈ হৈ করে উঠে বসে। রসিদকে সুপ্রভাত জানিয়ে হাত বাড়িয়ে মগ হাতে নেয়। চায়ে চুমুক দিতে দিতে নেতা বলে—তপন, তাহলে আজ আর কাউকে ওপরে পাঠাচ্ছি না।

—গৌতম তাই বলে দিয়েছে। ওরা আজ ও কাল তিন নম্বর শিবির প্রতিষ্ঠা করে শিখরের পথ তৈরি করবে। আজ সকালে হ্যাপ-রাও দু-নম্বরে চলে যাবে। আগামীকাল ওপরের খবর দিয়ে হ্যাপ্-দের একনম্বরে পাঠিয়ে দেবে। তপন উত্তর দেয়।

নেতা বলে—আজ একনম্বরে কেউ থাকছে না।

—তাহলে আর লোক পাঠিয়ে কি হবে? টুলটুল বলে।

জয় রঞ্জু আর শৈলেশও মাথা নাড়ে।

প্রভাতী পরামর্শ শেষ হয়। বেরিয়ে আসি বাইরে। ফ্ল্যাট-

টপের পেছন থেকে সূর্য উঠল। তার সোনালী পরশে ব্রহ্মা-শিখর সোনা হয়ে গেল।

রোদ এলো অসিত কাননে, আমাদের তাঁবুর ওপরে। আর তখুনি রঞ্জু বলে বসল—আসুন, তাঁবুটা খুলে ফেলা যাক। তাহলে ভেতরের জায়গা এবং জিনিসপত্রগুলো সব শুকিয়ে যাবে আর তাঁবুটাও সারাবার চেষ্টা করা যেতে পারে।

—তাঁবু সারাবি! শৈলেশ জিজ্ঞেস করে—কি দিয়ে সারাবি?

—কেন? আমার কাছে প্রচুর ব্যাণ্ড্-এড্ রয়েছে।

—প্রস্তাবটা মন্দ নয়। জয় বলে—চেষ্টা করা যেতে পারে।

—মন্দ কি? নেতা অনুমতি দেয়।

গোরা বলে—টাঙ্গাবার সময় দড়িগুলো আরেকটু টেনে দিস। তাহলে আর অত জল পড়বে না।

রসিদ ও টুলটুলকে নিয়ে গোরা কিচেনে চলে যায়। আমরা তাঁবু খুলে ফেলি। ব্যাণ্ড-এড্ দিয়ে সারিয়ে কতটা লাভ হবে জানি না। তবে তাঁবু খুলে ফেলায় রোদ লেগে গ্রাউণ্ড-শীট শুকিয়ে যাবে। স্যাঁতস্যাঁতে ভাবটা দূর হবে। রঞ্জু জয় ও শৈলেশ তাঁবু সারাতে লেগে যায়। আমি অমূল্য আর তপন ভেজা জিনিসপত্র রোদে শুকোতে দিই।

সকাল সাড়ে নটায় নালার জল বন্ধ হয়ে গেল। রসিদ ভরসা দেয়—বৃষ্টির জল ফুরিয়ে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার বরফগলা জল চলে আসবে।

সে পাহাড়ী মানুষ, ঠিকই বলেছে। কালকের বৃষ্টিতে কালো পাহাড়ের গায়েও বরফ পড়েছে। যা রোদ উঠেছে, তাতে বরফগলা শুরু হতে সময় লাগবে না।

সকাল দশটায় গরম গরম ডাল-রুটি দিয়ে ব্রেক-ফাস্ট পাওয়া গেল। তাই খেয়েই রসিদ কাঠ আনতে বনে ছুটল। ওকে নিষেধ করে লাভ নেই। ও কিছুতেই বসে থাকবে না।

সদস্যরা সবাই কোন না কোন কাজ করছে। কেবল আমি আর

অমূল্য কর্মহীন। আমরা তাই বার বার ব্রহ্মাজীর দিকে তাকাই। তাকিয়ে তাকিয়ে তাঁকে দেখি। তিনি যেন আজ আরও সুন্দর, আরও মহান, আরও করুণাময়। তাঁর অপার করুণায় আমার ভাইরা নিশ্চয়ই নিরাপদে ফিরে আসবে আমার কাছে।

সাড়ে দশটাতেই নালায় জল এসে গেল। পরিষ্কার জল। টলটলে জল ছলছল করে বয়ে যাচ্ছে। বেচারী রসিদকে আজ আর পাথর ডিঙ্গিয়ে জল আনতে যেতে হবে না।

আকাশে আবার মেঘের আসা-যাওয়া শুরু হয়েছে। যারা দুষ্টু ছেলেদের মতো শুধুই ছুটোছুটি করছে, তাদের দেখে ভয় পাচ্ছি না। ভয় পাচ্ছি নিচের দিকে ঘন-মেঘগুলো দেখে। তারা ব্রহ্মা পর্বতের দক্ষিণ-পূর্ব গিরিশিরা আর ব্রহ্মা হিমবাহের ওপরে থমকে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

থাকুক গে, ব্রহ্মাজীর মুখখানি তো দেখতে পাচ্ছি। আমরা যে তাঁরই মুখ চেয়ে বসে আছি। তাই তাঁকে আবার বলি—হে স্বয়ম্ভু, আর তিন দিন, মাত্র তিনটি দিনই তুমি আমাদের কৃপা ক'রো। আমরা তোমার পুজো শেষ করি।

মেঘলোকের অবস্থা যাই হোক, ব্রহ্মলোক কিন্তু আজ দিবাকরের দীপ্তিতে দীপ্যমান। আজকের এই চক্‌চকে দুপুরে বসে গতকালের বৃষ্টিভেজা সন্ধ্যাটিকে স্বপ্ন বলে মনে হচ্ছে। তাঁবু শুকিয়ে গেছে, জিনিসপত্র সব শুকিয়ে গেছে। অসিত কানন এখন শুকনো খটখটে, রোদের তেজে তেতে উঠেছে।

আচ্ছা, এই রোদ কি ওরা ওপারেও পাচ্ছে? নিশ্চয়ই! অন্তত ব্রহ্মাজীর দিকে তাকিয়ে তাইতো মনে হচ্ছে। ওরা কাল তিন নম্বর শিবির প্রতিষ্ঠা করবে। পরশু শেষরাতে চূড়ান্ত সংগ্রামে অবতীর্ণ হবে। সে সংগ্রাম সার্থক হবে কি? নিশ্চয়ই হবে।

কিন্তু গতকালের রাতটা ওরা কেমন কাটিয়েছে? বোধকরি মোটেই ভাল নয়। খুবই কষ্ট হয়েছে। আমাদের এখানে বৃষ্টি মানে ওদের ওখানে তুষারপাত। তবে ওরা যে পর্বতারোহী। এমন কষ্ট

ওদের করতেই হবে।

রসিদ কাঠ নিয়ে ফিরে আসার পরে লাঞ্চ পাওয়া গেল—ডাল ভাত পাপর ও আচার। বেলা সাড়ে বারোটা নাগাদ আমাদের খাওয়া শেষ হল। আর তখুনি রসিদ চেঁচিয়ে উঠল—সাব্, আদমী!

—কিধার?

—উপার। যা রহা হ্যাঁয়।

জয় ছুটে গিয়ে তাবু থেকে বাইনোকুলার নিয়ে এলো। একটু বাদে বলতে থাকে—হ্যাঁ, দুজন···পিঠে মাল নিয়ে চলেছে।···ব্যস, পাহাড়ের আড়ালে চলে গেল। আর দেখা যাচ্ছে না।

তপন বলে—রাম ও পেয়ার একনম্বর থেকে দু-নম্বর শিবিরে যাচ্ছে। যেখান দিয়ে চলেছে, ওটাই ব্রহ্মা-১ পর্বতের দক্ষিণ-পূর্ব গিরিশিরা আর আমাদের দু-নম্বর শিবিরের পথ। পথের একটা জায়গা থেকে ওরাও এই মূল-শিবির দেখতে পেয়েছিল।

হিমালয়ের রোদ আর সুন্দরী যুবতীর মন, দেবাঃ ন জানন্তি। কখন যে কাকে কৃপা করবে, কেউ জানে না। কিছুক্ষণ আগেও ভাবছিলাম, বাইরে বড় গরম এবারে ভেতরে যাওয়া যাক। সেই কাঠ-ফাটা রোদ মুহূর্তে মিলিয়ে গেল। কোথা থেকে ছুটে এলো আকাশ-জোড়া ঘন মেঘ। তারা সূর্যকে ঢেকে ফেলল, ব্রহ্মা আর ফ্ল্যাট-টপকে আড়াল করল। আর সেই সঙ্গে হাজির হল কন্‌কনে ঠাণ্ডা হাওয়া। তাড়াতাড়ি তাঁবুতে পালিয়ে এলাম।

স্লীপিং ব্যাগ গায়ে দিয়ে বসে গল্প শুরু করি। অমূল্য তার বিভিন্ন অভিজ্ঞতার গল্প বলছে। রসিদ আবার কাঠ আনতে গিয়েছে। সে ফিরে এলে বৈকালী চা হবে।

চারটের আগেই রসিদ ফিরে এলো। না, রসিদ নয়, রসিদ ব্রাদার্স। দু-ভাই একসঙ্গে ফিরে এসেছে। ছোট-রসিদ কাঠ এনেছে আর বড়-রসিদ রাজমা চিনি বিড়ি আলু মুলো টমেটো শসা কুমড়ো ডাক-টিকেট আর চিঠি নিয়ে এসেছে। পোস্টমাষ্টারসাব্ আমাদের শুভেচ্ছা পাঠিয়েছেন। জানিয়েছেন, এখনও কিশ্‌তোয়ার স্বাভাবিক

হয় নি, পাতিমহলায় বাস আসছে না। বাস আসা শুরু করলেই তিনি আমাদের চিঠি ও টেলিগ্রাম নিচে পাঠিয়ে দেবেন।

কিন্তু কিশ্‌তোয়ার স্বাভাবিক নয় কেন? কি হল সেখানে? বাসই বা কেন আসছে না পাতিমহলায়? প্রাকৃতিক তাণ্ডব কিংবা রাজনৈতিক বিক্ষোভ?

—নহী সাব্‌! বড়-রসিদ জবাব দেয়—কিশ্‌তোয়ারামে দাঙ্গা হুয়া।

—দাঙ্গা!

—জী সাব্‌! হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা, রায়ট...

—রায়ট! কব্‌?

—পন্দেরো তারিখ।

—পনেরোই সেপ্টেম্বার!

—জী সাব্‌। অভিভি কারফিউ চল্‌ রহা।

সেকি! আমরা তো তেরোই দুপুর দুটোয় কিশ্‌তোয়ার থেকে পাতিমহলা রওনা হয়েছি। তারপরে আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে কিশ্‌-তোয়ারে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা হয়ে গেল! আর তারই ফলে আটদিন ধরে কারফিউ চলেছে, পাতিমহলায় বাস আসছে না।

অথচ কিশ্‌তোয়ার এসে যে জিনিসটি দেখে আমি প্রথম অভিভূত হয়েছি, সেটি হল সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, হিন্দু-মুসলমানের মিল। আর তারপর থেকে এই মিল দেখে প্রতিদিন আমার মন ভরে উঠছে। শ্যামা বাটসাহেব মেট ও রসিদভাইদের সেবা ও যত্নে বার বার পুলকিত হয়ে উঠছি। অথচ এরা সবাই মুসলমান আর আমরা হিন্দু।

গাড়োয়াল কুমায়ুন হিমাচল ও সিকিমে পর্বতাভিযানে গিয়েছি। সেখানে হিন্দুরাই আমাদের মেট ও মালবাহকের কাজ করেছে। কিন্তু কোথায়, তারা তো এদের চেয়ে আমাদের বেশি সেবা-যত্ন করে নি! বরং কেউ কেউ জুলুম করে বেশি টাকা আদায় করে নিয়েছে। তাহলে কেন এই দাঙ্গা আর কেনই বা একজন মুসলমান হিন্দুদের কাছে সেই সংবাদ বয়ে নিয়ে এলো? কে এই প্রশ্নের উত্তর দেবে?

ধর্ম ? যে ধর্মের নামে আমরা মানুষ হয়েও যুগ যুগ ধরে পশুর মতো আচরণ করে চলেছি।

রসিদ দাঙ্গা বাঁধার কারণ বলে—কিশ্‌তোয়ার কলেজটি সহ-শিক্ষায়তন, ছেলে-মেয়েরা একসঙ্গে পড়াশুনা করে। কলেজের জনৈক বহিরাগত মুসলমান লেকচারার কিছুদিন আগে ফরমান জারী করেছিলেন যে তার ক্লাশে মুসলমান ছাত্রীদের বোরখা পরে আর হিন্দু ছাত্রীদের ওড়না কিংবা শাড়ীর আঁচল মাথায় দিয়ে আসতে হবে। সেই আদেশ অমান্য করে জনৈকা হিন্দুছাত্রী সেদিন 'জিন্‌স' পরে ক্লাসে আসে। মুসলমান অধ্যাপকটি তাকে ধাক্কা দিয়ে ক্লাশ থেকে বের করে দেয় এবং ধস্তাধস্তির সময় মেয়েটির গায়ের জামা ছিঁড়ে যায়।

এই নিয়েই গোলমাল, এই নিয়েই দাঙ্গা। উভয় সম্প্রদায়ের বেশ কিছুলোক ছুরিকাহত হয়েছে, বাজারের কয়েকটি দোকানে আগুন লাগানো হয়েছে। কিন্তু মুসলমান এস. ডি. ও. দেবসাহেব খুবই কঠোর হাতে অবস্থার মোকাবিলা করেছেন। তিন ট্রাক সৈন্য এসেছে। প্রচুর ধরপাকড় হয়েছে। এখনও কারফিউ চলেছে! তবে দু-একদিনেব মধ্যেই দিনের কারফিউ তুলে দেওয়া হবে। তখন আবার পাতিমহলায় বাস আসবে।

ছোটবেলায় শুনেছিলাম, ঢাকায় নাকি একবার কিশোরদের লাট্টু-খেলা নিয়ে হিন্দু-মুসলমানে দীর্ঘস্থায়ী দাঙ্গা হয়েছে। কিন্তু তারপরে তো প্রায় পঞ্চাশ বছর কেটে গেল। ইতিমধ্যে দেশ স্বাধীন হয়েছে। আমরা গরুর গাড়ির যুগ থেকে মহাকাশযানের যুগে উত্তীর্ণ হয়েছি। তবু কেন আমাদের ক্ষুদ্রতার অবসান হল না ? কেন আমরা আজও বুঝে উঠতে পারছি না যে ধর্ম নয়, সম্প্রদায় নয়, মানুষ—সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।

রসিদ ব্রাদার্স এসে গিয়েছে, অতএব চায়ের জন্য আমাদের কাউকে আর কিচেনে যেতে হল না। ওরাই চা বানিয়ে নিয়ে এলো। ভাঙা বিস্কুট দিয়ে চা খেতে খেতে কথাটা মনে পড়ে জয়ের। সে বড়-

রসিদকে জিজ্ঞেস করে—তুমি কখন সোন্দার থেকে রওনা হয়েছো ?

—খুব ভোরে। তখন বোধহয় পাঁচটা হবে।

—খেয়ে বেরিয়েছিলে ?

—জী সাব্। সোন্দারে আমাদের এক মাসি থাকে। আমি কাল রাতে তার বাড়িতেই ছিলাম। তিনিই পথেব জন্য সবজি ও চাপাতি করে দিয়েছেন। তাঁর বাগান থেকেই এই ভুট্টা আর আক নিয়ে এসেছি। তিনি আপনাদের খেতে বলেছেন।

সত্যি কি বিচিত্র আমাদের দেশ। ক'দিন আগে কিশ্তোয়ারে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা হয়ে গেছে। আর এক কিশ্তোয়ারী মুসলমান মাসী বাঙালী হিন্দুদের খাবার জন্য এতগুলো ভুট্টা আর আপেল পাঠিয়ে দিয়েছেন।

এবারে গোরা বড়-রসিদকে বলে—তাহলেও তোমার খিদে পেয়েছে, এতটা পথ হেঁটে এসেছো। এক কাজ করো, কিচেনে গিয়ে দেখো ডাল-ভাত আছে। একটু গরম করে খেয়ে নাওগে।

—নহী সাব্। চায় পীলিয়া। আউর কোই জরুরত নহী। আপকি সাথ্ রাতকো খানা খায়েঙ্গে।

সত্যই তো। মাসির দেওয়া চাপাতি ও সবজি যখন খেয়ে নিয়েছে, তখন রসিদ আবার খাবে কেমন করে ? সে যে 'গরীবী হটাও' ধ্বনিতে মুগ্ধ ভারতের গরীব মানুষ। দিনে দুবার খাবার বিলাসিতা তার জন্য নয়। এবং একথা হিন্দু-মুসলমান শিখ-খ্রীষ্টান সব ধর্মের খেটে খাওয়া ভাবতীয়দের কাছে সমান সত্য।

কিন্তু আমাদের গোরা এসব কথা ভাবতে রাজী নয়। সে এক-রকম জোর করেই রসিদকে কিচেনে পাঠিয়ে দেয়।

একি! আবার বৃষ্টি নামল নাকি? হ্যাঁ, তবে তেমন জোরে নয়। ঝিরঝির করে পড়ছে। তাই মাথায় করে বাইরে আসি। না, আকাশের অবস্থা ভাল নয়। যে-কোন সময় গতকালের মতো বৃষ্টি নামতে পারে, সবে ছ'টা বেজেছে। এরই মধ্যে মিলিয়ে যাচ্ছে দিনের আলো। আঁধার নেমে আসছে ব্রহ্মলোকে, ব্রহ্মাজী বিলুপ্ত

হয়েছেন।

ফিরে আসি তাঁবুতে। বড়-রসিদ পেট্রোম্যাক্স জ্বালায়। তাঁবুর অন্ধকার দূর হয়। শুধু তাঁবুর নয়, সন্ধ্যার পরে বাইরের আঁধারও খানিকটা কমে যাবে। দূর থেকে তাঁবুটিকে আলোর উৎস বলে মনে হবে। কেদারনাথ পর্বত অভিযানের সময় একদিন রাতে অন্ধকারে পথ হারিয়েছিলাম। তাঁবুর ভেতরে মোমবাতি জ্বলছিল। সেই আলোতেই কুয়াশা আর অন্ধকারের মধ্যে বহুদূর থেকে তাঁবুকে আলোর উৎস বলে বুঝতে পেরেছিলাম। নিরাপদে ফিরে এসেছিলাম শিবিরে।

হিমালয়ে এলে হিমালয়ের কথা বেশি মনে পড়ে। নানা কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ কথাটা মনে পড়ে আমার। আজ কারও মন ভাল নয়। ওপরের খবর পাই নি। ওরা তিন নম্বর শিবিরের জায়গা পেল কিনা, জানতে পারি নি। তার ওপরে আকাশের অবস্থা ভাল নয়। কিন্তু তাই বলে আমরা কেন আকাশের মতো মুখভার করে থাকবো?

এ অবস্থায় সহযাত্রীদের চাঙ্গা করে তুলতে হলে তাদের একটি গৌরবময় অভিযান নিয়ে আলোচনা করা দরকার। ১৯৮৪ সালে অমূল্যর নেতৃত্বে এই সদস্যদের নিয়ে গঠিত অভিযাত্রীদল ভারতীয় পর্বতারোহণের ইতিহাসকে অলঙ্কৃত করেছে। ২১,৩৪৯ ফুট অর্থাৎ ৬৫০৭ মিটার উঁচু সুদুর্গম সুদর্শন শিখরে ভারতের জাতীয়-পতাকা প্রোথিত করেছে। এদের কাছে সেই অভিযানের কথা শুনতে চাওয়া যাক। তাহলে এরা আজকের অবস্থা বিস্মৃত হয়ে অতীতের গৌরবে গৌরবান্বিত হয়ে উঠবে। সবার সব হতাশা দূর হবে, মনের মেঘ কেটে যাবে।

আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। ইন্‌স্টিটিউট অব্ মাউণ্টেনীয়ারিং এক্‌স্‌প্লোরেশান-এর মুখপাত্র 'ম্যান এ্যাণ্ড মাউণ্টেন-'এর একটা কপি রুক্‌স্যাক্ থেকে বের করে শৈলেশ নিজের লেখাটি পড়তে শুরু করে দেয়। আমি মন দিয়ে শুনি। শৈলেশ পড়ছে—

'কয়েক বছর আগে গঙ্গোত্রী থেকে ভাগীরথীর উৎস গোমুখী যাচ্ছিলাম। গঙ্গোত্রী মন্দিরের ওপর দিয়ে একটি পর্বতশৃঙ্গ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। শুনলাম সেটি সুদর্শন পর্বত। ২১, ৩৪৯ ফুট উঁচু এই শৃঙ্গটিতে বহু অভিযান আয়োজিত হয়েছে। কিন্তু একমাত্র ১৯৮০ সালের ইন্দো-ফরাসী অভিযান ছাড়া আর কেউ সফল হতে পারেন নি। তখুনি ঠিক করেছিলাম, আমরা একবার চেষ্টা করে দেখব।

১৯৮৪ সালে আমরা অভিযানের আয়োজনে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। ১৭ই মে যাত্রা করলাম হাওড়া থেকে। আপনাকে বাদ দিয়ে বাকি এগারোজন সবাই দলে ছিলাম। অমূল্যদার হাতে জাতীয়-পতাকা ও ক্লাব-পতাকা তুলে দিয়েছিলেন মাননীয় ক্রীড়ামন্ত্রী শ্রীসুভাষ চক্রবর্তী।

১৯শে সকাল দশটায় আমরা ঋষিকেশ পৌঁছলাম। সেখান থেকে সাড়ে এগারোটার বাস ধরে সাতটায় উত্তরকাশী।

প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ও মালবাহক সংগ্রহের জন্য দুদিন উত্তর-কাশীতে থাকতে হল। দশজন সাধারণ ও দুজন উচ্চ-হিমালয়ের মাল-বাহক এবং একজন পরিচারক ঠিক করা গেল। পর্বতারোহণ শিক্ষা কেন্দ্র থেকে সাজ-সরঞ্জাম সংগৃহীত হল। প্রয়োজনীয় কেনাকাটাও শেষ করা গেল। তারপরে ২১শে মে ভোর পাঁচটার বাস ধরে দশটায় লঙ্কা পৌঁছলাম। সেখানে প্রাতঃরাশ সেরে রুক্‌স্যাক্ পিঠে তুলে নিলাম। শুরু হল পায়ে পায়ে হিমালয়ের পথচলা। বিকেল পাঁচটায় গঙ্গোত্রী পৌঁছলাম।

২৩শে সকালে ঘুম ভাঙ্গার পরে ঘরের বাইরে এসেই সুদর্শনকে দর্শন করলাম। আমাদের শরীরে এক অপূর্ব অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ পরে তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়লাম গঙ্গোত্রী থেকে। বেলা তিনটে নাগাদ ভুজবাসায় লালবাবার আশ্রমে পৌছলাম। গরম চা ও খিচুড়ি খেয়ে শরীরের সমস্ত ক্লান্তি দূর হয়ে গেল।

পরদিন সকালে ভাগীরথীর উৎস গোমুখী। কিন্তু গোমুখীর

বেশ কিছুটা ওপর দিয়ে গঙ্গোত্রী হিমবাহে উঠে এলাম। ফেরার পথে গোমুখী দর্শনের ইচ্ছা মনে রেখে এগিয়ে চললাম।

এবার আসল যাত্রা শুরু। আলগা পাথরের ওপর পা রেখে ওপরে ওঠা কিংবা নিচে নামা। কোন রকমে দেহের ভারসাম্য বজায় রেখে চলতে হচ্ছিল। মাঝে মাঝেই পাশের পাহাড় থেকে পাথরের চাঁই সবেগে নিচে নেমে আসছিল। একটা তো প্রায় অমূল্যদার মাথায় এসে পড়েছিল। অদ্ভুত তৎপরতায় তিনি রক্ষা পেয়ে যান।...’

—এপথে কিন্তু আমরা একটাও পাথর পড়ার জায়গা পাই নি অমূল্যদা। টুলটুলের কথায় থামতে হয় শৈলেশকে।

অমূল্য বলে—তা তো বটেই। তাই কি জানো, ব্রহ্মলোকের পথ যত দুর্গমই হোক, বিপজ্জনক নয়। যাক্ গে, শৈলেশ শুরু করো।

শৈলেশ পড়তে থাকে—‘আমরা গঙ্গোত্রী ও রক্তবরণ হিমবাহের সঙ্গমে পৌঁছলাম। রক্তবরণ নালা ধরে রক্তবরণ হিমবাহে প্রবেশ করলাম। এবারে পথ আরও বিপদসঙ্কুল। ওপর থেকে পথে বেশি সংখ্যায় পাথর পড়ছিল।

চলতে চলতে একসময় চলে এলাম থেলু হিমবাহের সঙ্গমে। আগের নভেম্বরে আমাদের সমীক্ষক-দল এখানেই মূল-শিবির স্থাপন করেছিল। এখানে বসে সঙ্গের খাবার দিয়ে মধ্যাহ্নভোজ সেরে নিলাম। খেতে খেতে রক্তবরণ হিমবাহের ওপারে সবুজ প্রান্তরে হরিণ ঘুরে বেড়াতে দেখলাম। আর সেই সঙ্গে লক্ষ্য করলাম গাছপালার সংখ্যা কমতে কমতে কখন একদম অদৃশ্য হয়ে গেছে। বেলা ৪টা নাগাদ একটু সমতল জায়গা দেখে শিবির ফেললাম। এখান থেকে তিনজন মালবাহক ভুজবাসা ফিরে গেল আমাদের রেখে আসা মালপত্র নিয়ে আসতে। আমাদের প্রধান তাঁবুটি ছিল আকারে বেশ বড়। দলের সব সদস্যই তার মধ্যে জায়গা করে নিলাম। পাশেই শেরপা ও মালবাহকদের জন্য আরও তিনটি তাঁবু ছিল। শিবিরের পরিবেশ খুব উপভোগ্য হয়ে উঠল। কিন্তু অন্ধকার নামতেই প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় জমে যাওয়ার উপক্রম। বেশ কিছু গরম পোষাক চাপিয়ে দলনেতার

সাথে পরদিনের অভিযান নিয়ে আলোচনা শুরু হল। এখান থেকে আমাদের রক্তবরণ হিমবাহের দিকে এগোতে হবে। ঠিক হল সকালের দিকে লাকপা একটি দলকে নিয়ে এগিয়ে যাবে মূল-শিবির স্থাপনের উদ্দেশ্যে। মাল বাহকেরা ফিরে এলে বাকি সবাই অগ্রসর হবে।

ভরত হাঁক দিল, "খানা তৈয়ার হ্যায়।" সবাই উপলব্ধি করলাম প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই শিবির নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

২৫ তারিখ সকালে প্রথম দলটিকে ছেড়ে দিলাম। বেলা ১১টা নাগাদ তিনজনের জায়গায় ২ জন মালবাহক ফিরে এল। অপরজন কাউকে কিছু না বলেই ফিরে গেছে। ফলে বেশ কিছু মালপত্র বিশেষ করে কেরোসিনের একটি বড় জায়গা ভুজবাসে রয়ে গেছে। ঘটনাটি আমাদের খুব অবাক করল। খুব সম্ভব মালবাহকটি অন্য কোন দলে বেশি পারিশ্রমিকের আশায় চলে গেছে। বুঝতে পারলাম একান্ত বিশ্বাসী এই সব পাহাড়ী মানুষদের মধ্যেও শহরের দূষিত আবহাওয়া প্রবেশ করেছে। যাইহোক, ইতিমধ্যে ভরতের রান্না করা খিচুড়ি দিয়ে মধ্যাহ্নভোজ সেরে মূল-শিবির স্থাপনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। কিছুটা রাস্তা সোজা আসার পর রক্তবরণ নালার উৎসমুখ সামনে রেখে বাঁদিকে বাঁক নিতে গিয়েই মনে হল আর চলা অসম্ভব। কারণ আমাদের এগোতে হবে একটি শুকিয়ে যাওয়া প্রস্রবণের উপর দিয়ে। জল না থাকলেও সেটি একটি পাথরের প্রস্রবণে পরিণত হয়েছিল। বিশাল বিশাল আলগা পাথরে পা রাখলেই হুড়মুড়িয়ে নেমে আসছে। সে এক অদ্ভুত পরিস্থিতি। হঠাৎ দেখলাম গৌতম ও শিবু ভালো রাস্তার খোঁজে এমন একটা জায়গায় গিয়ে উপস্থিত হয়েছে, যেখান থেকে আর নড়তে পারছে না। ওদের নিচে নেমে আমাদের রাস্তায় আসতে পরামর্শ দিয়ে এগিয়ে চললাম। উপর থেকে তখন পাথরের ঢল নামছে। কোনরকমে নিজেকে বাঁচিয়ে এগোতে লাগলাম। হঠাৎ দেখলাম পলদিন একটা পাথরের ঢিবির আড়াল থেকে এসে উপস্থিত আগের দলে সে এসেছিল। কিন্তু রাস্তার ফাঁদে পড়ে সেও আমাদের মত কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছে। বহুকষ্টে যখনই সেই প্রস্রবণের

মাথায় পৌঁছালাম, তখন সকলের দম নিঃশ্বেসিত। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর এগিয়ে চললাম। দূর থেকে চোখে পড়ল কিছুটা ফাঁকা জায়গা। এসে পৌঁছালাম এক স্বর্গীয় পরিবেশে। আমাদের পেছন দিকে শিবলিঙ পর্বত, সামনে মাউণ্ট সুরালয় এবং শ্রীকৈলাস শৃঙ্গ, ডাইনে সরীসৃপ আকারে রক্তবরণ হিমবাহ এবং বাঁদিকে রুক্ষ পর্বতমালা পাথরের দেয়াল তুলে দাঁড়িয়ে আছে। নুড়ি পাথর বিছানো কিছুটা সমতল জায়গা। মাঝে ছোট ছোট গাছের ঝোপ মাটি থেকে মাথা তুলেই বিভিন্ন রঙের ফুলে নিজেদের সাজিয়ে আমাদের অভ্যর্থনা জানাল। বেশ কয়েকটি বড় জাতের কুচকুচে কালো পাখি হলুদ ঠোঁট নেড়ে তাদের রাজ্যে আমাদের স্বাগতম জানিয়ে ঘোরাফেরা করতে লাগল। লাকপা ইতিমধ্যে পাথর দিয়ে একটা কুড়ে বানিয়ে ফেলেছে। দলের সব সদস্য একে একে এসে পড়ল। প্রচণ্ড ক্লান্তিতে সকলের শরীর অবসন্ন। কিন্তু অমূল্যদার আদেশে প্রত্যেককে বাড়িতে চিঠি লিখতে হল। বিভিন্ন জায়গায় আমাদের মূলশিবির স্থাপনের খবর পাঠাবার জন্য অমূল্যদার আদেশে আমাকে আর তপনকে বেশ কিছু চিঠি লিখতে হল। প্রায় ১৫,৫০০ ফুট উঁচুতে আমাদের মূলশিবির স্থাপিত হল। স্বর্গত সুসাহিত্যিক ও হিমালয়-প্রেমিক প্রবোধ কুমার সান্যালের নামে আমরা এই অঞ্চলের নামকরণ করলাম 'প্রবোধ-কানন'।

২৬শে মে সকাল থেকেই বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। আবহাওয়ার সাথে নিজেদের কিছুটা মানিয়ে নেওয়ার জন্য আমাদের আজ যাত্রাবিরতি। পরদিন একনম্বর শিবির স্থাপনের জন্য তৈরি হতে লাগলাম। ঠিক হল প্রথমদিন পাঁচজন সদস্য জগদীশ গৌতম শিবু কৃষ্ণ ও তপন, দুজন শেরপা ও দুজন High Altitude Porter এক নম্বর শিবির স্থাপনের জন্য অগ্রসর হবে। গোরা বিনয় এবং আমার উপর ভার পড়ল মূল-শিবিরের সাথে অগ্রবর্তী শিবিরগুলির যোগাযোগ রক্ষা করা। তাছাড়া বিভিন্ন সময়োপযোগী ক্ষেত্রে দলনেতা ব্যবস্থা নেবেন। সন্ধ্যাবেলা এদিন সবাই হৈচৈ আর গান-

বাজনায় মেতে উঠলাম। পরদিন থেকে দলকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ হয়ে এগোতে হবে। সবাই আবার অভিযান শেষে মিলিত হব।

২৭শে মে সকালে প্রথম দলটি বেড়িয়ে পড়ল একনম্বর শিবির স্থাপনের উদ্দেশ্যে। তাদের বিদায় জানিয়ে আমরা মুল-শিবিরে ফিরে এলাম। এরপর বেশ কিছুক্ষণ অঞ্চলটিকে ঘুরে কিছু তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করলাম। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভূ-পৃষ্ঠের বিভিন্ন উচ্চতায় মানবদেহে শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন সংক্রান্ত কিছু মনোবৈজ্ঞানিক প্রশ্নপত্র আমাদের সঙ্গে পাঠিয়েছিলেন। বিভিন্ন কাজের ফাঁকে আমরা সেগুলি নিয়ে বসছিলাম। এরই মাঝে অমূল্যদা আমাকে ক্রমাগত 'ডায়েরী' লেখার তাগাদা দিয়ে যাচ্ছিলেন। এই তাগাদা অভিযানের শেষপর্যন্ত বজায় ছিল। ওদিকে প্রথম দলটি বেশ কিছুটা পথ বিনা বাধায় এগিয়ে গেল। কিন্তু যে জায়গাটা দিয়ে বাঁদিকে যেতে হবে, সেখানে এমন এক পরিস্থিতি হয়ে আছে যার ফলে দলটি থমকে দাঁড়ালো। বিশাল এক পাথরের দেওয়ালে পা-রেখে স্বাভাবিকভাবে যাওয়া অসম্ভব। অবশেষে তার গায়ে পিটনের সাহায্যে দড়ি লাগাতে হল। নিচে অতলস্পর্শী খাদ। কোনরকমে জায়গাটা অতিক্রম করে অভিযাত্রীরা এগোতে লাগল। এই এলাকার আলগা পাথরগুলি ব্লেডের মত ধারালো। চড়াই পথে ওঠার সময় গড়িয়ে এসে দেহের কোন অংশে আঘাত করলে বিপদ। লাকপা এরই মাঝে পাথরের উপর পাথর সাজিয়ে পথের কিছু চিহ্ন রেখে যাচ্ছিল। ক্রমে পাথরের রাজত্ব শেষ করে তারা প্রবেশ করে তুষার রাজত্বে। অভিযানের গতি কিছুটা শ্লথ করে দিল। কারণ জমাটবাধা তুষারের নিচে কোথায় ভয়াল ফাটল (crevasse) লুকিয়ে আছে, তা পরীক্ষা করে না এগোলেই বিপদ। অভিযাত্রীরা প্রবেশ করল শ্বেতবরণ হিমবাহে। সকলের চোখের সামনে ভেসে উঠল সুদর্শনের পূর্ণাবয়ব রূপ। একটি নালা বয়ে চলেছে। সেটি অতিক্রম করে শ্বেতবরণ হিমবাহের উপর ১৭,৫০০ ফুট উঁচুতে স্থাপিত হল একনম্বর শিবির। লাকপা দূরবীণের সাহায্যে চারিদিক লক্ষ্য

করে জানাল জায়গাটার পরিবর্তন ঘটে গেছে। সন্ধ্যে নামতেই তুষারপাত শুরু হল এবং সবাই তাঁবুতে প্রবেশ করল।

মূল শিবিরে গোরা ও বিনয় এসে খবর দিল একনম্বর শিবির স্থাপিত হয়েছে, কিন্তু রাস্তা অত্যন্ত দুর্গম। আমাদের পরবর্তী কার্যসূচী নিয়ে দলনেতার সাথে আলোচনা করছি হঠাৎ প্রচণ্ড ঝড় ও তুষারপাত শুরু হল। ঝড়ের সাথে প্রায় লড়াই করে তাঁবুকে ধরে রাখতে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল যে-কোন মুহূর্তে তাঁবু উড়ে যাবে। ঈশ্বরকে স্মরণ করে প্রায় দেড় ঘণ্টা তুমুল লড়াই করার পর প্রকৃতি শান্ত হল। আমরাও নিশ্চিন্ত মনে রাত কাটালাম।

২৮শে মে সকালে দুজন মালবাহককে দিয়ে কিছু জিনসপত্র একনম্বর শিবিরে পাঠিয়ে দিলাম। অমূল্যদার নির্দেশে আমরা মূল-শিবিরেই রইলাম।

একনম্বর শিবির থেকে সকালে তিনজন সদস্য ও দুজন শেরপা বেড়িয়ে পড়েছে দু-নম্বর শিবিরের জায়গা নির্ধারণের জন্য। তুষারের মধ্যে ওদের পা প্রায় হাঁটু পর্যন্ত ডুবে যাচ্ছিল। ফলে অত্যন্ত কষ্টকর অবস্থার মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হতে হচ্ছিল। প্রায় দু-ঘণ্টা এইভাবে চলার পর ওরা এসে পৌছয় প্রায় সুদর্শনের পায়ের কাছে। এখান থেকে কিছুদূরে একটা বরফের ঢালের কাছেই দু-নম্বর শিবিরের জায়গা নির্ধারণ করে ওরা ফিরে এল একনম্বর শিবিবে।

২৯শে মে একনম্বর শিবির গুটিয়ে অভিযাত্রীরা দু-নম্বর শিবির স্থাপনের জন্য অগ্রসর হয়ে চলেছে। একটিমাত্র তাঁবু একনম্বর শিবিরে পড়ে রইল যোগাযোগকারী দলের জন্য। কোটেশ্বর ও সাইফ নামক দুটি সুন্দর পর্বতশৃঙ্গকে বাঁদিকে রেখে সুদর্শনের ডানদিক দিয়ে তুষারের মরুভূমির উপর দিয়ে অভিযাত্রীদলটি এগিয়ে চলল। প্রত্যেকের কোমরে দড়ি। চলার পথে ছাতু ও আচারের সাহায্যে শরীরের হারানো উদ্যমকে ফিরিয়ে নিয়ে তারা জুতোর তলায় বাঁধা লোহার কাঁটার (Crampon) সাহায্যে শক্ত বরফের উপর দিয়ে ধীর গতিতে অগ্রসর হতে লাগল। চড়াই পথ শেষ করে তাঁরা

পৌঁছাল স্কেটিং করা যায় এমন একটি সমতল ক্ষেত্রে। এখান থেকে বাঁদিকে এগিয়ে গেল। কিন্তু জায়গাটা প্রচণ্ড বিপজ্জনক। অসংখ্য ফাটল ছড়িয়ে আছে। এক একটি ফাটল এঁকে বেঁকে অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। এরমধ্যে যে ফাটলগুলি তুষারে ঢাকা অবস্থায় অদৃশ্য হয়ে আছে, সেগুলি বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি করছিল। এগুলির গভীরতা পরিমাপ করা সম্ভব নয়। হয়তো কয়েকশ' ফুট পর্যন্ত এর তলদেশ বিস্তৃত। অবশেষে সুদর্শন পর্বতের পুবদিকে বরফের ঢল-এর (Ice-fall) মুখে ১৮,০০০ ফুট উঁচুতে দু-নম্বর শিবির স্থাপিত হল। সতপন্থ, মাতৃ, চৌখাম্বা প্রভৃতি বিখ্যাত পর্বতশৃঙ্গগুলি ওদের দৃষ্টির সম্মুখে ফুটে উঠল। শক্ত বরফের মধ্যে গর্ত করে তৈরি হল দু-নম্বর শিবিরের রান্নাঘর।

মূল-শিবিরে মালবাহকদের মারফত দু-নম্বর শিবির স্থাপনের খবর এল। সঙ্গে এল একটি মালপত্রের তালিকা যেগুলি পরদিন পাঠাতে হবে। অমূল্যদা আমাকে ও গোরাকে নির্দেশ দিলেন পরদিন ঐসব জিনিস নিয়ে একনম্বর শিবিরে যেতে।

৩০শে মে কৃষ্ণ, জগদীশ ও দুজন শেরপা বেড়িয়ে পড়ল তৃতীয় অর্থাৎ শৃঙ্গারোহণ শিবির স্থাপনের জায়গা নির্ধারণ করতে। বরফের ঢল (Ice-fall) বেয়ে Crampon-এর সাহায্যে দড়ি লাগাতে লাগাতে প্রচণ্ড খাড়াই উঠতে শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখা কষ্টসাধ্য হয়ে উঠছিল। কারণ শক্ত বরফের উপর Crampon আটকাচ্ছিল না। ফলে তুষার গাঁইতির সাহায্যে সিঁড়ি কেটে পা রাখতে হচ্ছিল। উপর থেকে পাথর পড়ছিল। কৃষ্ণ ও লাকপার মাথায় 'হেলমেট' থাকলেও জগদীশের মাথায় কোন আবরণ ছিল না। সুতরাং মাঝে মাঝেই ওদের থমকে দাঁড়াতে হচ্ছিল। বেলা ১২টা নাগাদ তাঁরা এমন একটা জায়গায় পৌঁছল যেখান থেকে শ্বেতবরণ হিমবাহকে একটা কুমীরের লেজের মত মনে হচ্ছিল। এখানে সুদর্শন শৃঙ্গের নিচের একটা ঝুলন্ত অংশ (overhang) অতিক্রম করতে হবে। মোটামুটিভাবে ঠিক হল এই অঞ্চলেই তিন নম্বর

অর্থাৎ শীর্ষারোহণ শিবির (Summit Camp) স্থাপিত হবে। এবার ঢালুপথে দু-নম্বর শিবিরে ফিরে চলা। দড়ি ধরে ঝুলতে ঝুলতে নামার সময় ওদের শিরদাঁড়া ভেঙ্গে যাওয়ার উপক্রম। কিন্তু মনের জোরের সাথে শরীরের জোর ফিরে আসে। তারা ফিরে এল দু-নম্বর শিবিরে। সেখানে তখন দলের অন্য সদস্যরা মাংসের খিচুড়ি রান্না করে ওদের জন্য অপেক্ষা করছে।

৩১শে মে দু-নম্বর শিবির থেকে কৃষ্ণ জগদীশ শিবু লাকপা ও পলদিন তিননম্বর শিবির স্থাপনের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেল। তপন ও গৌতম দু-নম্বর শিবিরে রইল শীর্ষারোহণ দলটির সাথে যোগাযোগ রাখবার জন্য। পূর্বনির্ধারিত রাস্তা ধরে অভিযাত্রীরা ১৯,০০০ ফুট উঁচুতে তিননম্বর শিবিরে উপস্থিত হল। স্বল্প পরিসর জায়গায় স্থাপিত হয়েছে দুটি তাঁবু। বরফের মধ্যে গর্ত করে স্টোভ জ্বালিয়ে অন্ধকার নামার আগেই খাবার তৈরি করে সকলে তাঁবুতে প্রবেশ করল। এখান থেকেই আগামীকাল শীর্ষারোহণের প্রচেষ্টা চালানো হবে। প্রত্যেকেই প্রচণ্ড উত্তেজনায় বশীভূত। কারও চোখে ঘুম নেই। কেউ গান করছে অথবা আলোচনা করছে আগামীকালের যাত্রা প্রসঙ্গে। লাকপা তার নিজস্ব ভাষায় সকলকে গান গেয়ে শোনাচ্ছে। শিবু 'গীতা'র শ্লোক আবৃত্তি করে চলেছে। আসন্ন প্রভাতের জন্য সকলেই অপেক্ষারত। অন্ধকার কেটে নতুন প্রভাতের আগমনের সাথে সাথেই বহুদিনের স্বপ্নকে চরিতার্থ করতে তারা যাত্রা করবে সুদর্শনের শিখরে।

সারারাত প্রবল উত্তেজনার মধ্যে কাটাবার পর অভিযাত্রীরা একটু ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। চমক ভাঙল লাকপার ডাকে। ভোর হতে তখন বেশ বাকি। লাকপা নির্দেশ দিল ভোর হওয়ার সাথে সাথে সকলকে বেড়িয়ে পড়তে হবে। শরীর থেকে অবসাদ দূর করতে এক কাপ চায়ের দরকার। কিন্তু স্টোভটি আবার বিকল। আমার মনে হয় স্টোভগুলির পাহাড়ের উচ্চতা সহ্য হয় না। তা না হলে ভালো স্টোভগুলি বিকল হয়ে পড়ে কি করে? সকলেই হতাশ

হয়ে পড়ল। কিন্তু পলদিন সহজে হার মানতে প্রস্তুত নয়। শেষ পর্যন্ত তার হাতে পড়ে বিকল স্টোভকে হার মানতে হল।

২রা জুন, ১৯৮৪ আমাদের কাছে একটি উজ্জ্বলতম দিন। পূর্বগগনে লাল আবীর ছড়িয়ে পড়ল। সকাল ৫-২০ মিনিট। পাঁচজন অভিযাত্রা বেড়িয়ে পড়ল। ওরা কি পারবে সফল হতে? বহু অভিযান যেখানে ব্যর্থ হয়েছে। বহু নামী অভিযাত্রীর যাবতীয় পরিকল্পনা যে শৃঙ্গ ব্যর্থ করে দিয়েছে। পারবে কি বাংলার অনভিজ্ঞ তিন তরুণ প্রমাণ করতে, 'তারুন্যের কাছে সকল শক্তি পরাভূত'?

প্রণাম করে তাঁর আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে তারা যাত্রা শুরু করল। প্রকৃতিদেবী প্রথম থেকেই আমাদের দিকে তাঁর আশীর্বাদের সস্নেহ হাতখানি বাড়িয়ে রেখেছিলেন. দেবতাত্মা হিমালয়ের আশীর্বাদে কোন প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি এখন পর্যন্ত হয়নি। অপূর্ব আবহাওয়ার মধ্যে তিনজন এগিয়ে চলেছে' সঙ্গে সদা হাস্যময় লাকপা এবং প্রচণ্ড কর্তব্য সচেতন পলদিন।

দু-ঘণ্টা ধরে নরম তুষারের উপর দিয়ে এগিয়ে চলেছে শৃঙ্গের দিকে। প্রায় ২০,৫০০ ফুট উঁচুতে তাঁরা এমন এক জায়গায় উপস্থিত হল যেখানে পাতলা শ্লেট পাথরে ভর্তি। এইরূপ উচ্চতায় তুষারাবিহীন পাথরের স্তর দেখে সকলেই অবাক হয়ে গেল। পা দিতেই পাথরগুলি ছিটকে নিচের দিকে নামতে লাগল। কিছুটা এগোতেই চোখে পড়ল ডানদিকে একটা বরফের প্রাচীর তাদের পথ অবরোধ করে দাড়িয়ে আছে। পিটন ও দড়ির সাহায্যে জায়গাটা অতিক্রম করতে ওদের বেশ কিছুটা সময় লাগল। এখান থেকে দু-নম্বর শিবিরকে একটা বিন্দুর মত লাগছিল। এবার বাঁদিকে ঘুরে যেতেই নিচের সবকিছু আড়ালে চলে গেল। সামনেই একটি ঝুলন্ত দেয়াল। সকলেই তখন প্রচণ্ড ক্লান্ত। লাকপা জানাল আর একটু যেতে পারলেই স্বপ্ন সফল হবে। অবসাদ কাটিয়ে ঝুলন্ত দেওয়ালে দড়ি লাগানো শুরু হল। প্রায় ঝুলতে ঝুলতে তাঁরা উঠে এল সেই দেওয়ালের মাথায়। চোখের সামনে কয়েক গজের দূরত্বে গত চার বছরের স্বপ্ন, লক্ষ্যপথের

পরিসমাপ্তি সুদর্শন শিখর। পাউডারের মত গুঁড়ো বরফে সকলের কোমর পর্যন্ত ডুবে যাচ্ছে। কয়েক পা এগোলেই তাঁরা পৌঁছে যাবে মূল লক্ষ্যে। প্রথমে জগদীশ আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল। পা-রাখল সুদর্শনের চূড়ায়। একে একে কৃষ্ণ শিবু লাগপা ও পলদিন। উত্তেজনায় প্রত্যেকে শিহরিত হচ্ছিল। হঠাৎ লাকপা সবাইকে সাবধান করে দিয়ে এগিয়ে শিখরের মাঝামাঝি জায়গায় তুষারগাইতি দিয়ে সজোরে আঘাত করল। আলিবাবার চিচিং ফাঁকের মত শিখরের মাঝখানের বরফ ধসে গিয়ে সৃষ্টি হল বিশাল এক গহ্বরের। বাকি সকলে বিস্ময়ের সাথে তাকিয়ে রইল সেদিকে। ১৯৮০ সালের সফল অভিযাত্রী দলের অন্যতম শৃঙ্গারোহণকারী লাকপার জানা ছিল সুদর্শন শৃঙ্গের এই গোপন গহ্বরের কথা। কেউ যেন তখনও বিশ্বাস করতে পারছে না তাঁরা দাঁড়িয়ে আছে সুদর্শন শিখরে। গাড়োয়াল হিমালয়ের সব শৃঙ্গগুলিকেই তাঁরা দেখতে পাচ্ছিল। অমূল্যদার নির্দেশ ছিল শৃঙ্গারোহণের সঙ্গে সঙ্গেই ছবি তুলতে শুরু করার। পরে ছবি তোলার অবসর থাকে না। কারণ দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন অমূল্য সেন জানতেন যে-কোন শৃঙ্গারোহণের কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই অঞ্চল ঘন মেঘে ঢেকে যায়। কিন্তু অবর্ণনীয় পরিস্থিতিতে ছবি তোলার কথা সকলে ভুলে গেছে। একে অপরকে আলিঙ্গনের মাধ্যমে মনের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করছে। তাদের মুখে এককথা "আমরা পেরেছি"।

সম্বিত ফেরে লাকপার কথায়! লাকপা তাড়া দেয় তাড়াতাড়ি ছবি তোলার জন্য। কৃষ্ণ চটপট কয়েকটা ছবি তুলে যখন তাঁর ক্যামেরায় নতুন ফিল্ম লাগাচ্ছে, অবাক হয়ে সকলে দেখলে সুদর্শন শিখরের চারিপাশ ঘন মেঘে ঢেকে যাচ্ছে। চোখের সামনে সবকিছু অস্পষ্ট হয়ে আসছে। সকলেই এক নতুন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হল। কিছুক্ষণ আগেও আকাশে কোন মেঘ ছিল না। নির্মল স্নিগ্ধ আকাশে এত মেঘ এল কোথা হতে? কৃষ্ণ একটু আলোর জন্য বার বার ঈশ্বরকে ডাকতে লাগল। কিন্তু মেঘের পর্দা সরল না। অভিযাত্রীরা সঙ্গের বিস্কুট ও চকোলেট দিয়ে সর্বশক্তিমান সুদর্শনের উদ্দেশ্যে

নিবেদন করল অন্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলি। জ্বালানো হ'ল ধূপ কাঠি ও মোমবাতি। উত্তোলিত হল জাতীয় পতাকা ও ক্লাব পতাকা। শিবু আবৃত্তি করল গীতার পুণ্যশ্লোক। প্রাণ ভরে কিছুক্ষণ বিচরণ করল সল্প-পরিসর জায়গায়। প্রায় পয়তাল্লিশ মিনিট শৃঙ্গে অবস্থানের পর শুরু হল অবরোহণ।

মূল-শিবির। বিকেল তিনটে বেজে দশ। আমাদের প্রতীক্ষার অবসান হল। বাহাদুর তাঁবুতে ঢুকল। তার হাতে নেতার চিঠি। রুদ্ধশ্বাসে পড়তে শুরু করি—

"Comrades,

VICTORY !

Your tremendous labour for two years is victorious. Five members of our team crawled on to the top of Sudarshana today at 1215 Hrs. We saw them coming down at 13·00 Hrs. Don't get excited........

Sailesh and all porters will come to Camp I with empty sacks tomorrow. Joy and Ranju will stay at the Base.

Thanks for the delicious 'khichuri' you have sent today. But Gora is doing too much 'খাই খাই'। I am afraid, if, any 'khichuri' will be left for me when I finish this letter... ...."

॥ পনেরো ॥

চা ও রুটি খেয়ে রসিদ ব্রাদার্স ওপরে রওনা হয়ে গেল! ওরা এক নম্বর শিবিরে গিয়ে দেখবে কোন চিঠি আছে কিনা? না থাকলে দু নম্বর শিবিরের পথে এগিয়ে যাবে। বেলা দুটো পর্যন্ত এগোবে। তারপরে ফিরে আসবে। আশা করি তার মধ্যে কারও সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। তবে বিকেল ছটার আগে ফিরে আসতে পারবে বলে মনে হচ্ছে না। তার মানে আমাদের সারাদিন ওদের পথ চেয়ে বসে থাকতে হবে।

আজ সকালেও ব্রহ্মাজীর মুখ দেখতে পেলাম না। আকাশ পরিষ্কার কিন্তু তাঁর মাথায় মেঘের আবরণ।

ব্রহ্মাজীর মুখ দেখতে না পেলেও ফ্ল্যাট-টপ্ আর তার প্রতিবেশীদের পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। তাদের সারা গায়ে বামধনুর খেলা চলেছে। ভারী ভাল লাগছে। তাই বার বার চেয়ে চেয়ে দেখি। সত্যই তুষারমৌলী হিমালয় অতুলনীয়।

রোদ এলো অসিত কাননে। এখন পৌনে আটটা। গোরা রঞ্জু ও জয় জলখাবারের আয়োজন করছে। অমূল্য আর টুলটুল রোদে বসে আছে। তপন এখনও স্লীপিং ব্যাগ ছাড়ে নি, তাঁবুতে শুয়ে আছে। ওর মন ভাল নয়। একজোড়া ক্যাম্পনের জন্য একজন ট্রেন্ড মাউন্টেনীয়ার মূল-শিবিরে বন্দী জীবন যাপন করছে।

সকালে দুবার চা-বিস্কুট পাওয়া গিয়েছিল। এবারে ব্রেক-ফাস্ট পাওয়া গেল। বাটার অয়েল মাখানো গরম রুটি আর ঘন মুগডাল। এখন সকাল দশটা।

খেতে খেতে নেতা জিজ্ঞেস করে—হেড্-কুক্, আজ লাঞ্চে কি 'মেনু' হবে?

—এই না হলে 'লেম্ লীডার'! ব্রেক্-ফাস্ট্ শেষ হবার আগেই লাঞ্চের খোঁজ নিচ্ছেন! গোরা নেতাকে একহাত নেয়।

নেতা তার মন্তব্যে বিচলিত না হয়ে পাল্টা চাল দেয়—খোঁজ না নিলে চলবে কেমন করে ? লীডারের 'এ্যাপ্রুভ্যাল' ছাড়া তো হেড্-কুক্ মেন্নু ঠিক করতে পারে না।

—না, লীডারের এ্যাপ্রুভ্যালের দরকার পড়বে না। ক্যাম্পে কি খাওয়া হবে, তা ঠিক করবে ম্যানেজার ও মেডিক্যাল অফিসার। তাই এ ব্যাপারে আমি লীডারকে জবাব দিতে বাধ্য নই।

নেতা একটু বিপাকে পড়ে যায়। সব ব্যাপারে তার নাক গলানো নিঃসন্দেহে অগণতান্ত্রিক। তাই অপেক্ষাকৃত কোমল কণ্ঠে বলে—না, মানে আমি ঠিক জবাব চাইছি না। একটু জানতে চাইছি আর কি ?

—তাই বলুন। গোরা নিজের বিজয়ে পুলকিত। সে বলে—আজ লাঞ্চে, ভাত ডাল আলুসিদ্ধ ও শাক—আলু দিয়ে মুলোশাক।

—গুড্, ভেরী গুড্! অমূল্য বলে—মাছ মাংস ও ডিমে অরুচি ধরে গেল। ডাল ভাল লাগছে, শাক-সবজি আরও ভাল।

—তাহলে বলুন, আপনার অনুমতি না নিয়েও আমরা ভাল মেন্নু ঠিক করতে পারি।

—নিশ্চয়ই। অমূল্য গোরার সঙ্গে সন্ধি করে।

এদিকে শুরু হয়েছে আকাশ জুড়ে মেঘের খেলা। খেলার নেশায় মাঝে মাঝে মেঘদল ব্রহ্মাজীকে ছেড়ে পালাচ্ছে। সেই ফাঁকে আমরা তাঁর মুখখানি দেখে নিচ্ছি।

অমূল্য বলে—এই মেঘ দেখে ভয় পেয়ো না। এগুলো Winter mist. এ মেঘের জন্য ওপরে ওদের কোন অসুবিধে হচ্ছে না।

না হলেই ভাল। আজ ২৩শে সেপ্টেম্বর। আজকের মধ্যে ওদের তিন নম্বর শিবির প্রতিষ্ঠা করতেই হবে।

কিন্তু ওদের কথা পরে হবে। আগে মেঘের কথা বলে নিই। শুধু মেঘ নয়, মাঝে মাঝে বৃষ্টি হচ্ছে। রোদ আর বৃষ্টির খেলা চলেছে অসিত কাননে। তারই মধ্যে আমরা একসময় দুপুরের খাওয়া শেষ করেছি।

খাবার পরে কিন্তু যন্ত্রণাটা যেন বেশি বেড়ে গেল। কারণ আগেই বলেছি, এখন এখানে আমাদের রান্না-খাওয়া ছাড়া আর কোন কাজ নেই। খাওয়ার কাজ যখন চুকে গেল, তখন যে শুধুই সংবাদের প্রতীক্ষা। অথচ রসিদদের ফিরে আসতে এখনও অনেক দেরি।

বেলা দেড়টা নাগাদ সহসা মানুষের কণ্ঠস্বর ভেসে আসে। আমরা উত্তেজিত হয়ে উঠি। ঝির ঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। তারই মধ্যে বেরিয়ে আসি বাইরে। হিমবাহের দিকে তাকাই। না, কাউকে দেখতে পাচ্ছি না তো! তাহলে শব্দটা আসছে কোথা থেকে পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছি মানুষের কণ্ঠস্বর। কেউ কাউকে ডাকছে। মাঝে মাঝে শিষ দিচ্ছে।

অমূল্য সিটি দেয়, আমরা চিৎকার করি।

হ্যাঁ, সাড়া পাই। নিশ্চয়ই কোন মানুষ এসেছে ব্রহ্মালোকে। কিন্তু কোথায়?

—ঐ তো! টুলটুল বলে

—হ্যাঁ, সে ঠিকই দেখেছে। একটা ছায়ামূর্তি চলেছে কালো পাহাড়টার গা দিয়ে ব্রহ্মা পর্বতের দিকে। এখান থেকে তাকে প্রায় লিলিপুটের মতো মনে হচ্ছে। কিন্তু সে কে? কেনই বা এই আবহাওয়ায় ওপরে চলেছে?

আমরা আবার চিৎকার করে উঠি। সে সাড়া দেয়, হাত নাড়ে। আমরা হাত নাড়ি। তাকে কাছে ডাকি।

আসে। কিছুক্ষণ বাদে সে নেমে আসে পাহাড় থেকে। জনৈক প্রৌঢ় গুর্জর। সে সেলাম করে বলে, তার একটা গরু হারিয়ে গেছে। তাই ছেলেকে নিয়ে সে গরু খুঁজতে বেরিয়েছে।

—ছেলে কোথায়? অমূল্য জিজ্ঞেস করে।

—আজ্ঞে জনাব, সে এগিয়ে গেছে। তাই তাকে ডাকছিলাম।

অমূল্য গোরাকে বলে—ডাল-ভাত বেশি হবে?

—রসিদদের খাবার রেখে খানিকটা দেওয়া যেতে পারে।

—তাহলে ওকে একটু খেতে দাও। বোধহয় সারাদিন খাওয়া

হয় নি।

আমাদের সঙ্গে কথা বললেও মানুষটা কিন্তু সামনে কালো পাহাড়টার দিকে তাকিয়ে আছে। এক মুহূর্তের জন্য সে দৃষ্টি ফেরায় নি আমাদের দিকে!

রঞ্জু কিচেনে গিয়ে একখানি থালায় খানিকটা ডাল-ভাত ও সবজি নিয়ে আসে, লোকটির হাতে দেয়।

দু-হাত দিয়ে থালাখানি ধরে সে সেলাম করে তারপর সেখানি পাথরের আড়ালে রেখে বলে—জনাব! একটু পরে খাবো। এখন খেতে বসলে ওপর দিকে নজর রাখতে পারব না। আমার বেটা ওপরে গেছে গরু খুঁজতে। আপনারা তাঁবুতে চলে যান, বৃষ্টি পড়ছে।

সে তেমনি ওপরদিকে তাকিয়ে থাকে। কি দেখছে? আমরা তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।

যাক গে, অযথা জলে দাঁড়িয়ে থাকার মানে হয় না। তঁবুতে চলে আসি। ভাবি—আশ্চর্য ব্যাপার! মানুষটার খিদে পেয়েছে। সামনে খাবারের থালা, তবু খাচ্ছে না।

আমরা তাঁবুর দরজা দিয়ে তাকে দেখছি, সে কিন্তু একবারও আমাদের দিকে তাকাচ্ছে না। এক দৃষ্টিতে ওপর দিকে তাকিয়ে আছে।

বৃষ্টি বন্ধ হল। সামান্যই জল পড়ছিল। কিন্তু বেশ ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। লোকটার খাবার আরও ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কাকে এসব বলা? সে জবাব দেয়—খাবো জনাব! ভুখ লেগেছে। আপনাদের বহুত মেহেরবাণী। খাবো, নিশ্চয়ই খাবো।

প্রায় ঘণ্টাখানেক বাদে লোকটি হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো। আনন্দে চিৎকার করে উঠল। কেবলি যেন কার নাম ধরে ডাকতে থাকল। সেই আকুল আহ্বান ব্রহ্মলোকের পাহাড়ে প্রতিহত হয়ে বার বার প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

ওপর থেকে কেউ সাড়া দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে লোকটি আনন্দে

নাচতে শুরু করে দেয়। বলে ওঠে—জনাব, মিল্ গিয়া, গাই মিল্ গ্যায়ী, বেটা মিল গিয়া।

কি বলছে লোকটা! কিছুই বুঝতে পারছি না। তাহলেও আমরা কোন প্রশ্ন করি না। চুপ করে থাকি।

মিনিট বিশেক বাদে একটি কিশোর এসে উপস্থিত হল। পুত্রের আগমনে পুলকিত পিতা তাকে থালাখানি দেখিয়ে কি যেন বলল। তুজনে পাশাপাশি বসে ভাত-ডাল খেতে শুরু করল। গোরা তাড়াতাড়ি তাঁবু থেকে বেরিয়ে গিয়ে আরও খানিকটা ডাল-ভাত এনে দিল।

সকৃতজ্ঞ চিত্তে ওরা তাও খেয়ে নিল। তারপরে থালা ধুয়ে জল খেল। বাপ বলল—ব্রহ্মাজী আপনাদের কৃপা করবেন।

পুত্র বলল—খুবই খিদে পেয়েছিল।

—কিন্তু আমরা তো তোমাদের পেটভরা খাবার দিতে পারলাম না। নেতা আফসোস করে।

—না, সাব্ আমাদের পেট ভরে গেছে। ছেলে তার পেটে হাত বুলায়।

বাপ বলে—আপনাদের বহৎ মেহেরবাণী। এবারে আমাদের বিদায় দিন, আমরা গরুটা নিয়ে নিচে চলে যাই।

—গরু পেয়েছ? রঞ্জু জিজ্ঞেস করে।

—জী! আমার বেটা সেটাকে ওপরে বেঁধে রেখে এসেছে।

বাপ ও ছেলে সেলাম জানায়। তারপরে জোরে জোরে পা চালিয়ে কালো পাহাড়টার দিকে চলে যায়।

আমি ভাবি—এরা গুর্জর, আধুনিক সভ্য সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক নেই এদের। তবু অভুক্ত পিতা নিজের খাবার ছেলেকে খাওয়াতে পেরে কি অপার তৃপ্তি লাভ করে গেল? বাৎসল্য জগতের যাবতীয় প্রাণীর প্রিয়তম রস।

সাড়ে তিনটে নাগাদ আমাদের প্রতীক্ষার অবসান হল। রসিদ ব্রাদার্স ফিরে এলো। তারা গৌতমের চিঠি নিয়ে এসেছে, একুশ ও বাইশ তারিখের খবর। গৌতম লিখেছে—

‘প্রিয় লীডার, দু নম্বর শিবির (১৮,৫০০´)

২২. ৯. ৮৬

গতকাল সকালে আমরা খুব তাড়াতাড়ি এক নম্বর শিবির গুটিয়ে সব মালপত্র গুছিয়ে নিলাম। ঝট্‌পট্‌ জলখাবার খেয়ে শেরপাদের নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। তোমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করার জন্য এক নম্বরে মাত্র একটা টু-মেন টেণ্ট্ রেখে এসেছি।

এক নম্বর থেকে দু নম্বরে আসার পথে খানিকটা এগিয়েই একটা খাড়া পাথরের দেওয়াল পার হতে হয়। আমরা সেখানে ফিক্সড রোপ করে রেখেছিলাম। সেই দড়ি ধরে দেওয়াল বেয়ে ওপরে উঠতে শুরু করি, মাঝে মাঝে পেছন ফিরে এক নম্বর শিবিরের তাঁবুটিকে দেখি। ছোট তাঁবুটা ক্রমে ক্রমে ছোট হতে হতে একসময় পাথরের মাঝে মিশে গেল।

খাড়া দেওয়ালটা পার হয়ে আসার একটু পরেই পাথরের পৃথিবী ফুরিয়ে গেল, শুরু হল বরফের জগৎ। আমরা ব্রহ্মা হিমাবাহে প্রবেশ করলাম। কোমরে দড়ি বেঁধে নিলাম। শক্ত বরফের ওপরে ধাপ কাটতে কাটতে সবার আগে পল্‌দিন এগিয়ে চলেছে। আমরা সারি বেঁধে সেই ধাপ পেরিয়ে চলেছি। খুবই শক্ত বরফ। পল্‌দিনকে প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হচ্ছে। অথচ জায়গাটা এত খাড়া যে ধাপ না কেটে ওপরে ওঠা অসম্ভব।

এগিয়ে চলার ফাঁকে ফাঁকে চারিদিকে চেয়ে ব্রহ্মা হিমবাহকে ভাল করে দেখে নিচ্ছিলাম। কি বলব, সুন্দর? হ্যাঁ, সুন্দর বৈকি! তবে সেই সঙ্গে ভয়ঙ্কর।

কেবল ব্রহ্মা হিমবাহ নয়। পেছনে তাকালে নিচের দিকে দেখা যাচ্ছিল ধূসর অসিত কানন, রুপোলী কিবার আর সবুজ দোবাতি। ভারী ভাল লাগছিল।

প্রায় ঘণ্টাদুয়েক পায়ে পায়ে এগিয়ে আসার পরে আবার হারিয়ে যাওয়া ব্রহ্মাজীকে খুঁজে পেলাম। তাঁকে দেখতে পেয়ে ভারী আনন্দ হল।

কাল কিন্তু এখানে আবহাওয়া বেশ ভাল ছিল। সকাল থেকেই ঝক্‌ঝকে রোদ। সোনালী আলোয় ব্রহ্মলোক ও ব্রহ্মাজীর যে অপরূপ রূপ দর্শন করলাম, তা অতুলনীয়। আমরা সেই স্বর্গীয় সৌন্দর্যে মোহিত হলাম। এ রূপ নিচের থেকে দেখা যায় না।

ব্রহ্মা-১ পর্বতের দক্ষিণ-পূর্ব গাত্রে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাঁকে দেখছিলাম। মনে হচ্ছিল আমরা যেন প্রজাপতি-ব্রহ্মার চরণতলে বিচরণ করছি। তিনি সাদা মুকুট পরে সিংহাসনে সমাসীন রয়েছেন। ইসারায় আমাদের কাছে ডাকছেন। কাছে আরও কাছে, তাঁর বুকের মাঝে।

এখন আমার মনে হচ্ছে তিনি শুধু সুন্দর আর সুবিরাট নন, তিনি পরম স্নেহপরায়ণ। তিনি শুধু বিশ্বচরাচরের স্রষ্টা নন, তিনি ধারক বাহক এবং পালকও বটে।

তিনি আমাদের সস্নেহে কাছে ডাকছেন। আমরা নিশ্চয়ই তাঁর কাছে যেতে পারব, তাঁর শিখরপূজা সমাধা করতে পারব। তাই আনন্দ আর উচ্ছ্বাসে বুক আমাদের ভরে উঠেছে।

ক্লান্তি বিস্মৃত হয়ে জোর কদমে এগিয়ে চলি। আর চলতে চলতে মনে হয় তিনি আমাদের থেকে খুব বেশি দূরে নন। মাত্র কয়েকঘণ্টা এভাবে চলতে পারলেই আমরা শিখরে পৌঁছে যাবো।

কিন্তু পল্‌দিন হঠাৎ চলা বন্ধ করল। আমরা যেন হোচট খেলাম। অবাক চোখে ওর দিকে তাকাই। সে বল্লে—আর এগিয়ে গেলে তাঁবু টাঙ্গাবার জায়গা নাও পেতে পারি। বেলা পড়ে এসেছে। এখানেই তাঁবু ফেলা যাক। তাছাড়া সেদিন দু নম্বরের জন্য যে জায়গা দেখে গিয়েছিলাম, আজ তো সেখান থেকে অনেকটা এগিয়ে এসেছি।

জায়গাটা ব্রহ্ম-১ শিখরের দক্ষিণ-পূর্ব পর্বতগাত্রের তুষারক্ষেত্র। খুব একটা সমতল নয়। তার ওপর গতকাল নতুন তুষার পড়েছে। ফলে হাঁটু পর্যন্ত তলিয়ে যাচ্ছে। তাই ওপরের নরম তুষার সরিয়ে নিচের শক্ত বরফ কেটে সমতল করার চেষ্টা শুরু হল। কঠিন বরফ।

কাটতে খুবই কষ্ট হচ্ছে। অভুক্ত দেহ, হিমেল হাওয়ার দাপাদাপি, প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হচ্ছে।

তাহলেও একসময় জায়গাটা মোটামুটি তুষারমুক্ত ও প্রায় সমতলে পরিণত হল। আমরা একটা ফোর-মেন ও একটা টু-মেন টেণ্ট্ টাঙ্গিয়ে ফেললাম। কিন্তু এখন সন্ধ্যে হতে আর দেরি নেই।

শিবু ও জগদীশ আমাদের কোন সাহায্য করে নি। কিন্তু বরফে গর্ত করে রান্নাঘর তৈরি করে ফেলেছে। কেবল ঘর নয়, সেই সঙ্গে ওদের রান্নাও হয়ে গেছে।

খেয়ে নিয়ে তাঁবুতে এসে বসি। আগামীকালের কর্মসূচী নিয়ে আলোচনা শুরু করি।

আলোচনা পরে সাব্যস্ত হয়, বিশ হাজার ফুটের কাছাকাছি উচ্চতায় আরেকটা শিবির স্থাপন না করতে পারলে একদিনে শিখরারোহণ করে ফিরে আসা সম্ভব নয়। এই শিবির থেকে শিখরারোহণ করলে ফেরার পথে ক্রিস বনিংটনের মতো 'বিভোক' (bivaouac) অর্থাৎ বরফের ওপরে আকাশতলে রাত্রিবাস করতে হবে। কিন্তু আমরা তো ওঁদের মতো 'survival bag' আর 'bivvy sack' নিয়ে আসি নি। সুতরাং ব্রহ্মা পর্বতের পূর্ব-শিখরশিরার ওপরে আরেকটি শিবির করতেই হবে এবং সেই শিখর-শিবির প্রতিষ্ঠার ওপরেই অভিযানের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।

আবহাওয়া ভাল পেলে অবশ্য তিন নম্বর শিবিরে একরাতের বেশি বাস করার দরকার পড়বে না। শেষরাতে সেখান থেকে বেরিয়ে শিখরপূজা সাঙ্গ করে আমরা সোজা দু নম্বরে নেমে আসতে পারব।

এখন পর্যন্ত বাইনোকুলার দিয়ে যতটা দেখতে পেয়েছি, তাতে মনে হচ্ছে, আমরা যেখানে তিন নম্বর শিবির করতে চাইছি, সেখান থেকে একটা সহজ ঢাল বেয়ে উঠে গেলেই শিখরে পৌছন যাবে। ওখানে কোন বড় রকমের বাধা আছে বলে মনে হচ্ছে না। তবে তিন নম্বরের জায়গায় পৌছন মোটেই সহজ হবে না। কারণ পথে প্রচুর তুষার গহ্বর ও ফাটল রয়েছে বলে মনে হচ্ছে। তাছাড়াও খানিকটা

জায়গা জুড়ে সিঁড়ির মতো ধাপ দেখতে পাচ্ছি। সেগুলো যে কি, তা এখান থেকে বুঝতে পারছি না। আরেকটা কথা, খালি চোখে শিখর যত কাছেই মনে হোক, প্রকৃত দূরত্ব কিন্তু এখান থেকে অনেকখানি।

যাই হোক, আমরা ঠিক করেছি আগামীকাল সকালেই বেরিয়ে পড়ব। বাকি ফিক্‌সড রোপ ও অন্যান্য সব সাজ-সরঞ্জাম সঙ্গে নেব। মানুষের অসাধ্য না হলে আমরা তিন নম্বর শিবির প্রতিষ্ঠা করবই।

আমরা সবাই সুস্থ, আনন্দে আছি। আমাদের জন্য দুশ্চিন্তা ক'রো না।......'

ওরা দুশ্চিন্তা না করতে বললেই তো আমরা নিশ্চিন্ত হতে পারি না। সত্যি বলতে কি গতকাল সারাদিনই ওদের জন্য চিন্তা করেছি। অথচ গতকাল কাউকে ওপরে পাঠাই নি। পাঠিয়ে কোন লাভ হত না। গতকাল এক নম্বর শিবির খালি ছিল। আজ সকালে রসিদরা ওপরে গেছে। আশা করছি ওরা আজ ভাল খবর নিয়ে আসবে।

এদিকে কাল থেকে আবহাওয়া আরও খারাপ হয়েছে। কাল দিনে ও রাতে প্রচুর বৃষ্টি হয়েছে। সেপ্টেম্বরের শেষ, কিন্তু বৃষ্টির বিরাম নেই। মেট বলেছে এখানে আবহাওয়া সবচেয়ে ভাল থাকে জুলাই মাসে। তার মানে আমাদের দু-মাস আগে আসা উচিত ছিল।

আজও আকাশ মেঘে ঢাকা। সকাল থেকে যেমন সূর্যের মুখ দর্শন করি নি, তেমনি এখন পর্যন্ত ব্রহ্মাজীকেও দেখতে পাই নি। গৌতমরা কি দেখতে পাচ্ছে ?

আমাদের তাঁবুটার অবস্থা খুবই শোচনীয়। রঞ্জুর সারানো জায়গাগুলো দিয়ে পর্যন্ত জল পড়ছে। জিনিসপত্র সবই ভিজে গিয়েছে সাড়ে তেরো হাজার ফুট উঁচুতে এমন স্যাঁতস্যাঁতে শিবিরে হাঁটু মুড়ে বসে থাকা......

কিন্তু কি করব ? আমরা যে পর্বতারোহণে এসেছি। দুঃখ কষ্ট

ভয়, তিন থাকতে হিমালয় নয়।

বেলা তিনটে নাগাদ আবার মুষলধারায় বৃষ্টি নামল। তাঁবুর ভেতরে সমানে জল পড়ছে। আমরা যে যার স্লীপিং ব্যাগ কোলে নিয়ে ঠিক মাঝখানে প্রায় জড়াজড়ি করে বসে আছি। এখানটায় জল পড়ে না। একটা জিনিস কিছুতেই বুঝতে পারছি না, বরফ পড়ছে না কেন? কেবলি বৃষ্টি হচ্ছে। এর চেয়ে যে তুষারপাত অনেক ভাল ছিল।

ওরা অবশ্য লিখেছে ওপরে বরফ পড়ছে। আচ্ছা, আজও পড়ছে কি? নিশ্চয়ই পড়ছে। কিন্তু ওদের যে আজ চূড়ান্ত সংগ্রামে অবতীর্ণ হবার কথা। পেরেছে কি? ওরা কি আজ শেষরাতে শিখরাভিযানে বেরুতে পেরেছে? তার চাইতেও বড় কথা, ওরা কি তিন নম্বর শিবির প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে?

আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে যে ওপরের আবহাওয়া এত খারাপ নয়! ওরা সেখানে এগিয়ে যেতে পারছে। আর তাই এখন এমন মুষলধারায় বৃষ্টি নামল।

নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে জানি, শিখরারোহণের পরেই শিখরে মেঘ ছুটে আসে, আবহাওয়া খারাপ হয়ে যায়। এই বৃষ্টি হয় তো আমাদের সাফল্যের অবদান। দুঃখ-কষ্ট বিস্মৃত হয়ে আনন্দিত হয়ে উঠি।

পাঁচটা নাগাদ বৃষ্টি বন্ধ হল। আজ দুপুর থেকেই রঞ্জু বাইনোকুলারটার দখল নিয়েছে। বৃষ্টির জন্য এতক্ষণ সামান্য দূর পর্যন্তই দেখা যাচ্ছিল। এবারে আমাদের সঙ্গে বেরিয়ে এল বাইরে, বাইনোকুলার চোখে লাগিয়ে হিমবাহের দিকে তাকিয়ে রইল। আর আমরা তাকিয়ে রইলাম ওর দিকে।

কেটে যায় কিছুক্ষণ। তারপরে হঠাৎ রঞ্জু বলে ওঠে—আসছে।

—আসছে! আনন্দিত হয়ে উঠি। তার কাছে এগিয়ে আসি।

রঞ্জু মাথা নাড়ে কিন্তু কোন কথা বলে না। আমরা ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি। একটু বাদে বলে ওঠে—দুজন নয়, চারজন।

—চারজন! আমরা বিস্মিত।

—হ্যাঁ। কিন্তু কাউকেই চিনতে পারছি না।

—দেখি দেখি, আমাকে দে তো! জয় রঞ্জুর হাত থেকে বাইনোকুলারটা কেড়ে নিয়ে নিজের চোখে লাগায়। গোরা আর টুলটুল গিয়ে ওর পাশে দাঁড়ায়।

একটু বাদে জয় বলে—রঞ্জু ঠিকই বলেছে লীডার! দুজন নয়, চারজন।

—চিনতে পারছ? অমূল্য জিজ্ঞেস করে।

—হ্যাঁ, পারছি······

—কে কে?

—রাম সিং······পেয়ার সিং আব রসিদ ব্রাদার্স।

—দেখি, আমাকে দে তো! গোরা জয়ের হাত থেকে দূরবীণটা নিয়ে নেয়। একটু বাদে বলে—হ্যাঁ, জয় ঠিকই বলেছে লীডার, ল্যাপ্ আর হ্যাপ্-রাই আসছে। মনে হচ্ছে ওদের রুক্স্যাক্গুলো খুবই ভারী।

—তাই তো হবে। নেতা বলে—তাব মানে পেরেছি, আমরা পেরেছি। ক্লাইম্বিং নিউজের সঙ্গে গৌতম যতটা সম্ভব মাল দিয়ে ওদেব নিচে পাঠিয়ে দিয়েছে।

আনন্দ! আনন্দ আর উত্তেজনায় অস্থির হয়ে উঠি। মুখ তুলে ওপরে তাকাই। না, তিনি এখনও মেঘের ঘোমটায় মুখ ঢেকে আছেন। মনুষ্য-পদলাঞ্ছিত হবার পরে সমস্ত শিখব তাই করে। কিন্তু পিতামহের যে এমন আচরণ কবা ঠিক নয়। আমরা তো তাঁকে জয় করতে আসি নি, এসেছি তাঁর শিখর পূজা করতে। তিনি আমাদেব পুজো নিয়েছেন, আমরা ধন্য হয়েছি। তাই বলি—হে জগৎস্রষ্টা চতুরানন, তুমি দেখা দাও! আমরা তোমাকে দর্শন করে ধন্য হই।

এখন খালি চোখে দেখা যাচ্ছে ওদের। ঐ তো, ওরা সারি বেঁধে নেমে আসছে। চিৎকার করি, হাত নাড়ি, ওদের স্বাগত জানাই।

ওরা হাত নাড়ে, কিন্তু সাড়া দেয় না। বোধ করি ক্লান্ত হয়ে

পড়েছে। রাম ও পেয়ার সোজা দুনম্বর থেকে খবর নিয়ে আসছে। আর রসিদরা সকালে এখান থেকে এক নম্বরে গিয়ে আবার ফিরে এসেছে। তার ওপরে পিঠে ভারী রুক্স্যাক্। ক্লান্ত হয়ে পড়াই স্বাভাবিক।

কিন্তু ওদের মুখে হাসি নেই কেন? ওরা এমন মাথা নিচু করে হাঁটছে কেন? তাহলে কি···

ওরা আসে। অমূল্য বলে—সাবাস রাম, সাবাস পেয়ার, সাবাস রসিদ! সব আচ্ছা হ্যায়?

—জী! কেবল বড়-রসিদ ক্ষীণকণ্ঠে উত্তর দেয়।

রাম তার ভেজা উইণ্ডপ্রুফের পকেট থেকে একটুকরো কাগজ বের করে নেতার হাতে দেয়। তারপরে পেয়ারের সঙ্গে রসিদদের তাঁবুর দিকে চলে যায়।

অমূল্য কাগজখানি খোলে। কিন্তু না, সে পড়ে না। অভিজ্ঞ পর্বতারোহী বুঝতে পেরেছে, দু-দিন ধরে যে খবরের আশায় আমরা তৃষিত চাতকের মতো বসে আছি, ঐকাগজে সে সংবাদ নেই। তাই নেতা নিঃশব্দে কাগজখানি টুলটুলের হাতে দেয়।

কোন উত্তেজনার বশীভূত না হয়ে টুলটুল জোরে জোরে পড়তে শুরু করে—

Camp II
24. 9. 1986

Dear Leader,

With a heavy heart I am to inform you that we are unable to find out any suitable site for Camp-III. The peak is criss-crossed by hundreds of crevasses. It is impossible on our part to negotiate such huge number of giant crevasses as our fixed-ropes are almost exhausted.

Yesterday we climbed upto 20,000′ to find out any other possible route, but all our efforts were in vain.

Yesterday there was continuous snow-fall throughout the day and night. With great difficulty we could return to Camp-II in late evening.

The weather is bad and is becoming worse. Still Sibu, Krishna and Sherpas have gone up to collect the fixed-ropes.

We have planned to come down to Camp-I today with the entire load. Please send two members with the HAPs and LAPs tomorrow to Camp I. Trying to return to the Base tomorrow. We are all well.

Goutam

॥ ষোলো ॥

শুধু বিষাদ নয়, সেই সঙ্গে অবসাদ। বিষণ্ণ মন নিয়ে হয়তো বা কিছু করা যায় কিন্তু অবসন্ন শরীরে কোন কাজ সম্ভব নয়। সত্যি বলতে কি আজ আর শরীর চলতে চাইছে না।

তাই সকালে ঘুম ভাঙার পরেও চুপচাপ শুয়ে আছি। শুয়ে শুয়ে আকাশ-পাতাল ভাবছি। কত আশা নিয়ে কলকাতা থেকে রওনা হয়েছিলাম। দুটি বছর ধরে ছেলেগুলো কি প্রচণ্ড পরিশ্রমই না করেছে। ভেবেছিল ব্রহ্মা-১ শিখরে প্রথম ভারতের জাতীয় পতাকা প্রোথিত করবে। ওদের সব আশা ফুরিয়ে গিয়েছে। আর সেই সঙ্গে অবসাদ আমাকে গ্রাস করেছে। উঠতে ইচ্ছে করছে না।

কিন্তু আমাদের অভিযান কি ব্যর্থ হয়েছে? না। শিখরারোহণ নয়, প্রচেষ্টাই পর্বতারোহণের প্রথম কথা। আমরা তো চেষ্টা করেছি। প্রকৃতির সব বাধা উপেক্ষা করে আমার ভাইরা বিশ হাজার ফুট পর্যন্ত আরোহণ করেছে। শিখরের মাত্র হাজারখানেক ফুট নিচের থেকে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছে। কারণ ব্রহ্মা তাদের পথ দেন নি।

তাহলে আমার এই অবসাদ কেন? শিখরভিযান পরিত্যক্ত হলেও আমাদের অভিযান শেষ হয় নি। পর্বতাভিযান শেষ হয় অভিযাত্রীরা নিরাপদে ঘরে ফেরার পরে।

তার যে এখনো অনেক বাকী। সাজ-সরঞ্জাম সহ পর্বতারোহী সদস্যরা ওপরে রয়েছে। তাদের নিরাপদে নিয়ে আসতে হবে। মেটকে খবর পাঠিয়ে মালবাহক আনাতে হবে। কিশ্‌তোয়ারে কারফিউ চলেছে। তারই মধ্যে জম্মু যেতে হবে।

অভিজ্ঞ অমূল্য পর্যন্ত কাল কান্নাকাটি করেছে। ভাঙা পায়ের জন্য এবারে সে ওপরে যেতে পারে নি, এ দুঃখ সে কিছুতেই ভুলতে পারছে না।

এ অবস্থায় আমিও যদি অবসাদে ভেঙে পড়ি, তাহলে চলবে কেমন করে? আমি বয়সে সবার বড়। আমাকেই যে সবার আগে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে।

অতএব উঠে পড়ি। শেষরাতে আবার জোর এক পসলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। স্যাঁতস্যাঁতে শিবির। শিবির থেকে বাইরে বেরিয়ে আসি।

ভোর হয়েছে কিন্তু সূর্যের দেখা নেই। মেঘলা আকাশ। মেঘ ব্রহ্মাজীকে ঢেকে রেখেছে, তাঁকে দর্শন করতে পারছি না।

রসিদদের ডেকে তুলি। ওদের চা বানাতে বলি।

চা আসার পরে একে একে সবাই উঠে বসে। কিন্তু কারও মুখে কথা নেই। সবাই নিঃশব্দে হাত বাড়িয়ে চায়ের মগ হাতে নেয়। কৃত্রিম ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলে উঠি—গুড মর্নিং বলে দিন আরম্ভ করতে হয়, তাও কি ভুলে গেলি?

লজ্জা পেয়ে ওরা সবাই একসঙ্গে গুড মর্নিং বলে ওঠে।

অমূল্যকে বলি—হ্যাপ্ ও ল্যাপ্‌দের সঙ্গে দুজন সদস্যকেও গৌতম এক নম্বরে যেতে বলেছে। ছোট-রসিদকে মালবাহক নিয়ে আসার জন্য সকালেই সোন্দার পাঠাতে হবে। তাই দুজনের জায়গায় তিনজন সদস্যকে আজ ওপরে পাঠানো দরকার। আমার মনে হচ্ছে তপন টুলটুল ও গোরার যাওয়াই ভাল।

—না, গোরা এখানে থাকুক। গৌতমরা আজ ফিরে আসছে। আজ একটু ভাল খাবারের ব্যবস্থা করতে হবে। তাই আমি ওপরে যাচ্ছি।

কথাটা মন্দ বলে নি জয়। সত্যই তো, গত এক সপ্তাহ ওরা কোন ভাল খাবার খেতে পায় নি। গোরা এখানে থাকলে ওরা ফিরে এসে একটু ভাল খাবার খেতে পারবে। অতএব জয়ের প্রস্তাব সমর্থন করি।

কিন্তু রঞ্জু আপত্তি করে। বলে—লীডার, আজ আমি ওপরে যাই! জয় তো একদিন গিয়েছে।

কাল থেকে অমূল্যের মুখে হাসি নেই। রঞ্জুর অনুরোধ শুনে সে

হেসে ফেলে। বলে—মেডিক্যাল অফিসার হয়ে তুমি হাই অল্‌টিচ্যুড পোর্টারের কাজ করবে ?

—ইয়েস লীডার !

—অলরাইট, আই এ্যাপ্রুভ।

—থ্যাঙ্ক্‌ ইউ লীডার !

গোরা খিচুরি রান্না করে ফেলল। তাই খেয়ে এবং বাকিটা সঙ্গে নিয়ে টুলটুল শৈলেশ রঞ্জু রাম পেয়ার ও বড়-রসিদ ওপরে চলে গেল। আর ছোট-রসিদ সোন্দার রওনা হল। মেট ও মহেশবাবুকে দুখানি চিঠি দিয়ে দিলাম। মহেশবাবুর চিঠিটা ইংরেজীতে আর মেটের চিঠিটা কিশ্‌তোয়ারী ভাষায় লেখা হল। আমাদের জবানাতে ছোট-রসিদ নিজেই চিঠিটা লিখেছে। অমূল্য শুধু সই করেছে।

বেলা এগারোটা নাগাদ চা ও পরোটা দিয়ে ব্রেকফাস্ট পাওয়া গেল। ব্রহ্মাজী এখনো মেঘের আড়ালে মুখ লুকিয়ে রেখেছেন। স্থানীয়দের বিশ্বাস ব্রহ্মা-১ পরম পবিত্র পর্বতশিখর, স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা। কেউ তাঁর শিখরে আরোহণ করার চেষ্টা করলে তিনি ক্রুদ্ধ হন। আমরা কি তাঁর ক্রোধের শিকার হয়েছি ?

ব্রহ্মাজী মেঘের আড়ালে মুখ ঢেকে রাখলেও দিবাকর দেখা দিয়েছেন। রোদ এসেছে অসিত কাননে। আকাশের সব মেঘ বোধকরি গিয়ে জড়ো হয়েছে ব্রহ্মাজীর মাথায়।

কেবল আমাকে নয়, অবসাদ আজ আমাদের সবাইকে পেয়ে বসেছে। গোরা ও জয়ের মতো উৎসাহী সদস্যরাও শুয়ে বসে সময় কাটাতে চাইছে। অনেক বলা-কওয়ার পরে বেলা দেড়টা নাগাদ ওরা কিচেনে ঢুকল।

শৈলেশরা নিশ্চয়ই এতক্ষণে এক নম্বরে পৌছে গিয়েছে। গৌতমরা হয়তো বেরিয়েও পড়েছে। চিঠিতে তো লিখেছে সবাই ভালো আছে। কি জানি কে কেমন আছে ? সবাইকে সুস্থ শরীরে দেখার আগে দুশ্চিন্তার অবসান হবে না।

আজ আরেক বিপদ হয়েছে। নালায় জল আসে নি। বার

বার পাথর ডিঙিয়ে ওপর থেকে জল নিয়ে আসতে হচ্ছে।

খাবার পরে বৃষ্টি নামল। আমরা এসে তাঁবুতে ঢুকলাম। ওপরে বৃষ্টি হচ্ছে কি? বৃষ্টি না হলে বরফ পড়ছে। তারই মাঝে খাড়া ঢাল বেয়ে কিংবা বড় বড় পাথর ডিঙ্গিয়ে ওদের পথ চলতে হচ্ছে। ঘুরে-ফিরে কেবল ওদের কথাই মনে পড়ছে। চারটে বেজে গেল। ওরা এখনো আসছে না কেন?

পাঁচটায় বৃষ্টি বন্ধ হল। অন্যদিন হলে অমূল্য চায়ের তাগিদ দিত। কিন্তু আজ কিছুই বলছে না। গতকাল গৌতমের চিঠি পাবার পরে সে বড়ই নীরব হয়ে গেছে।

আজ গোরা নিজেই বলে—এবারে চায়ের ব্যবস্থা করা যাক, কি বলুন লীডার? ওদেরও ফিরে আসার সময় হল।

অমূল্য কিছু বলতে পারার আগেই তাঁবুর দরজার কাছে কেউ ডেকে উঠল—বড়দা!

—কে? জয় উঠে দাঁড়ালো।

গৌতম তাঁবুতে ঢুকল। না, গৌতম একা নয়। জগদীশ কৃষ্ণ শিবু পল্‌দিন নিমা……সবাই। ওরা সবাই এসেছে। আমার ভাইরা সবাই সুস্থ শরীরে আমার কাছে ফিরে এসেছে। কি আনন্দ!

কিন্তু কৃষ্ণ শিবু জগদীশ আর গৌতম কান্নায় ভেঙে পড়ে। পল্‌দিন আর নিমার চোখেও জল। আমরাও চোখের জল সামলাতে পারি না।

কাঁদতে কাঁদতেই গৌতম বলে ওঠে—শঙ্কুদা, আমি সবাইকে সুস্থ শরীরে তোমার কাছে ফিরিয়ে এনেছি কিন্তু তোমাদের জন্য ব্রহ্মাজীর জয়মাল্য নিয়ে আসতে পারি নি।

এগিয়ে এসে ওকে বুকে জড়িয়ে ধরি। কিন্তু কোন সান্ত্বনা দিতে পারি না। ওর মতো আমিও কাঁদতে থাকি।

শিবু অমূল্যের পায়ের ওপর আছাড় খেয়ে পড়ে। কেবলি বলতে থাকে—পারলাম না, লীডার আপনার যোগ্য হয়ে উঠতে

পারলাম না।

অমূল্য তাড়াতাড়ি শিবুর মাথাটা কোলে তুলে নেয়।

কৃষ্ণ আর জগদীশ তাঁবুর এক কোণে গিয়ে বসে পড়েছে। হাঁটুতে মুখ লুকিয়ে নিঃশব্দে চোখের জল ফেলছে। হে হিরণ্যগর্ভ পরমপিতা, তুমি এত নিষ্ঠুর! আমরা তো তোমার কোন ক্ষতি করতে চাই নি। চেয়েছিলাম তোমার পুজো দিতে। তুমি আমাদের ফিরিয়ে দিলে। কিন্তু কেন?

চোখ মুছিয়ে গৌতমকে বসিয়ে দিই। বলি—তোরা তো চেষ্টার ত্রুটি করিস নি ভাই! তোরা সবাই সুস্থ শরীরে ফিরে এসেছিস, এর চেয়ে বড় জয়মাল্য পর্বতারোহণে আর কিছু হতে পারে না।

গোরা উঠে দাঁড়ায়। কৃত্রিম হাসি মুখে ফুটিয়ে বলে—আর কাঁদিস নে, একটু বাদে চা-চানাচুর খাওয়াবো।

মুখের হাসি অম্লান রেখেই সে বেরিয়ে যায় তাঁবু থেকে। বোধকরি অভিনয় শেষে নিজের কান্না সামলাতে।

তপন টুলটুল আর রঞ্জু তাঁবুতে আসে। আসে রসিদ রাম ও পেয়ার। কিন্তু কেউ কোন কথা বলে না। সবাই চুপচাপ এখানে-ওখানে বসে পড়ে।

আমি কিন্তু পর্বতারোহীদের দিকেই তাকিয়ে থাকি। তাকিয়ে তাকিয়ে বার বার ওদের দেখি। মুখগুলো সব কালো হয়ে গেছে। নাক আর ঠোঁটগুলো ফেঁটে গিয়েছে। বুঝতে পারছি, গত সাতদিন ধরে প্রকৃতির সঙ্গে কি প্রচণ্ড সংগ্রাম করতে হয়েছে ওদের।

কিন্তু এসব কথা বলে আবার আবহাওয়া খারাপ করে তোলা উচিত হবে না। তাই অন্য কথা বলি। জয়ের দিকে তাকিয়ে বলি—আজ ওরা সবাই সুস্থ শরীরে ফিরে এলো, আর এখন শুধু চানাচুর দিয়ে চা খাওয়াবি?

—আর কি খাবেন বলুন?

—চানাচুরের সঙ্গে পাপর হলে ভাল হয়।

—বেশ, তাই হবে।

রসিদ উঠে দাঁড়ায়। বলে—চানাচুরের টিন আর পাপরের প্যাকেট আমাকে দিন সাব্, আমি নিয়ে যাচ্ছি।

—তুমি এইমাত্র ওপর থেকে এসেছো, তুমি পরিশ্রান্ত। আমি নিয়ে যাচ্ছি।

—না সাব্! আমাকে দিন। রসিদ জয়ের হাত থেকে জিনিসদুটো প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে বেরিয়ে যায় তাঁবু থেকে। জয় তাকে অনুসরণ করে।

চা খেতে খেতে সন্ধ্যা নেমে আসে। ব্রহ্মলোকের বিষণ্ণ সন্ধ্যা। তাহলেও পর্বতারোহীরা যেন ইতিমধ্যে অনেকটা শান্ত হয়েছে।

রসিদ পেট্রোম্যাক্স জ্বালিয়ে নিয়ে আসে। ভালই করেছে। উজ্জ্বল আলো বিষণ্ণ সন্ধ্যার খানিকটা অন্ধকার দূর করে দেবে।

তাঁবুর খুঁটির সঙ্গে আলোটা ঝুলিয়ে দিয়ে রসিদ গোরাকে বলে—সাব্, আপনাদের আর কিচেনে যাবার দরকার নেই, আমি ও রাম রান্না করব। বলুন, কি রান্না হবে?

একটু ভেবে গোরা বলে—তোমরা ডাল আর চাপাতি বানাও। হয়ে গেলে আমাকে ডাক দিও, আমি ডিমের ঝোল রেঁধে নেব।

রসিদ চলে যায়। নীরব কিছুক্ষণ। তারপরে হঠাৎ অমূল্য গৌতমকে জিজ্ঞেস করে—এবারে বলো, শেষপর্যন্ত কি হল?

—তার আগে আমি একটা মজার ঘটনা বলি লীডার! কৃষ্ণ কথা বলে এতক্ষণে।

—বেশ বলো। নেতা অনুমতি দেয়।

কৃষ্ণ বলতে থাকে—গতকাল ফিক্সড-রোপ খুলতে যাবার সময় আমি দূরবীণটা সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম। কাজ করতে করতে মাঝে মাঝে দূরবীণ দিয়ে ব্রহ্মাকে দেখছিলাম। এক জায়গা থেকে দেখলাম শিখরের পথটি পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। আমি ও শিবু তাই বাইনোকুলার দিয়ে সেখান থেকে পথটিকে খুব ভাল করে দেখে নিলাম। তারপরে দূরবীণটা পলদিনের হাতে দিয়ে বললাম—দেখো। পলদিন বাইনোকুলার চোখে লাগিয়ে একবার যেন কি একটু দেখল।

তারপরে সেটা আমার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বলল—লীজিয়ে, আপকো চিজ।

—কাহেকো, দেখনা নহী ? আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করি।

সে হেসে উত্তর দেয়—নহী সাব্, সমে জাদা খতরনাক লাগতা।

—তার মানে বাইনোকুলার দিয়ে দেখলে ফাটল ও গহ্বরগুলো আরও বড় এবং ভয়ঙ্কর দেখা যায়।

শিবু হাসতে হাসতে বলে ওঠে। আমরাও হেসে উঠি।

তাঁবুর আবহাওয়া আরও খানিকটা হালকা হয়েছে। তাই গৌতমকে বলি—এবারে শুরু করে দে !

—করছি। কিন্তু তার আগে একটা কথা বলে নিই। একবার থেমে গৌতম নেতার দিকে তাকায়। তারপরে আবার বলে—কাল ছুজন হ্যাপ্ ও একজন ল্যাপ্‌কে কারও সঙ্গে এক নম্বরে পাঠাতে হবে। আমরা আজ সব মাল নিয়ে আসতে পারি নি।

—বেশ তো, পাঠিয়ে দিও। নেতা বলে।

এবারে গৌতম শুরু করে—

—পরশু সবাই শেষরাতে ঘুম থেকে উঠে পড়েছি। তখুনি মনে হয়েছে, আজকের দিনটা আমাদের কাছে খুবই challenging কারণ আজকের অগ্রগতির ওপর অভিযানের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। মনে মনে স্থির করে নিলাম, আজ আমাদের সমস্ত শক্তি ও বুদ্ধি উজাড় করে দিতে হবে, নইলে ছু-বছরের স্বপ্ন মিথ্যে হয়ে যাবে।

জগদীশ আমি পল্‌দিন ও নিমা পোশাক পরে একটু ব্যায়াম করে শরীর গরম করে নিলাম। ইতিমধ্যে কৃষ্ণ ও শিবু জলখাবার ও প্যাক্-লাঞ্চ তৈরি করে ফেলল। খেয়ে নিয়েই বেরিয়ে পড়লাম। তখন সবে ভোরের আলো শিবিরে এসে পড়েছে।

সেই প্রভাতী আলোয় কৃষ্ণ ও শিবু শিবিরের সামনে দাঁড়িয়ে বহুক্ষণ আমাদের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপরে আমরা বাঁদিকে একটা 'কল্' (col.) দিয়ে ওপরে উঠতে থাকলাম। আর তখুনি শিবু ও কৃষ্ণ হারিয়ে গেল।

একটার পর একটা দড়ি লাগিয়ে ফিক্সডরোপ করতে করতে এগিয়ে চলেছি। এইভাবে প্রায় দু-হাজার ফুট দড়ি লাগিয়ে আমরা প্রায় সাড়ে উনিশ হাজার ফুট উঁচুতে একটা সংকীর্ণ গিরিপথে উঠে এলাম। কিন্তু তাঁবু খাটাবার মতো কোন জায়গা খুঁজে পেলাম না।

এতক্ষণ আমাদের বাঁদিকে অর্থাৎ পশ্চিমে পিরামিডের মতো একটা বরফের দেওয়াল ব্রহ্মাজীকে আড়াল করে রেখেছিল। এবারে সেই বাধা অপসারিত হল। হঠাৎ যেন ব্রহ্মাজী আমাদের সামনে এসে হাজির হলেন। আমরা পুলকিত হয়ে উঠলাম।

তবে সে আনন্দ দীর্ঘস্থায়ী হল না। শিখরে যাবার পথের দিকে তাকিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। আমাদের সামনে সুবিস্তীর্ণ তুষারক্ষেত্র, আস্তে আস্তে উঁচু হয়ে গিয়ে শিখরে মিশেছে। কিন্তু তার সারা বুক জুড়ে অসংখ্য অতিকায় ফাটলের (crevasse) মেলা। তারা প্রকাণ্ড হাঁ করে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। এতবড় বিশাল প্রান্তর জুড়ে এতবেশি বড়-বড় ফাটল আমরা কেউ কোনদিন দেখি নি। দূরবীণ দিয়ে কাছের ফাটলগুলোর তল দেখার চেষ্টা করলাম। পারলাম না। শুধু দেখলাম যতদূর আলো প্রবেশ করতে পেরেছে তারপরে শুধুই অন্ধকার।

কিন্তু এরা এলো কোথা থেকে? ক্রিস্ বনিংটন তাঁর বিবরণে কোথাও তো ফাটলের কথা বলেন নি! তিনি বলেছেন 'Gendarmes', তারাই বা গেল কোথায়? আমরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

বিপদ কখনও একা আসে না। রোদ না উঠলেও সকাল থেকে আবহাওয়া মোটামুটি ভালই ছিল। হঠাৎ চারিদিক থেকে দলেদলে মেঘ ছুটে এলো। মুহূর্তে 'Visibility zero' হয়ে গেল। আট দশ ফুট দূরের জিনিসও কিছু দেখা যাচ্ছে না। আর তারপরেই বরফ পড়তে শুরু হল। সেই সঙ্গে মত্ত-পবনের মাতামাতি। আমরা একজায়গায় জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে 'লেফ্‌ট-রাইট' করতে থাকলাম। নিশ্চল হয়ে বরফের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকলে তুষারক্ষত হয়ে যাবে।

ঘণ্টাখানেক বাদে তুষারঝড় কমে এলো। তুষারপাত অবশ্য একেবারে বন্ধ হল না। তাহলেও মাঝে মাঝে মেঘের ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো এসে পড়ছিল। পল্‌দিনকে বললাম—বাঁদিকের পাথরের দেওয়ালটার ওপরে আস্তে আস্তে উঠে যাও। দেখে এসো দেওয়ালটার ওপাশে শিখরে যাবার কোন নিরাপদ পথ আছে কিনা? আমরা নিচে থেকে তোমার সঙ্গে সঙ্গে চলব, পড়ে গেলে ফাটলগুলো পর্যন্ত গড়িয়ে যাবার আগেই তোমাকে ধরে ফেলব।

খাড়া পাথুরে দেওয়ালের ফাঁক-ফোঁকর অবলম্বন করে পল্‌দিন ওপরে উঠতে শুরু করল। আমরা ওর দিকে নজর রেখে এগিয়ে-পেছিয়ে ওর ঠিক নিচে থাকার চেষ্টা করতে থাকলাম। কিন্তু সেই খাড়া পাথুরে দেওয়াল আর ফাটলের এলাকার মাঝে ব্যবধান এতই কম যে খুব সাবধানে চলাফেরা করতে হচ্ছিল। আমাদের পায়ে লেগে মাঝে মাঝে কিছু আলগা পাথর নিচে পড়ে যাচ্ছিল। ফাটলগুলো যেন তাদের গপ্‌গপ্‌ করে গিলে ফেলছিল। আমরা খুব সাবধানে নিজেদের পিটনে নঙ্গরবদ্ধ (anchoring) করে পল্‌দিনের সঙ্গে সমান্তরাল রক্ষা করছিলাম। কারণ জানতাম মুহূর্তের ভারসাম্য হারালে আমাদেরও ঐ পাথরগুলোর দশা হবে।

কিন্তু আর বেশিদূর এগনো সম্ভব হল না। কারণ সামনেই দেওয়ালটা প্রায় সমকোণাকারে (৯০°) সোজা ওপরে উঠে গেছে! আর ফাটলগুলো দেওয়ালের পাদদেশ পর্যন্ত প্রসারিত। সঙ্গে আর মাত্র দু-‘কয়েল’ (coil) মানে দু’-শ ফুট দড়ি অবশিষ্ট আছে। এর একটা ফাটল পেরোতেই হয়তো এই দড়িটুকু লেগে যাবে।

বাধ্য হয়ে সেখানেই দাঁড়িয়ে পড়লাম। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পল্‌দিনের প্রতীক্ষা করতে থাকলাম। তখনও মনে ক্ষীণ আশা পল্‌দিন যদি কোন সুসংবাদ আনতে পারে।

কিন্তু কোথায় পল্‌দিন? তাকে আর দেখা যাচ্ছিল না। সে তখন আড়ালে চলে গেছে। মনে হচ্ছে দেওয়ালটার ওপরে উঠে ডানদিকে গিয়েছে। ওর জন্য চিন্তা হতে থাকল। গভীর দুশ্চিন্তা

নিয়ে আমরা সেখানে অপেক্ষা করতে থাকলাম।

আধঘণ্টা পরে দুশ্চিন্তার অবসান হল। পল্‌দিনকে দেখতে পেলাম। এবারে সে নেমে আসছে নিচে। কি সংবাদ নিয়ে আসছে? ওদিক থেকে কি শিখরের কোন পথ আছে? থাকলে এই দু-কয়েল দড়ি দিয়ে ফিক্‌সড-রোপ করে আমরা সবাই দেওয়ালের ওপরে উঠে যাবো।

ক্লান্ত পল্‌দিন ফিরে এলো। তার চোখেমুখে বিস্ময় আর নিরাশা। একটু বিশ্রাম নিয়ে বলল—ফাটলগুলো শিখরের মতো এই পাথরের দেওয়ালটাকেও বৃত্তাকারে ঘিরে রেখেছে। কয়েক হাজার ফুট দড়ি ও বেশ কয়েকদিন সময় হাতে থাকলেই কেবল এই শিখরে আরোহণ করা সম্ভব। জীবনে আমি অনেক অভিযানে গিয়েছি, কিন্তু এক জায়গায় এতো ফাটল আর দেখি নি।

একবার থামল পল্‌দিন, তারপরে আবার বলল—অথচ শিখর আমাদের প্রায় মুঠির মধ্যে এসে গিয়েছিল। পাথরের দেওয়ালটার ওপর থেকে একটা ঢালু তুষার ক্ষেত্র নেমে গিয়েছে ঐ ফাটলগুলোর সামনে। কোনমতে ফাটলগুলো পার হতে পারলেই আমরা শৃঙ্গের দক্ষিণ-পূর্ব শিখরশিরাটি পেয়ে যেতাম। সেই গিরিশিরা ধরে শিখরে আরোহণ করা খুবই সহজ। দেওয়ালটার ওপর থেকে শিখরকে আমার এত কাছে মনে হচ্ছিল যে কেউ সেখানে দাঁড়িয়ে থাকলে চিনতে পারতাম। ওখান থেকে শিখরের উচ্চতা মাত্র হাজারখানেক ফুট। মনে হচ্ছিল ঢিল ছুড়লে গিয়ে শিখরে পড়বে।

থামল গৌতম। আমরা ওর দিকে তাকাই। একটু বাদে সে আবার বলতে থাকে—পল্‌দিনের কথা শুনে আমার ধারণা হয়েছে যে যদি আমরা আরও অন্তত হাজার দুয়েক ফুট দড়ি নিয়ে আসতে পারতাম, তাহলে সেই কল্‌-এর ওপরে শিবির করে ফাটল পেরিয়ে অনায়াসে শিখরপূজা-সমাধা করতে পারতাম। তবে তাঁর জন্য প্রকৃতির করুণার প্রয়োজন ছিল। তাঁর করুণা ছাড়া কোন পর্বতাভিযান সফল হতে পারে না।

পরদিন নিমা ও জগদীশের সঙ্গে আলোচনা করে অভিযান পরিত্যাগ করাই সাব্যস্ত করলাম। সেখান থেকে প্রণাম জানিয়েই ব্রহ্মাজীকে বলেছি—আমরা তোমার কাছে আত্মসমর্পণ করলাম। তুমি পরাজিতের প্রণাম গ্রহণ করো।

প্রচণ্ড মানসিক বিপর্যয়ের মুখেও আমরা কর্তব্য বিস্মৃত হই নি। তাই ভাবলাম এখনো যখন সময় হাতে আছে, তখন ফেরার পথে যতগুলো সম্ভব ফিক্‌সড-রোপ খুলে নিয়ে যাই।

কিন্তু সে পরিকল্পনাও ব্যর্থ হল। দুখানি দড়ি খোলার পরই সহসা শুরু হয়ে গেল প্রবল তুষারপাত সেই সঙ্গে দমকা হাওয়া। ঘনিয়ে এলো অন্ধকার। দড়ি খোলা বন্ধ রেখে আমরা দড়ি ধরে অন্ধের মতো নিচে নামতে থাকলাম। মনে পড়ল, শৃঙ্গে আরোহণ করে ফেরার পথে এই ফিক্‌সড-রোপ খুলতে গিয়েই গতবছর অসিতদা শহীদ হয়েছেন।

তোমাদের আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছায় সে রকম কিছু ঘটল না। কেবল Visibility প্রায় শূন্য হয়ে যাবার জন্য মাঝে মাঝেই আমরা ফাটলে ঢুকে যাচ্ছিলাম। তবে ফাটলগুলো ছোট থাকায় উঠে আসতে পারছিলাম। এইভাবে সারাদিন সংগ্রাম করে ক্ষুধা তৃষ্ণা ও ক্লান্তিতে আধমরা হয়ে টলতে টলতে সন্ধ্যার সময় শিবিরে ফিরে এলাম।

॥ সতেরো ॥

'দেবতার গ্রাস' কবিতায় কবিগুরু লিখেছেন—

'......কৌতূহল অবসান,

কাঁদিতেছে রাখালের গৃহগত প্রাণ...'

অভিযান শেষে অভিযাত্রীরাও প্রায় সবাই সেই রাখাল হয়ে যায়। ফলে হিমালয়-অভিযানের অধিকাংশ দুর্ঘটনা ঘটেছে ফেরার পথে। অনিমা সেন, অমর রায়, সুজয়া গুহ, কমলা সাহা, অসিত মৈত্র—আরও কত নাম করব? এমনকি অনেকে বলেন, আর্ভিন এবং ম্যালোরী-ও নাকি এভারেস্ট (২৯,০২৮´) আরোহণ করে ফেরার পথে নিখোঁজ হয়েছেন। না হলে তেনজিং নোরগে এবং এডমাণ্ড হিলারীর-র নাম আজ হয়তো আমরা কেউ জানতাম না। কারণ তাঁদের ধারণা ই. এফ. নর্টন-এর নেতৃত্বে ১৯২৪ সালের ৮ই জুন জর্জ লী ম্যালোরী এবং এ্যানড্রু আর্ভিন এভারেস্ট শিখরে আরোহণ করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা হারিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সেই গৌরবের ইতিহাসও হারিয়ে গিয়েছে।

যাকগে যেকথা বলছিলাম। আমাদেরও এখন রাখালের মতই 'গৃহগত প্রাণ।' আমরাও তাই পাগলের মতো পথ চলেছি। আজ সকাল ন'টায় অসিত কানন থেকে রওনা হয়ে দুপুর বারোটায় দোবাতি পৌঁচেছি। পথে প্রবল বৃষ্টি হয়েছে। তবু যাবার সময় যেপথ পেরোতে ছ'ঘণ্টা লেগেছে, সেইপথ তিনঘণ্টায় পার হয়ে এসেছি।

আগুন জ্বালিয়ে চা করে নিয়ে চা-বিস্কুট দিয়ে দুপুরের খাওয়া সেরেছি। তারপরে দোবাতি থেকে রওনা হয়ে বিকেল চারটায় কিবার গাঁয়ে পৌঁচেছি। গ্রামবাসীরা পরম সমাদরে স্বাগত জানিয়েছেন, তাঁবু ফেলার জায়গা ঠিক করে দিয়েছেন।

আজ ২৮শে সেপ্টেম্বর। কিন্তু আজকের কথা বলার আগে

গতকাল অর্থাৎ ব্রহ্মলোকে আমাদের শেষ দিনটির কিছু কথা বলে নিতে চাই। দুটি কারণে কালকের দিনটাও আমরা অসিত কাননে কাটিয়েছি। প্রথমতঃ মালবাহক ছিল না এবং এক নম্বর শিবিরে ফেলে আসা সাজসরঞ্জাম আনাতে হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ পরশু রাতে সহনেতার বিবরণ শোনার পরে নেতা বলে বসল—আমরা পরাজিত, তবু ফিরে যাবার আগে একবাব দেখে যেতে চাই যে উত্তর-পশ্চিম দিক অর্থাৎ এই অসিত কাননের দিক থেকে ব্রহ্মা-১ শিখরের কোন পথ আছে কিনা? থাকলে কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি 'ক্লাইম্ব' করা যাবে। কারণ দক্ষিণ-পূর্ব দিকের মতো এদিকে অতখানি 'গ্লেশিয়ার ট্র্যাভার্স' করার দরকার পড়বে না। আর সাজ-সরঞ্জামও সামান্যই লাগবে।

ঠিক হল, যদি সম্ভাব্য কোন পথ পাওয়া যায়, তাহলে আমরা অকাজের সদস্যরা সমস্ত বাড়তি মালপত্র নিয়ে আজ সোন্দার চলে যাবো। কয়েকজন মালবাহক নিয়ে কেবল নেতা ও মেডিক্যাল অফিসার অসিত কাননে থাকবে।

গতকাল সকাল ন'টা নাগাদ প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে শেরপাদের সঙ্গে কৃষ্ণ ও শিবু তাই বেরিয়ে পড়েছিল। ব্রহ্মা হিমবাহের বিপরীতদিকের কালো পাহাড়টার পাশ দিয়ে ওরা ওপরে উঠতে থাকল। মূল-শিবিরের সামনে দাঁড়িয়ে আমরা প্রায় ঘণ্টাখানেক ওদের দেখতে পেলাম। অবশেষে ওরা অদৃশ্য হয়ে গেল।

তারপরে রাম পেয়ার ও বড়-রসিদকে নিয়ে তপন ওপরে চলে গিয়েছিল। আর আমরা সারাদিন বসে মালপত্র গোছগাছ করেছি।

সকালের দিকে গতকাল আবহাওয়া ভালই ছিল। ব্রহ্মাজীও দর্শন দিয়েছিলেন। তেমন তেজ না থাকলেও রোদ উঠেছিল। কেবল জলের সমস্যায় সারাদিন বিব্রত হয়েছি। নালায় একফোঁটা জল আসে নি।

বেলা দুটো নাগাদ মেট ও মালবাহকদের নিয়ে ছোট-রসিদ সোন্দার থেকে ফিরে এসেছে। মেট জানিয়েছে, কিশ্‌তোয়ারে

দিনের কারফিউ উঠে গেছে। তাই পাল্মার পর্যন্ত বাস আসছে।

ছোট-রসিদ বলে উঠেছে—সাব, ফিকর মাত করো, ম্যাঁয় পাতিমহলামে বাস লে আয়েগা।

অবাক হয়েছি। ছেলেটা বলে কি! বাস না এলেও সে পাতিমহলায় বাস নিয়ে আসবে! যাক্‌গে ওর কথা। কিশ্‌তোয়ারে কারফিউ কমেছে, বাস চলতে শুরু করেছে, এটাই বড় কথা।

হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার জন্য কিশ্‌তোয়ারে এখনও রাতের কারফিউ ওঠে নি। কিন্তু মুসলমান মেট গোলাম রসুল হিন্দু মালবাহক নাথুরাম ঠাকুরকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে।

কথায় কথায় ঠাকুর আমাদের জানিয়েছে, জাপানী অভিযাত্রীরা ফিরে গেছেন। তাঁরাও ব্রহ্মা-১ শিখরে আরোহণ করতে পারেন নি।

বিকেল চারটে নাগাদ তপনরা ফিরে এসেছে। আর তারপরেই প্রবল বৃষ্টি নেমেছে। কৃষ্ণদের জন্য চিন্তিত হয়ে পড়েছি। আবার ভেবেছি, এত যখন দেরি হচ্ছে, তখন হয়তো ওরা পথ খুঁজে পেয়েছে।

পাঁচটায় বৃষ্টি কমেছে। সঙ্গে সঙ্গে সবাই বেরিয়ে এসেছি তাঁবু থেকে। অমূল্য তখন কি ভাবছিল জানি না কিন্তু আমি ভেবেছি, শ্রান্ত পর্বতারোহীদের আবার ওপরে না পাঠালেই হত। কারণ ব্যর্থতাকে মেনে নেবার মধ্যে কাপুরুষতা নেই। কাপুরুষ তারাই, যারা ব্যর্থতাকে ভয় করে।

বেশিক্ষণ প্রতীক্ষা করতে হয় নি। কিছুক্ষণ বাদেই দেখতে পেয়েছি ওদের। বুক থেকে পাষাণভার নেমে গেছে।

রামকে চা বানাতে বলে আমরা ওদের নিয়ে তাঁবুতে এসেছি। কৃষ্ণ বলেছে—আমি আর কি বলব, যা বলার পল্‌দিন বলো।

পল্‌দিন বলতে শুরু করেছে—

—আমরা বড় বড় পাথর পেরিয়ে পর্বতগাত্রের পাদদেশে উপস্থিত হলাম। কিন্তু সেখানেই থমকে দাঁড়াতে হল। কারণ সেখান থেকে যে পাথরের দেওয়াল ওপরে উঠে গেছে, তার ঢাল প্রায় ৭০° ডিগ্রি। এত খাড়া দেওয়াল বেয়ে ওপরে উঠতে গেলে ফিক্‌সড-রোপ করা

দরকার। তার সুযোগ নেই। তাই আমরা অন্য রাস্তা খুঁজতে থাকি।

কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করার পরে দেখতে পেলাম ওপর থেকে নেমে আসা একটা ঝরণা শুকিয়ে গেছে। এখন সেটি একটা অচল প্রস্তর-প্রবাহ। আমরা সেটা বেয়ে ওপরে উঠতে থাকলাম। বলা বাহুল্য খুব নিরাপদে নয়। ঝরণাটা যেমন খাড়া, তেমনি সরু। আমাদের সারি বেঁধে ওপরে উঠতে হচ্ছিল। অথচ মাঝে মাঝেই কিছু কিছু আলগা পাথর ওপর থেকে নিচে গড়িয়ে পড়ছিল। কাজেই ওপরের দিকে লক্ষ্য রেখে একের অনেক পেছনে অপরকে চলতে হচ্ছিল।

এইভাবে প্রায় ঘণ্টাদুয়েক ওপরে ওঠার পরে দেখতে পেলাম সামনে একটা ঝুলন্ত হিমবাহ। সোজাসুজি সেটাকে টপকে যাওয়া সম্ভব নয়। তাই আমরা পাহাড়ের গা বেয়ে আড়াআড়ি ভাবে পশ্চিমদিকে এগোতে থাকলাম।

ঘণ্টাখানেক চলার পরে একটুকরো ঘাসে ছাওয়া প্রায় সমতল জায়গায় উপস্থিত হলাম। মনে হল, এখানেই এক নম্বর শিবির প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। রুক্‌স্যাক্ নামিয়ে সেখানেই বসে পড়লাম। একটু বিশ্রাম করে 'প্যাক্-লাঞ্চ' খেয়ে নিলাম। তারপরে আবার এগিয়ে চললাম।

কিন্তু বেশিদূর এগোতে পারলাম না। একটা প্রায় সমকোণে দাঁড়িয়ে থাকা দেওয়াল আমাদের পথরোধ করল। দেওয়ালটা তিনদিক থেকে জায়গাটা ঘিরে রেখেছে। ফিক্‌সড-রোপ না করে সেই দেওয়ালের গা বেয়ে ওপরে ওঠা অসম্ভব।

বাধ্য হয়ে আবার সেই ঘাসে ছাওয়া ময়দানে ফিরে এলাম। তারপরে আড়াআড়ি পশ্চিমে চলতে শুরু করলাম!

কিছুক্ষণ চলার পর দেখতে পেলাম ওপরে একটা প্রকাণ্ড তুষার-প্রপাত (Ice-fall) এবং কয়েক মিনিট অন্তর অন্তর সেটা থেকে তুষারধস নামছে। বুঝতে পারলাম ঐপথে এগোলে অপমৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

এদিকে তখন তিনটে বেজে গেছে। আর দেরি করলে ফিরতে

রাত হয়ে যাবে। তাই ব্রহ্মাজীকে প্রণাম করে সেখানেই শিখরের নতুন পথ খোঁজার চেষ্টায় যতি টেনে দিলাম।

—জানি না কি দোষ করেছি? তাই ব্রহ্মাজী আমাদের একটা শেষ চেষ্টা করার সুযোগও দিলেন না।

পলদিন থামার পরে প্রায় আপন মনে শিবু বলে উঠল। একটু থেমে সে আবার বলল—ঠিক আছে ব্রহ্মাজী, তুমি আমাদের শিখর-পূজা গ্রহণ করলে না। কিন্তু এখানে, তোমার এই পদতলে বসে যদি তোমার পুজো করি, তাহলে তো তুমি বাধা দিতে পারবে না। তাই করব, আমরা আজ তোমার পুজো করব।

শেষ করে শিবু নেতার দিকে তাকিয়েছে। অমূল্য বলেছে—ভালই তো পুজো করবে, এতে আপত্তি করার কি থাকতে পারে?

অতএব সন্ধ্যার আগেই পুজো শুরু হয়ে গেছে। তাঁবুর পেছনে একখানি বড় পাথরকে পূজামণ্ডপে পরিণত কবা হয়েছে। টুলটুল ও পলদিন ধূপ জ্বালিয়েছে। শৈলেশ মোম জ্বালাবার চেষ্টা করল কিন্তু হাওয়ার জন্য পেরে উঠল না। তপন জয় ও বঞ্জু আমসত্ত্ব, চকোলেট ও বিস্কুটের প্রসাদ সাজালো। জগদীশ ছুটে গিয়ে তার রুক্স্যাক্ থেকে নারকেলটি নিয়ে এলো।

এই নারকেলের একটু ইতিহাস আছে, করুণ ইতিহাস। জগদীশ জম্মু থেকে একটা নারকেল কিনে তার রুক্স্যাকে রেখে দিয়েছিল। আশা ছিল শিখরে আরোহণ করে ব্রহ্মাজীকে অঞ্জলি দেবে। ব্যাপারটা গোবার জানা ছিল না। তাই কিশ্‌তোয়ারে সেদিন রাতে নারকেলটি দেখতে পেয়ে সে জগদীশের অজান্তেই সেটি ছোলার ডালে দিয়ে দেয়।

পরদিন সকালে নারকেল না পেয়ে জগদীশ অগ্নিশর্মা। শেষ পর্যন্ত যাই হোক অনেক খোঁজাখুঁজি করে তপন তাকে এটি কিনে দিয়েছে।

দুর্ভাগ্য জগদীশের, দুর্ভাগ্য আমাদের। সে ব্রহ্মাশিখরে পুজো দিতে পারে নি। তাই ব্রহ্মাজীর পাদদেশ-পূজায় নারকেলটি

অঞ্জলি দিল।

যাক্‌গে, এবারে আবার পুঁজোর কথায় ফিরে আসি। জয় মন্ত্রপাঠ করে—ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ···

আমরা চারিপাশে দাঁড়িয়ে চোখ বুজে তাঁর ধ্যান করি। তারপরে জগৎস্রষ্টার উদ্দেশে আমাদের প্রণাম জানাই।

অবশেষে শিবু তার উইণ্ডপ্রুফের পকেট থেকে ছোট গীতাখানি বের করে পাঠ করতে থাকে—

'কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।

মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মাণি॥' ২/৪৭

কর্মেই তোমার অধিকার, কর্মফলে কখনও তোমার অধিকার নাই। কর্মফল যেন তোমার কর্মপ্রবৃত্তির হেতু না হয়, কর্মত্যাগেও যেন তোমার প্রবৃত্তি না হয়।

'যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।

সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে॥' ২/৪৮

হে ধনঞ্জয়, যোগস্থ হইয়া, ফলাসক্তি বর্জন করিয়া, সিদ্ধি ও অসিদ্ধি তুল্যজ্ঞান করিয়া তুমি কর্ম কর। এইরূপ সমত্ব-বুদ্ধিকেই যোগ বলে।···

'তস্মাদসক্তঃ সততং কার্যং কর্ম সমাচর।

অসক্তোহ্যাচরন্ কর্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ॥' ৩/১৯

অতএব তুমি অনাসক্ত হইয়া সর্বদা কর্তব্য কর্ম সম্পাদন কর, কারণ আসক্তিশূন্য কর্মানুষ্ঠান করিলে পুরুষ পরমপদ প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ মোক্ষলাভ করে।

'কর্মনৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।

লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্তুমর্হসি॥' ৩/২০

জনকাদি মহাত্মারা কর্মদ্বারাই সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। লোকরক্ষার দিকে দৃষ্টি রাখিয়াও তোমার কর্ম করা কর্তব্য।···

পরদিন। সকাল সাড়ে আটটায় কিবার গাঁও থেকে রওনা দেওয়া গেল। গ্রামবাসীরা অনেকেই পথের পাশে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে আমাদের বিদায় জানালেন। মুখে বার বার বললেন—আবার আসবেন। ফির মিলেঙ্গে।

এখান থেকে আমাদের দলে একজন সদস্য বেড়েছে। গতকাল বিকেলে তাঁবু ফেলার পর থেকেই সে পাশে পাশে রয়েছে। রাতে আমাদের সঙ্গে খেয়েছে। ভেবেছিলাম খেয়ে-দেয়ে চলে যাবে। কিন্তু সকালে তাঁবু থেকে বেরিয়ে দেখেছি সে বসে আছে। আজও সকালে আমাদের সঙ্গে ব্রেকফাস্ট করেছে। এখন সবার আগে আগে পথ চলেছে। জানি না কতদূর যাবে?

আমরা তার নাম জানি না। তাই গোরা নাম রেখেছে রাজা। এখন কিন্তু সে রাজা বলে ডাক দিলেই ছুটে আসছে কাছে। রাজা মানুষ নয়, কিবার গাঁয়ের একটি পথের কুকুর।

চেহারাটি সত্যি রাজকীয়। যেমন স্বাস্থ্য, তেমনি গড়ন আর গায়ের রং। সারা গায়ে বড় বড় লোম। চোখ দুটি কিন্তু ভারী শান্ত আর স্বভাবটিও ভদ্র। আদর করলে খুবই খুশি হয়। সে রাজার মতই আগে আগে চলেছে। যেন আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কতদূর যাবে কে জানে? তবে বেচারীকে আবার ফিরে আসতে হবে। আমরা কি করব? সে তো নিজের থেকেই চলেছে।

মনে পড়ছে লালুর কথা। তমসা উপত্যকা অভিযানে তুষারাবৃত ধুমধারকান্দি গিরিবর্ত্মের পথে সেও এমনি আমাদের আগে আগে পথ চলেছিল। কিন্তু জারমোলা গ্রামের লালুকে আমরা আর জারমোলায় ফিরিয়ে আনতে পারি নি। শেরপা পাসাং-কে তুষার গহ্বরে পড়ে যেতে দেখে সে পাগলের মতো চিৎকার করে উঠেছিল। তারপরে কেউ কিছু বুঝে উঠতে পাবার আগেই কর্তব্য-পরায়ণ লালু লাফিয়ে পড়েছিল সেই গভীর গহ্বরে। দড়িতে ঝুলে থাকা পাসাং তাকে কোন সাহায্যই করতে পারে নি। কেবল লালুর অন্তিম আর্তনাদ সেই তুষারগহ্বরের প্রাচীরে প্রাচীরে প্রতিধ্বনিত

হয়ে তাকে বার বার বিচলিত করে তুলেছে।

আর আমরা? পাসাংকে উদ্ধার করে অসহায় লালুকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে আমরা প্রাণের মায়ায় স্বার্থপরের মতো পালিয়ে এসেছি।*

জানি না রাজাকে নিয়ে আবার কোনো করুণকাহিনী অপেক্ষা করছে কিনা?

যাক্‌গে, এবারে আমাদের কথায় আসি। অসিত কানন থেকে রওনা হয়ে কিবারের তীরে তীরে পথ চলে দ্বিতীয়দিন দুপুর দেড়টায় আমরা সোন্দার পৌঁছলাম। সেই পাহাড়ী গ্রাম আর সমতল ক্ষেত পেরিয়ে বনবিশ্রাম গৃহের সামনে এলাম। গৌতম গোরা শিবু জগদীশ ও রাজা আমাদের আগেই এসে গিয়েছে। শুধু তাই নয়, শিবু আজ সত্যি সত্যি হট্‌লাঞ্চের ব্যবস্থা করে ফেলেছে। চৌকিদার ও তার স্ত্রী রান্না চড়িয়ে দিয়েছে। শিবু বলে—হাত-মুখ ধুয়ে নিন। ঘণ্টা খানেকের মধ্যে গরম-গরম ডাল-ভাত ভাজি ও সবজি পেয়ে যাবেন। চৌকিদারকে জনপ্রতি মাত্র তিন টাকা করে দিতে হবে।

মালবাহকরাও এসে গিয়েছে। ওদের কাজ এখানেই শেষ। মেট অবশ্য বলেছিল, ঘোড়া পেতে কোনো অসুবিধে হবে না। তবু ভয় ছিল। কিন্তু বিশ্রাম-গৃহের সামনে আসতেই আমাদের ঘোড়াওয়ালা মহম্মদ ইকবাল সেলাম করে। আমরা আনন্দিত হয়ে উঠি। হাসিমুখে ওর কুশল জিজ্ঞেস করি।

কথায় কথায় ইক্‌বাল জানায়—কিশ্‌তোয়ার এখন স্বাভাবিক। তবে রাত ন'টা থেকে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত কারফিউ চলছে। আর নিচের দিকেও খুবই বৃষ্টি হয়েছে। তাই বাস পাল্‌মার পর্যন্ত আসছে।

তার মানে ঘোড়া নিয়ে আমাদের পাল্‌মার যেতে হবে। আরও তিন কিলোমিটার পথ বেশি হাঁটতে হবে।

কথাটা কিন্তু ছোট-রসিদের ঠিক কানে গেছে। সে সঙ্গে সঙ্গে সেই একই কথা বলে—সাব্, তোম্ ফিকর মাত করো, ম্যাঁয় পাতি-

---

* লেখকের 'তমসার তীরে তীরে' বইখানি দ্রষ্টব্য।

মহল্লামে বাস লে আয়েগা।

কি জানি ও কি বলতে চাইছে? কিন্তু আজ ক'দিন ধরে বাসের প্রসঙ্গ উঠলেই সমানে এই এক কথা বলে যাচ্ছে। অথচ কিছুতেই বুঝতে পারছি না পাল্‌মার থেকে সে কেমন করে পাতিমহলায় বাস নিয়ে আসবে? রাস্তা খারাপ বলে বাস পাতিমহলা আসছে না, অথচ রসিদ বলছে সে বাস নিয়ে আসবে।

খাওয়ার পরে বিদায় নিতে হল মেটসাবের কাছ থেকে, বিদায় নিতে হল ঠাকুর ও তার সহকর্মীদের কাছ থেকে। কেবল দেখা হল না মহেশবাবুর সঙ্গে। তিনি ধরে নিয়েছেন আমরা আজ এখানে থাকব। তাই ভেবেছেন বিকেলে দেখা করবেন। তিনি কেমন করে জানবেন যে আমাদের এখন 'গৃহগত প্রাণ'।

বিদায় নিলাম সুন্দরী সোন্দারের কাছ থেকে। বিশ্রাম-গৃহ থেকে নেমে এসে সেই আখরোট গাছের নিচে একবার দাঁড়াই। সেদিন এখানে বসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়েছিলাম। আজ বিশ্রামের প্রয়োজন নেই। অতএব এগিয়ে চলি।

না, রাজা দেখছি এখান থেকেও ফিরে গেল না। সে সবার আগে আগে পথ চলেছে। এও দেখছি লালুর মতই মায়ায় আবদ্ধ করবে। ও যদি সত্যি সত্যি আমাদের সঙ্গে পাতিমহলা চলে যায়, তাহলে কি হবে? আমরা ওকে নিয়ে যেতে পারব না আর রাজাও কিবার গাঁয়ে ফিরে আসতে পারবে না।

চেনাবের তীরে এসে দাঁড়াই। সেদিন এখানে এসে সোন্দার-সুয়েদ উপত্যকার সীমাহীন সৌন্দর্য দেখে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গিয়েছিলাম। আজ তার কাছে নিতে হচ্ছে বিদায়। কিবারের তীরে তীরে পথচলা শেষ হয়েছে আমাদের। এবারে চেনাবের তীরপথ ধরে যেতে হবে সেওয়াবাতি, সেখান থেকে পাতিমহলা হয়ে বাণ্ডারকোট।

কিন্তু কিবার কিংবা চেনাব নয়। সোন্দার গ্রামের উপকণ্ঠে দাঁড়িয়ে আমি সুন্দরী সোন্দারকেই আরেকবার দেখি। দেখি আর

ভাবি—জীবনে আর কি কখনো এখানে আসা হবে আমার ?

আবার সেই দারসী গ্রাম। এলাম মোক্তার আহমেদের বাড়ির সামনে। কিন্তু আজ কেউ দাঁড়িয়ে নেই বাড়ির সামনে, পথের ধারে। হাতে সময় কম, এগিয়ে চলি।

বিকেল পাঁচটায় সেওয়াবাতি পৌছলাম। শিবু জগদীশ কৃষ্ণ ও গোরা রাজার সঙ্গে অনেকক্ষণ আগেই এসে গেছে। তারা মাষ্টারসাবকে বলে স্কুলঘর খুলে নিয়েছে। শিবু আজও বলে—দোকান থেকে চা খেয়ে ঘরে চলে যান। অনেকদিন পরে আজ আবার ঘরে থাকতে পারছেন।

কথাটা সত্যি উল্লেখ করবার মতো। পনেরোদিন বাদে আমরা আজ ঘরে রাত্রিবাস করব। তাহলেও সেকথার জের না টেনে শিবুকে অন্যকথা বলি—যাবার সময় চায়ের দাম দেওয়া হয় নি মনে আছে তো ?

—হ্যাঁ। মাষ্টারসাব বলেছিলেন ফেরার সময় চা খেয়ে একসঙ্গে দাম দিয়ে যাবেন। মনে আছে বৈকী। শিবু সহাস্যে উত্তর দেয়।

চা খেয়ে নিয়ে ঘরে আসি। ঢোকার মুখেই রাজার সঙ্গে দেখা। সে লেজ নেড়ে স্বাগত জানায়।

॥ আঠারো ॥

আজ ৩০শে সেপ্টেম্বর। ঠিক ষোলদিন আগে যে পাতিমহলা থেকে আমাদের পদযাত্রা শুরু হয়েছিল, আজ সেই পাতিমহলা পৌঁছব।

পরশু বিদায় নিয়েছি ব্রহ্মলোক থেকে, গতকাল কিবার আর সোন্দারের কাছ থেকে। আজ বিদায় নিচ্ছি সেওয়াবাতি থেকে আর আগামীকাল বিদায় নেব পাতিমহলা আর চেনাবের কাছে—শ্যামা বাটসাহেব ও রসিদদের কাছ থেকে।

এদের কথা ভাবলেই মন আমার উতলা হয়ে ওঠে। সেদিন বাটসাহেব আর শ্যামা কি আদর-যত্নই না করেছে! আজ তারা আমাদের দেখে ভারী খুশী হবে। তারপরে যখন শুনবে আমরা কাল সকালের বাসেই কিশ্‌তোয়ার রওনা হচ্ছি, তখন শ্যামাও হয়তো রসিদদের মতই বলে বসবে—'যেতে নাহি দিব'।

কিন্তু যাকগে এসব কথা। আগামীকালের ভাবনা আজ ভেবে কি হবে? তার চেয়ে আজকের কথা বলা যাক। আজ সকাল সওয়া সাতটায় সেওয়াবাতি থেকে রওনা হয়েছি। সেই চেনাবের তীরে তীরে চড়াই আর উৎরাই পথ। পথের পাশে ঝোপঝাড়ে সেই লাল হলুদ ফুল আর সবুজ ভাঙ গাছ। আজও মাঝে মাঝে পথচারীদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। কেউ গাঁয়ের নারী-পুরুষ আর কেউবা কিশ্‌তোয়ার চলেছে। এরা বিকেলের বাস ধরবে।

আজও মাঝে মাঝে গুর্জরদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। তারা ভেড়া-ছাগল ও গরু-ঘোড়া নিয়ে সপরিবারে নিচে নেমে যাচ্ছে। আশ্চর্য আমাদের রাজা কিন্তু ওদের কুকুরদের সঙ্গে ঝগড়া করছে না। বরং দু-চার মিনিট তাদের সঙ্গে খেলা করে আবার আমাদের আগে আগে পথ চলছে।

বেলা সওয়া বারোটায় এখেলা পৌঁছলাম। আজ কিন্তু

এখানেও হট্-লাঞ্চ পাওয়া গেল। ডাল ভাত আলুভাজা ও আলু কফির তরকারী। আজ যে শিবু সকালে একজন স্থানীয় যাত্রীর সঙ্গে দশটি টাকা অগ্রিম পাঠিয়ে দিয়েছিল। সে নাকি দু-ঘণ্টা আগে আমাদের খাবারের অর্ডার পৌঁছে দিয়েছে দোকানীকে, ফলে তার রান্না করে রাখতে অসুবিধে হয় নি।

খেতে খেতে গৌতম বলে—লীডার, আমরা কিন্তু আজই কিশ্‌তোয়ার চলে যেতে পারি।

—আর তাহলে কাল সকালেই জম্মুর বাস ধরতে পারা যায়। কৃষ্ণ যোগ করে।

—কেমন করে? নেতা বিস্মিত।

—পাঁচটা নাগাদ পাল্‌মার থেকে কিশ্‌তোয়ারের বাস ছাড়ে। আমাদের তার আগে পৌঁছতে হবে।

অমূল্য ঘড়ি দেখে। বলে—সাড়ে বারোটা বেজে গেছে। ১১ কিলোমিটার পথ, আমার পক্ষে কি এই ভাঙা পা নিয়ে চারঘণ্টায় পৌঁছন সম্ভব?

আমরা চুপ করে থাকি। কিন্তু জগদীশ সহসা বলে ওঠে —সম্ভব।

জগদীশ কম কথা বলে। তাই তার আকস্মিক মন্তব্য শুনে কৌতূহলী হয়ে উঠি।

অমূল্য বলে—কেমন করে?

জগদীশ উত্তর দেয়—আমাদের ঘোড়াওয়ালার একটা বাড়তি ঘোড়া আছে, বেশ ভাল ঘোড়া। আপনি যদি সেটা নিয়ে নেন, তাহলে চারটের মধ্যেই পৌঁছে যাবেন।

অবাস্তব প্রস্তাব। ওপরে যাবার সময় যে মানুষ ঘোড়া নিতে রাজী হয় নি, সে কি পদযাত্রার এই শেষবেলায় ঘোড়সওয়ার হতে সম্মত হবে? তাছাড়া এখন তো তুলনায় নেতার পায়ের অবস্থা অনেক ভাল। তবু আমি ওর মুখের দিকে তাকাই।

না। অমূল্য কিন্তু আগের মতো সোজাসুজি আপত্তি করে না।

বরং মৃদু হেসে আমাকে জিজ্ঞেস করে—তুমি কি বলছ?

—আমি আবার আলাদা কি বলব? জগদীশ খুব ভাল বুদ্ধি দিয়েছে। আজ কিশ্‌তোয়ার চলে যেতে পারলে একটা দিন বেঁচে যাবে। অভিযান শেষ। ষোলটা লোকের একদিনের থাকা-খাওয়ার খরচ তো খুব কম নয়।

—বেশ তাহলে, জয় জগদীশ হরে। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। ইকবালকে ঘোড়া ঠিক করতে বল।

জগদীশের হিসেব ভুল হয় নি। তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে অমূল্য বেলা পৌনে একটায় ঘোড়ায় চেপেছিল। সাড়ে তিনটার সময় সে পাতিমহলা পৌঁছে গেল।

শুধু সে একা নয়। তার সঙ্গে আমরা মানে আমি জয় রঞ্জু শৈলেশ ও টুলটুল সমানে হেঁটে এলাম। আর রাজার সঙ্গে গৌতম গোরা শিবু কৃষ্ণ তপন ও জগদীশ আগেই এসে গেছে।

কেবল সেই সাতাশটা 'লুপ' পার হবার সময় অমুল্যের সঙ্গে আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়েছে। যাবার সময় ওখানে একটানা হাজার-খানেক ফুট চড়াই ভাঙতে হয়েছিল, এখন উৎরাই। তাই ঘোড়া নামতে পারে না। অমূল্যকে অন্যপথে আসতে হল।

নির্মীয়মাণ বাসপথে অমূল্যের কোন অসুবিধে হয় নি কিন্তু আমাদের খুবই কষ্ট হয়েছে। গত কয়েকদিন ধরে এখানেও খুব বৃষ্টি হচ্ছে। ফলে পথে প্রচুর কাদা। আছাড় সামলে সেই দু-কিলোমিটার লাল-কাদার পথ পেরিয়ে বাটসাহেবের দোকানে পৌঁছতে আমরা গলদঘর্ম হয়ে গেছি। জুতো ও প্যান্ট যেমন জলে কাদায় একাকার, তেমনি গেঞ্জি ও জামা ঘামে চপচপে হয়ে উঠছে। রীতিমত গরম লাগছে। অর্থাৎ হিমালয় ভ্রমণের সকল সুখ শেষ হবার মুখে।

বাটসাহেবের দোকানের দাওয়ায় বসে রাজা বিস্কুট খাচ্ছে।

দুদিন ধরে সে আমাদের সুখ-দুঃখের অংশীদার। আজ ওকে

ছেড়ে যেতে হবে। মনটা ভারী হয়ে ওঠে।

বাবার সঙ্গে শ্যামাও স্বাগত জানায় আমাদের। জুতোর কাদা যথাসম্ভব পরিষ্কার করে উঠে আসি দোকানে। টুলের ওপর বসি। শ্যামা গরম চায়ের গ্লাশ এগিয়ে ধরে। সামনে একটা প্লেটে বিস্কুট রেখে দিয়েছে।

তপন জিজ্ঞেস করে—বিকেলের বাস এখানে কখন আসবে?

—বাস তো এখানে আসছে না। পাল্‌মারেই থেকে যাচ্ছে। দেখছেন না বৃষ্টির জন্য পথের কি হাল হয়েছে? বাটসাহেব উত্তর দেন।

তপন আর কিছু বলার আগেই শ্যামা শিবুকে বলে—বিকেলের বাস দিয়ে কি করবে? তোমরা তো কাল দুপুরের বাসে যাবে।

শিবুদের সঙ্গে শ্যামার পরিচয় ছ' বছরের। আশি ও পঁচাশি সালেও যাতায়াতের পথে ওরা এখানে উঠেছে। তাছাড়া আমাদের মধ্যে শিবু দেখতে সবার ছোট। তাই শিবুর কাছেই শ্যামা জিজ্ঞেস করল কথাটা।

বেচারী শিবু মুশকিলে পড়ে যায়। অপ্রিয় কথাটা সে বলতে পারে না। চুপ করে থাকে।

অবস্থা বুঝে গৌতম কথা বলে—না, বহিন! আমরা আজ বিকেলের বাস ধরেই কিশ্‌তোয়ার চলে যাবো।

—তব্‌ আয়া কিউ? শ্যামা প্রায় কেঁদে ফেলে।

শিবু ওর প্রশ্নের জবাব দিতে পারে না। আমরাও চুপ করে থাকি।

শ্যামাও আর কোন কথা বলে না। সে নীরবে নিজের কাজ করে যেতে থাকে।

একটু বাদে বড়-রসিদ অনুরোধ করে—আজ মাত যাইয়েগা সাব্‌, কাল যাইয়ে!

—আজই চলা যায়গা? একঠো রাত ভি নহী ঠহরনা হামলোগকো পাস? বাটসাহেবের স্বরেও অনুরোধ।

শিবু যেমন শ্যামার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে নি, তেমনি আমরাও রসিদ কিংবা বাটসাহেবকে কিছু বলতে পারি না। কি বলব? ভালোবেসে ওরা আমাদের কাছে রাখতে চাইছে।

শেষ পর্যন্ত নেতাকে মুখ খুলতে হয়। সে ওদের বোঝাবার চেষ্টা করে—বিকেলের বাসটা ধরতে পারলে আমরা আজকের রাতটা কিশ্‌তোয়ারে কাটিয়ে কাল সকালে আবার জম্মুর বাস ধরতে···

—লেকিন ক্যায়সে কিশ্‌তোয়ারমে ঠহরিয়েগা? উধার রাতমে কারফিউ চলতা, গোলি চালাতা ·····। অমূল্যের কথা শেষ হবার আগেই শ্যামা বলে ওঠে। কিন্তু সে-ও শেষ করতে পারে না।

এবারে শিবু কথা বলে—কিশ্‌তোয়ারে কারফিউ শুরু হবে রাত ন'টায় আর আমরা পৌঁছে যাচ্ছি সন্ধ্যে সাতটায়। বাসস্ট্যাণ্ডের পাশেই হোটেল। আমরা ন'টার অনেক আগেই হোটেলে চলে যাবো; আমাদের গুলি করবে কেন?

শ্যামা আর কোন প্রশ্ন করে না। সে নীরবে বাপের সঙ্গে আমাদের জন্য পরোটা তৈরি করে চলেছে।

যাবার সময় ওর কান্না দেখে আমার অঞ্জলির কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। আজ সে এখনো চোখের জল ফেলেনি। তাহলেও সেই কথা মনে পড়ছে—শ্যামা গুর্জর কিশোরী হলেও ভারতীয় নারী; যার কোন যুগ নেই, ধর্ম নেই, সমাজ নেই।

টুলটুল বাটসাহেবকে বলে—চারটে বাজে। এবারে আমাদের খেয়ে নিয়ে পাল্‌মার রওনা হওয়া দরকার।

বাটসাহেব মাথা নাড়েন। কৃষ্ণ বলে—তাহলে ঘোড়াওয়ালাকে বল সে মাল্ না থামিয়ে একেবারে পালমার চলে যাক্।

—কোই জরুরত নহী। আপ খানা খাকে তৈয়ার রহিয়ে। ম্যাঁয় বাস লে আতে।

এতক্ষণ বাদে কথা বলে ছোট-রসিদ, সেই এক কথা। সে উঠে দাঁড়ায়। অমূল্যের কাছে এসে বলে—সাব্‌ আমাকে আপনাদের ছাপানো কাগজে একটা চিঠি লিখে দিন যে আপনারা ষোলজন

জম্মু যাবেন, আপনাদের অনেক মালপত্র। তাই বাসটা যেন আজ এখানে চলে আসে। আমি বাস নিয়ে আসছি।

এতক্ষণে ওর মতলব বুঝতে পারি! একে তো আমরা ষোলজন, তার ওপরে জম্মু পর্যন্ত যাবো। এই বাসটাই আজ রাতে কিশ্‌তেয়ার থেকে কাল সকালের প্রথম বাস হয়ে জম্মু যাবে। সুতরাং জম্মুর ষোলজন যাত্রীর জন্য তিন কিলো-মিটার পথ আসা কিছুই নয়। ওর বুদ্ধির তারিফ করতে হয়।

ছোট-রসিদের পরামর্শ মতো চিঠি লিখে দেয় অমূল্য। সেই চিঠি পকেটে পুরে সে প্রায় দৌড়তে শুরু করে পাল্‌মারের দিকে। কম নয় তিন কিলোমিটার পাহাড়ী পথ।

শ্যামা আমাদের জন্য পরোটা ভাজছে। বাটসাহেব তাকে সাহায্য করছেন। আমরাও আর কোন কথা বলছি না।

কথা বলে বড়-রসিদ। সে তপনকে বলে—সাব্, আমার টাকাটা দিয়ে দেবেন? আমি ঘরে যাবো।

কথাটা ভুলেই গিয়েছিলাম। ছেলেটা যে আমাদের বেতনভুক মালবাহক, সে কথা মনেই ছিল না। থাকবে কেমন করে? গত ষোলোদিনে সে আমাদের অভিযাত্রী পরিবারেরই একজন হয়ে গিয়েছে। এইমাত্র বড়-রসিদ মনে করিয়ে দিল, সে আমাদের কেউ নয়। এবারে পাওনা-গণ্ডা চুকিয়ে তাকে ছেড়ে দিতে হবে।

তাই ছেড়ে দিলাম। ভাউচার লিখে তপন ওকে টাকা দিয়ে দিল। টাকা নিয়ে সেলাম করে সে প্রায় ছুটতে ছুটতে চলে গেল। ওর আচরণে অবাক হলাম। দুটি ভাইয়ের মধ্যে ওকেই আমাদের বেশি ভাল লেগেছে। ওর মধ্যেই বেশি মায়া-মমতা দেখেছি। আর যাবার সময় সে এমন করে চলে গেল! মনুষ্য চরিত্র সত্যই বিচিত্র।

মালপত্র রেখে ইক্‌বালও টাকা নিয়ে ঘোড়া সহ পাল্‌মারের দিকে চলে গিয়েছে। তাহলেও এখানে ভিড় কমল না। আশে-পাশের বাড়ি ও দোকানের অনেকেই ভিড় জমিয়েছে বাটসাহেবের দোকানের সামনে।

না, তারা কেউ আমাদের দেখতে আসে নি। এসেছে রাজাকে দেখতে। দেখার মতই বটে। পাতিমহলা অপেক্ষাকৃত গরম জায়গা বলে এখানকার কুকুরগুলো এত বড় এবং এমন লোমশ, স্বাস্থ্যবান ও সুন্দর হয় না।

শ্যামাকে শান্ত করার জন্যই বোধহয় শিবু একটা কাণ্ড করে বসে। হঠাৎ বলে ওঠে—শ্যামা, তুমি রাজাকে রেখে দাও না?

—রেখে দেব?

—হ্যাঁ। আমরা তো ওকে নিয়ে যেতে পারব না। ওর পক্ষেও কিবার গাঁয়ে ফিরে যাওয়া অনিশ্চিত। পথে কেউ হয়তো ধরে নেবে। সে ঠিকমত খেতে দেবে কিনা, কে জানে? তাই তুমি ওকে রাখলে আমরা নিশ্চিন্ত মনে চলে যেতে পারি।

মুহূর্তে শ্যামার গম্ভীর মুখখানিতে হাসি ফুটে ওঠে। সে তার বাবার দিকে তাকায়। তিনি বলেন—এতো ভাল কথা।

শ্যামা শিবুর দিকে তাকায়। শান্ত স্বরে বলে—তোমরা দিলে আমি নিশ্চয়ই রাখব। তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো, আমি ওর কোন অযত্ন করব না। ওকে স্নান করাবো, খাওয়াবো···

—তাহলে একটা দড়ি দিয়ে ওকে দরজার সঙ্গে বেঁধে রাখো। নইলে হয়তো আমরা চলে গেলে, ও আবার কিবার গাঁয়ে রওনা দেবে। গোরা পরামর্শ দেয়।

শ্যামা তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়ে একটুকরো নাইলনের দড়ি নিয়ে আসে। জগদীশ ওকে বেঁধে দেয়। রাজা কিন্তু কোন আপত্তি করে না। সে শান্ত হয়ে শুয়ে থাকে।

শ্যামা পরোটা পরিবেশন করে, বাট সাহেব চায়ের গ্লাশ এগিয়ে দেন। খেতে খেতে ওদের কথাই ভাবি। কিশ্‌তোয়ার-হিমালয়ের এই দরিদ্র মানুষগুলির কথা, শ্যামা বাটসাহেব মোক্তার-আহমেদ মেট-সাব মহেশবাবু নাথুরাম ও রসিদ ভাইদের কথা। কেবল বড়-রসিদ বিদায় বেলায় বড় বিচিত্র আচরণ করে গেল।

কিন্তু না আর এদের কথা ভাবার সময় নেই। বাস-এর শব্দ শোনা

যাচ্ছে। সচকিত হয়ে উঠি, আনন্দিতও বটে। তাড়াতাড়ি চা ও পরোটা হাতে নিয়েই বেরিয়ে আসি বাইরে।

হ্যাঁ, ছোট-রসিদ তার কথা রেখেছে। সে সত্যই বাস নিয়ে এসেছে। এখন বিকেল পৌনে পাঁচটা।

বাস এসে বাট সাহেবের দোকানের সামনে থামে। বিজয়ী বীরের মতো বাস থেকে নেমে আসে রসিদ। নেতাকে সেলাম দিয়ে বলে—লে আয়া সাব্!

নেতা পিঠ চাপড়ে তাকে সাবাস জানায়। কিন্তু তার সময় কোথায়? সে শেরপা ও হ্যাপ্‌দের সঙ্গে মালপত্র তুলতে লেগে গেল।

বাস আসার পরেই রাজা উঠে দাঁড়িয়েছে সে দড়ি খুলে বাসে আসতে চাইছে! পারছে না। তার গলায় ফাঁস লাগছে। সজল চোখে ছুটে আসে শ্যামা। সে রাজার পাশে বসে তাকে আদর করতে থাকে। রাজা খানিকটা শান্ত হয়।

শৈলেশ পকেট থেকে একখানি বিস্কুট বের করে রাজার মুখের সামনে ধরে। রাজা মুখ ঘুরিয়ে নেয়।

হঠাৎ রঞ্জু বলে ওঠে—ঐতো বড়-রসিদ আসছে।

সত্যই তাই। একটা বেশ বড় পুটলি নিয়ে সে ছুটতে ছুটতে এদিকে আসছে। তাহলে সে আমাদের ছেড়ে চলে যায় নি! ভাবতে ভারী ভাল লাগছে! ওকে দেখে বড্ড আনন্দ হচ্ছে।

সে আসে। এসেই একটুকরো কাপড় দিয়ে বাঁধা পুটলিটা জয়ের হাতে দিয়ে বলে—সাব্, টাকাটা মাকে দিয়ে এলাম আর আপনাদের জন্য কয়েকটা আরু ও মকাই নিয়ে এলাম। বাড়িতে যা ছিল, তাই নিয়ে আসতে হল। ক্ষেতে যাবার সময় পেলাম না।

একবার থামে সে। তারপরে আবার বলে—আরুগুলো বাসে বসে খেয়ে নেবেন। আর মকাইগুলো কিশ্‌তোয়ার গিয়ে পুড়িয়ে দেব।

অবাক হয়ে ওর দিকে তাকাই। একটু হেসে সে বলে—আমিও আপনাদের সঙ্গে কিশতোয়ার যাচ্ছি সাব্! নইলে সেখানে

কারফিউ চলেছে, আপনাদের অসুবিধে হবে। কাল আপনাদের জম্মুর বাসে তুলে দিয়ে আমি ফিরে আসব। আমি মাকে বলে এসেছি সাব্!

কি বলব? কেবল ভাবি ওর কথা, আমার এই ভারতভূমির কথা। কিশ্তোয়ারে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা হয়েছে, সেখানে কারফিউ রয়েছে। তাই মুসলমান-মালবাহক তার হিন্দু-সাহেবদের নিরাপত্তার জন্য পাতিমহলা থেকে কিশ্তোয়ার চলেছে।

মালপত্র তোলা হয়ে গেছে, অন্য যাত্রীরাও বাসে উঠছেন। কণ্ডাক্টর আমাদের তাগিদ দেয়। শ্যামা ও বাটসাহেবকে বলে আর রাজাকে একবার দেখে আমরা একে একে বাসে আসি। বাসের ইঞ্জিন গর্জে ওঠে।

রাজা উঠে দাঁড়িয়েছে। সে আর্তনাদ করছে, আমাদের কাছে আসতে চাইছে। পারছে না। তাকে যে শক্ত দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখে এসেছি। ওর গলায় ফাঁস না লেগে যায়!

না। কাঁদতে কাঁদতে শ্যামা তার গলা জড়িয়ে ধরেছে। কাঁদতে কাঁদতেই বলে চলেছে—রাজা, তোম্ মাত যাও! তোম্ মেরী পাস রহেগা, মেরী পাস…

শ্যামার দু-চোখ বেয়ে জল পড়ছে রাজার গায়ে। রাজার চোখেও জল।

বাস চলতে শুরু করেছে। আমরা চলে যাচ্ছি পাতিমহলা ছেড়ে, ব্রহ্মলোকের তোরণ থেকে। তাই রাজা আর শ্যামা কাঁদছে। রাজা চিৎকার করে আর শ্যামা নীরবে। আমার বুকের মাঝে আমি তার নীরব-কান্নার শব্দ শুনতে পাচ্ছি। রাজা কিবারের কুকুর, শ্যামা পাতিমহলার কিশোরী আর আমি কলকাতার প্রবীণ। অথচ এই মুহূর্তে আমরা এক হয়ে গিয়েছি। বুঝতে পারছি, একই সূত্রে গাঁথা সকল জীবের জীবন, যে জীবনকে কেবল হিমালয়ের অন্তরলোকে উপলব্ধি করা যায়। আমার ব্রহ্মলোকে আসা সার্থক হল। আমি জেনে গেলাম—'নিখিল ভুবন ব্রহ্মময়।'

গতকাল সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় আমরা কিশ্‌তোয়ার পৌঁচেছি। সেই কিশ্‌তোয়ার, যেখানে এসে সেদিন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলাম। সেই কিশ্‌তোয়ার, যেখানে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি দেখে ভারী শান্তি পেয়েছিলাম।

কাল কিন্তু বাস থেকে নেমে কেমন গা ছমছম করছিল। বাসস্ট্যাণ্ডে লোকজন খুবই কম। অধিকাংশ দোকান বন্ধ হয়ে গেছে, বাকিগুলো বন্ধ হবার মুখে। মাত্র দেড়ঘণ্টা পরে সান্ধ্য-আইন বলবত হচ্ছে। তার আগে সবাইকে ঘরে ফিরতে হবে।

বাস থামতেই রসিদ গৌতমকে বলেছে—তপনসাব আর জয়সাবকে নিয়ে আমি বাজার ঘুরে আসছি। চাল আলু সবজি কিছুই নেই। অন্যযাত্রারা নেমে যাবার পরে আপনারা বাস নিয়ে হোটেলের সামনে চলে যান। মালপত্র নামিয়ে নিন। আমি পায়লটকে বলে রেখেছি।

ওরা বাজার থেকে ফিরে আসার আগেই আমরা মালপত্র মায়া হোটেলেব দোতলায় তুলে ফেলেছি। রাত নটার আগেই রসিদ চা ও ভুট্টা খাইয়ে রান্না চাপিয়ে দিয়েছে। বলা বাহুল্য রাম ও পেয়ার তাকে সাহায্য করেছে।

ঠিক বাত ন'টায় রাস্তার সব আলো নিবে গেছে। আর তখুনি একটি টহলদারী জীপ থেকে মাইকের ঘোষণা কানে এসেছে। ঘোষণা করা হয়েছে—রাত ন'টা বাজল, কারফিউ শুরু হয়ে গেল। এখন কাউকে রাস্তায় দেখা গেলেই গুলি চালানো হবে।

শ্যামা তাহলে কারও কাছে এই ঘোষণার কথাই শুনে থাকবে। তাই সে তখন জিজ্ঞেস করেছিল—কেমন করে তোমরা কিশ্‌তোয়ারে রাত কাটাবে? ওখানে রাতে কারফিউ চলেছে, গুলি চালাচ্ছে!

কিন্তু যাকগে শ্যামার কথা, কালকের কথাও আর নয়, আজকের কথা হোক। আজ চারটেয় উঠে রসিদ স্টোভ ধরিয়েছে। বেড-টি বানিয়ে আমাদের ঘুম ভাঙ্গিয়েছে। চা খেয়ে আমরা প্রাতঃকৃত্য শুরু করেছি। মাত্র দুটি বাথরুম, আমরা চোদ্দ জন মানুষ।

পাঁচটায় কারফিউ উঠেছে। আর তখুনি রসিদ বাসস্ট্যাণ্ডে চলে

গেছে। কিছুক্ষণ বাদে সে বাস নিয়ে এসেছে হোটেলের সামনে। সবার সঙ্গে মাল তুলেছে বাসের ছাদে। তারপরে মাল পাহারা দেবার জন্য বাসের ছাদে বসেই বাসস্ট্যাণ্ডে চলে গেছে।

যাবার সময় ব্যবস্থা করে গিয়েছিলাম, আমাদের সব চিঠি এখানে রেখে দেওয়া হবে, ফেরার পথে পোস্টাপিস থেকে নিয়ে নেব। পোস্টাপিস খুলবে বেলা দশটায় আর আমাদের বাস ছাড়বে সকাল সাড়ে ছ'টায়। তাছাড়া সেদিন দেবসাহেব আমাদের চায়ের নেমন্তন্ন করেছিলেন। পোস্টাপিসে যাওয়া হল না, দেখা করতে পারলাম না দেবসাহেবের সঙ্গে। তাই দুঃখ প্রকাশ করে নেতা দুখানি চিঠি লিখেছে। বাসস্ট্যাণ্ডে চিঠি দুখানি রসিদের হাতে দিয়ে তাকে সব বুঝিয়ে দিলাম। সব শুনে সে বলে—আপনারা নিশ্চিন্তে চলে যান। তহসিলদারসাব ও মাষ্টারসাবের চিঠি দিয়ে তারপরে আমি পাতিমহলা রওনা হব। মাষ্টারসাবকে বলব, তিনি যেন আপনাদের সব চিঠি কলকাতায় পাঠিয়ে দেন।

অবশেষে সেই সময় সমাগত হল। সেই অসিত কানন থেকে কত ভেবেছি এই সময়টুকুর কথা, আজকের দিনটির কথা। ব্রহ্মলোক থেকে নাগরিক জীবনে-প্রত্যাবর্তনের কথা। তবু এখন আমার এই সময়টিকে দুঃসময় বলেই মনে হচ্ছে। কারণ আমরা বিদায় নিচ্ছি কিশতোয়ারের কাছ থেকে, বিদায় নিচ্ছি এযাত্রায় আমাদের শেষ কিশতোয়ারী বন্ধু আবদুল রসিদের কাছ থেকে।

ইঞ্জিন গর্জে উঠেছে, বাস চলতে শুরু করেছে কিন্তু রসিদ এখনও রয়েছে আমাদের সঙ্গে। চোখ মুছতে মুছতে সে একসিট থেকে আরেক সিটের সামনে আসছে, প্রত্যেকের সঙ্গে করমর্দন করছে, আর বলছে—ফির মিলেঙ্গে সাব, ফির মিলেঙ্গে......

বাস বড় রাস্তায় এসে গেছে, পায়লট এখুনি গতিবেগ বাড়াবে, কিন্তু রসিদের সেদিকে খেয়াল নেই। তার যে এখনও সবার সঙ্গে হাত মেলানো শেষ হয় নি।

পায়লট গীয়ার বদল করছে। আমি বলে উঠি—রসিদ, আভি

বাস জোর চলনে শুরু করেগী, আভি তোম্ উতার যাও ভাই ?

—জী সাব্! উতারতে। ফির মিলেঙ্গে সাব, ফির মিলেঙ্গে, ফির···

—ফির মিলেঙ্গে রসিদ, ফির মিলেঙ্গে···আমরাও সমস্বরে বলে উঠি।

চলন্ত বাস থেকে নেমে যায় রসিদ।

জানালা দিয়ে মুখ বাড়াই, হাত নাড়ি।

রসিদও হাত নাড়ছে আর কি যেন বলছে। বাসের শব্দে শুনতে পাচ্ছি না তার কথা। তবু বুঝতে পারছি, সে সেই একই কথা বলে চলেছে—ফির মিলেঙ্গে সাব্, ফির মিলেঙ্গে···

ব্রহ্মলোক থেকে ফিরে চলেছি ঘরে। আমার পর্বতারোহী ভাইদের মন ভাল নয়। তাদের পর্বতারোহণ সফল হয় নি। কিন্তু আমার হিমালয় যাত্রা ?

না, আমার যাত্রা বিফল হয় নি। আমি ব্রহ্মলোকে বাস করেছি, দিনের পর দিন ছু-চোখ ভরে ব্রহ্মাজীকে দর্শন করেছি আর ছু-হাত ভরে হিমালয়ের সহজ সরল ও সুন্দর প্রাণের ভালোবাসা কুড়িয়েছি।

জানি না রসিদের বাসনা পূর্ণ হবে কিনা? জানি না আর কোনদিন কিশ্তোয়ারে আসা হবে কিনা ? এলেও শ্যামা রাজা ও রসিদদের সঙ্গে দেখা হবে কিনা ?

শুধু জানি, না হলেও কোন ক্ষতি নেই আমার। শ্যামা রাজা আর রসিদ যে আমার মনের মণিকোঠায় ব্রহ্মলোকের মতই অক্ষয় হয়ে রইল।

—০—

বর্ণানুক্রমিক বিষয়সূচী